নদীর ও-পারে একটা চর দেখা দিয়াছে।

রায়হাট গ্রামের প্রান্তেই ব্রহ্মাণী নদী—ব্রহ্মাণীর স্থানীয় নাম কালিন্দী, লোকে বলে কালী নদী; এই কালী নদীর ও-পারে চর জাগিয়াছে। এখন যেখানে চর উঠিয়াছে পূর্ব্বে ওইখানেই ছিল কালী নদীর গর্ভভূমি, এখন কালী রায়হাটের একাংশ গ্রাস করিয়া গ্রামের কোলে কোলে বহিয়া চলিয়াছে। গ্রামের লোককে এখন বিশ হাত উঁচু ভাঙন ভাঙিয়া নদীগর্ভে নামিতে হয়।

ওই চরটা লইয়া বিবাদ বাধিয়া উঠিল। রায়হাট প্রাচীন গ্রাম। এখানকার প্রাচীন জমিদার-বংশ রায়েরা শাখা-প্রশাখায় বহুধা বিভক্ত। এই বহুবিভক্ত রায়-বংশের প্রায় সকল শরিকই চরটার স্বামিত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত এক হাতে লাঠি ও অপর হাতে কাগজ লইয়া অগ্রসর হইলেন। ইহাদের মধ্যে আবার মাথা গলাইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল জন দুইয়েক মহাজন এবং জন কয়েক চাষীপ্রজা। সমস্ত লইয়া বিবদমান পক্ষের সংখ্যা এক শত পনেরোয় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরোধী। জমিদারগণের প্রত্যেকের দাবি—চর তাঁহার সীমানায় উঠিয়াছে, সুতরাং সেটা তাঁহারই খাস-দখলে প্রাপ্য। মহাজন দুইজনের প্রত্যেকের দাবি,—তাঁহার নিকট 'আবদ্ধীয়' জমির সংলগ্ন হইয়া চর উঠিয়াছে, সুতরাং চর তাঁহার নিকট 'আবদ্ধীয়' সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত এবং নাকি তাহাই হইতে হইবে। প্রজা কয়েকজনের দাবি—কালীর গ্রাসে এপারে তাহাদের জমি গিয়াছে, সুতরাং ওপারে যে ক্ষতিপূরণ কালী দিয়াছে সে প্রাপ্য তাহাদের।

রায়-বংশের বর্ত্তমানে এক শত পাঁচ জন শরিক, বাকী ... মকদ্দমায় জমিদারপক্ষীয়গণের নাম লিখিতে তিন পৃষ্ঠা কাগজ পূর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যোগ দিয়াছেন এক শত দুই জন। বাকী তিন পক্ষের মধ্যে এক পক্ষের মালিক নিতান্তই সঙ্গতিহীন নাবালক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ কিন্তু এখানকার বহুকালের দুইটি বিবদমান পক্ষ। এক পক্ষ রায়-বংশের দৌহিত্র বংশ, অপর পক্ষ রায়-বংশেরই সর্ব্বাপেক্ষা ধুরন্ধর ব্যক্তি কূট-কৌশলী ইন্দ্র রায়। ইন্দ্র রায়ের হাত গরুড়ের তীক্ষ্ণ নখরের মত প্রসারিত হইলে কখনও শূন্য মুষ্টিতে ফেরে না, ভূখণ্ডও বোধ করি উপড়াইয়া উঠিয়া আসে। এই ইন্দ্র রায়ের অপেক্ষাতেই বিবদমান পক্ষ সকলেরই উদ্যত হস্ত এখনও স্তব্ধ হইয়া আছে, অন্যথায় এত দিন একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া যাইত।

অপর পক্ষ—ইন্দ্র রায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিপক্ষ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী। তিনিও এক কালে ইন্দ্র রায়ের সমকক্ষ ব্যক্তি ছিলেন ; কূট বুদ্ধি অপেক্ষা ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁহার বড় ; দাম্ভিকতার প্রতিমূর্ত্তি। ইন্দ্র রায়ের সহিত দ্বন্দ্বে ইন্দ্র রায়কেই অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেন ; প্রতি ক্ষেত্রে তিনি সাক্ষী মানিতেন ইন্দ্র রায়কে। ইন্দ্র রায় মিথ্যা বলিলে তিনি হাসিয়া তাঁহার দাবি প্রত্যাহার করিয়া বলিতেন, তোমার সাক্ষী দেওয়ার ফী দিলাম ইন্দ্র। মিছেই খরচ ক'রে সাক্ষীদের তুমি জুতো কিনে দিলে। বাড়ী ফিরিয়া তিনি গ্রামে বড় একটা খাওয়া-দাওয়া জুড়িয়া দিতেন।

কিন্তু যে কালের গতিতে যদুপতি যান, তাঁহার মথুরাপুরীও গৌরব হারায়, সেই কালের প্রভাবেই বোধ করি সে রামেশ্বর আজ আর নাই। তিনি নাকি দৃষ্টিহীন হইয়া অন্ধকার ঘরে বিছানায় পড়িয়া আছেন ভূমিশায়ী জীর্ণ জয়স্তম্ভের মত। চোখে নাকি আলো একেবারে সহ্য হয় না। আর মস্তিষ্কও নাকি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সম্পত্তি পরিচালনা করে প্রাচীন নায়েব যোগেশ

মজুমদার; যোগেশ মজুমদারের অন্তরালে আছেন শান্ত বিষাদ প্রতিমার মত একটি নারীমূর্ত্তি—রামেশ্বরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুনীতি দেবী। দুইটি পুত্র—বড়টির বয়স আঠারো, ছোটটি সবে পনেরোয় পা দিয়াছে; সম্প্রতি মজুমদার সুনীতি দেবীকে অনেক বলিয়া কহিয়া বড়টিকে পড়া ছাড়াইয়া বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত করিয়াছেন। অবশ্য লেখাপড়াতেও তাহার অনুরাগ বলিয়া কিছু ছিল না। এই বিবাদ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই মজুমদার এবং রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহীন্দ্র এখানে নাই—তাহারা দূর মহালে গিয়াছে মহাল পরিদর্শনে। লোকে বুঝিল, হয় ইন্দ্র রায় প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষায় আছেন, নয় সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন, উপযুক্ত সময়ে ছোঁ মারিয়া বসিবেন।

চাষী প্রজারা এতটা বোঝে নাই, তাহারা সেদিন আসিয়া ইন্দ্র রায়কেই ধরিয়া বসিল, হুজুর, আপনি একটা বিচার ক'রে দ্যান।

অতি মৃদু হাস্যের সহিত অল্প একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন, কিসের রে?—যেন তিনি কিছুই জানেন না।—কার সঙ্গে ঝগড়া হ'ল তোদের?

উৎসাহিত হইয়া প্রজারা বলিল, আজ্ঞে, ওই লদীর উ-পারের চরটার কথা বলছি। ই-পারে আমাদের জমি খেয়ে তবে তো লদী উ-পারে উগ্‌রেছে; আমাদের জমি যে পয়োস্তি হ'ল—তার খাজনা তো আমরা কমি পাই নাই, আমরা তো বছর বছর লোকসান গুণে যাচ্ছি।

বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে রায় বলিলেন, বেশ তো লোকসান দিয়ে দরকার কি তোদের? লোকসানী জমা ইস্তাফা দিলেই পারিস। বাঁ হাতে গোঁফে তা দেওয়া রায়ের একটা অভ্যাস। লোকে বলে, ওই সঙ্গে তিনি মনে মনে বুদ্ধিতে পাক মারেন।

প্রজারা হতভম্বের মত রায়ের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আজ্ঞে, ই তা হ'লে বিচার কি করলেন আপনি?

হাসিয়া ইন্দ্র রায় বলিলেন, তোরা যা বলবি, তাতে সায় দেওয়ার নামই তো বিচার নয় রে। বিচারের তো একটা আইন আছে, সেই আইনমতেই তো জজকে রায় দিতে হয়।

প্রজারা হতাশ হইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। যাইবার পথে তাহারা পরামর্শ করিয়া উঠিল গিয়া রামেশ্বরবাবুর বাড়ী। কাছারিতে মালিক কেহ নাই, চাকরটা বলিল, বড়বাবুও নাই, নায়েববাবুও নাই, কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে তো দেখা হবে না।

প্রজারা গ্রামেরই লোক, তাহারা সকল সংবাদই রাখে, তাহারা জানে, এখন এ-বাড়ির সর্ব্ব কর্ম্মের অন্তরালে একটি অদৃশ্য শক্তি কাজ করে, পরমাশক্তির মত তিনিও নারীরূপিণী। তাহারা বলিল, আমরা মায়ের সঙ্গে দেখা করব।

চাকরটা অবাক হইয়া গেল, এমন ধারার কথা সে কখনও শোনে নাই। সে বলিল, তোমরা কি ক্ষেপেছ নাকি?

রামেশ্বরবাবুর ছোট ছেলে অহীন্দ্র পাশেই একখানা ঘরে পড়িতে-ছিল, সে এবার বাহির হইয়া আসিল। খাপখোলা তলোয়ারের মত রূপ—ঈষৎদীর্ঘ পাতলা দেহ, উগ্রগৌর দেহবর্ণ, পিঙ্গল চোখ, মাথার চুল পর্য্যন্ত পিঙ্গলাভ। তাহাকে দেখিয়া প্রজারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল। এ-বাড়ীর বড় ছেলে মহীন্দ্রকে দেখিয়া তাহাদের ভয় হয়, দশটা কথার পর মহীন্দ্র একটা জবাব দেয়, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া পর্য্যন্ত সে কখনও কথা বলে না। আর এই ছোটদাদাবাবুটির রূপ যতই উগ্র হউক না কেন, এমন নিঃসঙ্কোচ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, এমন মধুমাখা মিষ্ট কথা তাহারা কাহারও কাছে পায় না। গল্প লইয়া তাহাদের সহিত তাহার মিলনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন চাষীদের কাছে সাঁওতাল-বিদ্রোহের গল্প শুনিতে যায়, সে নিজে বলে দেশবিদেশের কত গল্প। সমুদ্রের ধারে সোমনাথ শিবমন্দির লুঠো

কথা, আমেরিকার সাহেবদের সঙ্গে বিলেতের সাহেবদের লড়াইয়ের কথা। তাহারা বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া শোনে। অহীন্দ্রকে দেখিয়া তাহারা পরম উৎসাহের সহিত বলিল, ছোটদাদাবাবু কবে এলেন?

অহীন্দ্র এখান হইতে দশ মাইল দূরে শহরের স্কুলে পড়ে। অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, কাল সন্ধ্যাবেলা এসেছি, চারদিন ছুটি আছে। তারপর তোমরা এসেছ কোথায়? দাদাও বাড়ী নেই, নায়েব-কাকাও নেই।

তাহারা বলিল, আপনি তো আছেন দাদাবাবু, আপনি আমাদের বিচার ক'রে দ্যান।

খিলখিল করিয়া হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, আমি বিচার করতে পারি নাকি, দূর দূর!

তাহারা ধরিয়া বসিল, না দাদাবাবু, আপনাকে আমাদের এ দুঃখের কথা শুন্‌তেই হবে। না শুন্‌লে আমরা দাঁড়াব কার কাছে? নইলে নিয়ে চলুন আমাদের মায়ের দরবারে। আমরা না খেয়ে প'ড়ে থাকব এইখানে।

অহীন্দ্র মায়ের কাছে গেল। সুনীতি স্বামীর জন্য আহার প্রস্তুত করিতেছিলেন। অহীন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিলেন, কি রে অহি?

মা ও ছেলের এক রূপ, তফাৎ শুধু চুল ও চোখের। মুখ, রং ও দেহের গঠনে অহি যেন মায়ের প্রতিবিম্ব—কেবল পিঙ্গল চুল ও চোখ তাহার পিতৃবংশের বৈশিষ্ট্য। সুনীতির বড় বড় কালো চোখ, চুলও ঘন কৃষ্ণবর্ণ। তাঁহার বড়ছেলে মহীর সহিত তাঁহার কোন সাদৃশ্যই নাই, সর্ব্ব অবয়বে সে তাহার পিতার অনুরূপ।

অহি সকল কথা মাকে বলিয়া বলিল, ওরা একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে মা। কি বলব ওদের? ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া মা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, সে কখনও হয় অহি? আমি কেন দেখা করব ওদের সঙ্গে? তুই এ-কথা বলতে এলি কি ব'লে?

অহি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল। মা হাসিয়া পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন, অমনি চললি যে?

অহি পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াই বলিল, বলি গে ওদের সেই কথা।

কই, একবার মুখখানা দেখি।

ছেলে ফিরিয়া দাঁড়াইল, মা তাহার চিবুকখানা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, এমন 'ফুলটুস' ছেলে আমি কোথাও দেখি নি। একেবারে ফুলের ঘায়েও রাগ হ'য়ে যায়।

সত্য কথা, মায়ের সামান্ত কথাতেই অহির অভিমান হইয়া যায়। এ সংসারে তাহার সকল আবদার একমাত্র মায়ের উপর। শৈশব হইতেই সে বাপের কাছে বড় ঘেঁষে না, তাহার বড় ভাই মহীন্দ্র বরং পিতার কাছে কাছে ফিরিয়া থাকে। দুই ভাই প্রকৃতিতে যেন বিপরীত। মহীন্দ্র অভিমান জানে না, সে জানে দুর্দ্দান্ত ক্রোধে আত্মহারা হইয়া আঘাত করিতে, শক্তিবলে আপনার ঈপ্সিত বস্তু মানুষের কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতে। ইস্পাতের মত সে ভাঙিয়া পড়ে, তবু কোনমতেই নত হয় না। আর অহি খাঁটি সোনার মত নমনীয়—আঘাতে ভাঙে না, অভিমানে বাঁকিয়া যায়।

মা আবার প্রশ্ন করিলেন, রাগ হ'ল তো অমনি?

না।

না কেন? আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তুই বুঝি ওদের বলেছিস, মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিবি?

অহি বলিল, বলি নি, কিন্তু দেখা করতে ক্ষতি কি?

ক্ষতি নেই, বলিস কি তুই? রায়-বাবুরা যে হাসবে, বলবে, বাড়ীর বউ হয়ে চাষা প্রজাদের সঙ্গে কথা কইলে!

বলুক গে। তাই ব'লে ওরা ওদের দুঃখের কথা বলতে এলে শুনবে না? আর, এমনধারা মুসলমান নবাববাড়ীর মত পর্দ্দার

দরকারই বা কি? আজকাল মেয়েরা দেশের কাজ করছে। ইউরোপে—এই যুদ্ধে—

বাধা দিয়া মা হাসিয়া বলিলেন, তোর মাষ্টারিতে আর আমি পারি নে অহি। তা তুই নিজে শুনে যা বলতে হয় বল্ না; সেইটেই আমার বলা হবে। আমি মহীকে বলব, আমিই বলেছি এ কথা।

ছেলে জেদ ধরিল, না, সে হবে না, তোমাকেই শুনতে হবে। আমি বরং দরজায় দাঁড়িয়ে থাকব। ওরা বাইরে থাকবে, তুমি ঘরে থাকবে।

শেষে তাহাই হইল। অহীন্দ্রকে মধ্যে রাখিয়া সুনীতি প্রজাদের অভিযোগ শুনিতে বসিলেন। তাহারা আপনাদের যুক্তিমত দাবি জানাইয়া সমস্ত বৃত্তান্তই নিবেদন করিল, প্রকাশ করিল না শুধু ইন্দ্র রায়ের নিকট শরণ লইতে যাওয়ার কথা এবং রায়-মহাশয়ের সুকৌশলে প্রত্যাখ্যানের কথা। তাহারা বক্তব্য শেষ করিয়া বলিল, আপনার চরণে আমরা আশ্চয় নিলাম মা, আপনি ইয়ের ধর্ম্মবিচার ক'রে দ্যান। কালীর গেরাসে আমাদের সবই গিয়েছে মা, আমাদের আলু লাগাবার জমি নাই, আখ লাগাবার জায়গা নাই, আর কি বলব মা—চাষীর বাড়ীতে ছোলার ঝাড় ওঠে না, গম ওঠে না। আমরা তবু তো কখনও খাজনা না-দেওয়া হই নাই।

সুনীতি বলিলেন, তোমরা বরং ও-বাড়ীর দাদার কাছে যাও। অহিকে তোমাদের সঙ্গে দিচ্ছি। ও-বাড়ীর দাদা অর্থে ইন্দ্র রায় মহাশয়। প্রজারা ইন্দ্র রায়ের নাম শুনিয়া নীরব হইয়া গেল। রংলাল চট করিয়া বুদ্ধি করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মা, উনি জমিদার বটেন; কিন্তু বুদ্ধিতে উনি জেলাপির পাক। যা করতে হয় আপুনি ক'রে দ্যান!

সুনীতি বলিলেন, ছি বাবা, এমন কথা কি বলতে হয়? তিনিই

হলেন এখন গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। এ-বাড়ীর মালিকের অসুখের কথা তোমরা তো জান। মহী হাজার হলেও ছেলেমানুষ। আমি স্ত্রীলোক। সমস্ত গ্রামের জমিদার নিয়ে যে বিবাদ, তার মীমাংসা কি আমার দ্বারা হয় বাবা? যদি কখনও ভগবান মুখ তুলে চান, মহী অহি উপযুক্ত হয়, তবেই আবার তোমাদের অভাব-অভিযোগের বিচার এ-বাড়ীতে হতে পারবে। এখন তোমরা ও-বাড়ীর দাদার কাছেই যাও। অহি তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

প্রজাদের মধ্যে রংলালই আবার বলিল, আজ্ঞে মা, তিনিও খামচ তুলেছেন। সেই তো আমাদের ভয়, নইলে অন্য জমিদারের সঙ্গে লড়তে আমাদের সাহস আছে। না হয় দশ টাকা খরচ হবে।

সুনীতি বলিলেন, তিনিও কি চরটা দাবি করেছেন নাকি?

মুখে বলেন নাই, কিন্তু ভঙ্গী সেই রকমই বটে। গাঁসুদ্ধ জমিদারই দাবি করেছে মা, আমরাও দাবি করছি, আবার মহাজনেরাও এসে জুটেছে। দাবি করেন নাই শুধু আপনারা। অথচ—

অথচ কি মোড়ল? ওতে কি আমাদেরও অংশ আছে?

বার বার হতাশার ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়া রংলাল বলিল, কি আর বলি মা? আর বলবই বা কাকে? আইনে তো বলছে, চর যে-গাঁয়ের লাগাড় হয়ে উঠবে, সেই গাঁয়ের মালিক পাবে। তা চরখানি তো রায়হাটের সঙ্গে লেগে নাই। লেগে আছে উ-পারের চক আফজল-পুরের সঙ্গে। তা আফজলপুর তো আপনাদেরই ষোল আনা। আর ই-পারে হ'লেও তো তারও আপনারা তিন আনা চার গণ্ডার মালিক।

অন্য প্রজারা রংলালের কথায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। মানুষ বৃদ্ধ হইলে ভীমরতি হয়, নহিলে দাবি জানাইতে আসিয়া এ কি বলিতেছে বুড়া! সুনীতি একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, দেখ বাবা, তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমরা দাবি করছ,

চর তোমাদের প্রাপ্য, এ-পারে কালী নদীতে জমি তোমাদের গেছে, ও-পারের চরে সেটা তোমাদের পেতে হবে। আবার—

মধ্যপথেই বাধা দিয়া লজ্জিতভাবে রংলাল বলিল, বলছি বৈকি মা, সেটা হ'ল ধর্ম্মবিচারের কথা। আপনি বলেন, ধর্ম্ম অনুসারে আমাদের পাওনা বটে কি না?

সুনীতি নীরবেই কথাটা ভাবিতেছিলেন, পাওয়া উচিত বৈকি। দরিদ্র চাষী প্রজা—আহা-হা!

রংলাল অবার বলিল, আর আমি যা বলছি—ই হ'ল আইনের কথা। আইন তো আর ধর্ম্মের ধার ধারে না। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোই হ'ল আইনের কাজ।

সুনীতি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া শেষে বলিলেন, আচ্ছা, আজই আমি মহীকে আর মজুমদার ঠাকুরপোকে আসতে চিঠি লিখে দিচ্ছি। তাঁরা এখানে আসুন; তারপর তোমরা এস। তবে এ-কথা ঠিক, তোমাদের ওপর কোন অবিচার হবে না।

রংলাল আবার বলিল, শুধু যেন আইনই দেখবেন না মা, ধর্ম্ম-পানেও একটুকুন তাকাবেন।

সুনীতি বলিলেন, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে কি কিছু করা যায় বাবা? কোন ভয় নেই তোমাদের। প্রজারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সুনীতি বলিলেন, তুই ও-বেলা একবার ও-বাড়ীর দাদার কাছে যাবি অহি।

২

সুনীতি রায়-বংশের ছোট বাড়ীর মালিক ইন্দ্র রায়কে বলেন—দাদা। কিন্তু ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। ইন্দ্র

রায় রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর প্রথমা পত্নী রাধারাণীর সহোদর। চক্রবর্ত্তী-বংশের সহিত রায়-বংশের বিরোধ আজ তিন পুরুষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; রায়-বংশের সকলেই চক্রবর্ত্তীদের প্রতি বিরূপ, কিন্তু এই ছোট বাড়ীর সহিতই বিরোধ যেন বেশি। তবুও আশ্চর্য্যের কথা, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সহিত ছোট বাড়ীর রায়-বংশের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল।

তিন পুরুষ পূর্ব্বে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল। রায়েরা শ্রোত্রিয় এবং চক্রবর্ত্তী-বংশ কুলীন। সেকালে শ্রোত্রিয়গণ কন্যা সম্প্রদান করিতেন কুলীনের হাতে। রামেশ্বরের পিতামহ পরমেশ্বর রায়-বংশের মাঝের বাড়ীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ করিয়াও তিনি শ্বশুর-বর্ত্তমানে কখনও স্থায়ীভাবে শ্বশুরালয়ে বাস করেন নাই। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি যেদিন এখানে আসিয়া মালিক হইয়া বসিলেন, রায়েদের সহিত তাঁহার বিবাদও বাধিল সেই দিনই। সেদিনও রায়দের মুখপাত্র ছিলেন ওই ছোট বাড়ীরই কর্ত্তা—এই ইন্দ্র রায়ের পিতামহ রাজচন্দ্র রায়। সেদিন পরমেশ্বর চক্রবর্ত্তীর শ্বশুরের অর্থাৎ রায়-বংশের মাঝের বাড়ীর কর্ত্তার শ্রাদ্ধবাসর। রাজচন্দ্র রায়ের উপরেই শ্রাদ্ধের সকল বন্দোবস্তের ভার ন্যস্ত ছিল। মজলিসে বসিয়া রাজচন্দ্র গড়গড়ার নল টানিয়া পরমেশ্বর চক্রবর্ত্তীর হাতে তুলিয়া দিলেন। পরমেশ্বর নলটি না টানিয়াই রায়-বংশধরের হাতে সমর্পণ করিলেন। তারপর নিজের ঝুলি হইতে ছোট একটি হুঁকা ও কল্কে বাহির করিয়া একজন চাকরকে বলিলেন, কোন ব্রাহ্মণকে দে, জল সেজে এই কল্কেতে আগুন দিয়ে দিক। তিনি ছিলেন পরম তেজস্বী তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ।

রাজচন্দ্র সম্বন্ধে পরমেশ্বরের শ্যালক, তিনি বলিলেন, ভণ্ডামিটুকু খুব আছে কুলীনদের।

হাসিয়া পরমেশ্বর বলিলেন, গুণ্ডামির চেয়ে ভণ্ডামি অনেক ভাল রায় মশায়।

রাজচন্দ্র উত্তর দিলেন, গুণ্ডামির অর্জ্জিত ভূ-সম্পত্তি কিন্তু বড়ই উপাদেয়। কথাটি শুনিয়া রায়-বংশের সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পরমেশ্বর কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলেন না, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু-হাস্যের সহিত উত্তর দিলেন, শুধু ভূমি-সম্পত্তিই নয় রায় মশায়, গুণ্ডাদের কন্যাগুলিও রত্নস্বরূপা ; যদিও দুষ্কুলাৎ।

এবার মজলিসে যে যেখানে ছিল, সকলেই হাসিয়া উঠিল ; হাসিলেন না কেবল রায়েরা। ফলে গোলও বাধিল। শ্রাদ্ধ অন্তে ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় রায়েরা একজোট হইয়া বলিলেন, পরমেশ্বর চক্রবর্ত্তী আমাদের সঙ্গে এক গড়গড়ায় তামাক না খেলে আমরাও অন্ন গ্রহণ করব না।

পরমেশ্বর আপনার ছোট হুঁকাটিতে তামাক টানিতে টানিতেই বলিলেন, তাতে চক্রবর্ত্তী-বংশের কোন পুরুষের অধোগতি হবে না। ব্রাহ্মণ-ভোজনের অভাবে অধোগতি হ'তে রায়-বংশেরই হবে।

অতঃপর রায়দের মাথা হেঁট করিয়া খাইতে বসিতে হইল। কিন্তু উভয় বংশের মনোজগতের মধ্যবর্ত্তী স্থলে বিরোধের একটি ক্ষুদ্র পরিখা খনিত হইল সেই দিন।

পরমেশ্বর ও রাজচন্দ্রের সময়ে বিরোধের যে পরিখা খনিত হইয়াছিল, তাহা শুধু দুই বংশের মিলনের পক্ষে বাধা হইয়াই প্রবাহিত হইত, গ্রাস কিছুই করে নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের পুত্র সোমেশ্বরের আমলে পরিখা হইল তটগ্রাসিনী তটিনী ; সে তট ভাঙিয়া কালী নদীর মত সম্পত্তি গ্রাস করিতে শুরু করিল। মামলা-মকদ্দমার সৃষ্টি হইল। রাজচন্দ্রের পুত্র তেজচন্দ্রই প্রথমটা ঘায়েল হইয়া

পড়িলেন। সোমেশ্বরের একটা সুবিধা ছিল, সমগ্র সম্পত্তিরই মালিক ছিলেন সোমেশ্বরের জননী। সোমেশ্বরের মাতামহ দলিল করিয়া সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন কন্যাকে, কাজেই সোমেশ্বরের দায়ে তাঁহার সম্পত্তি স্পর্শ করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। এই সময়ে বীরভূমের ইতিহাস-বিখ্যাত সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়। সোমেশ্বর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সাঁওতালদের সহিত যোগ দিয়া বসিলেন। কপালে সিন্দূরের ফোঁটা আঁকিয়া তিনি নাকি সাঁওতাল-বাহিনী পরিচালনাও করিয়াছিলেন। এই লইয়া মাতা-পুত্রে বচসা হয়, পুত্র তখন বিদ্রোহের উন্মাদনায় উন্মত্ত, সে মাকে বলিয়া বসিল তুমি বুঝবে না এর মূল্য, শ্রোত্রিয়েরা চিরকাল রাজসরকারের প্রসাদ-ভোজী, সেই দাসের রক্তই তো তোমার শরীরে।

মা সর্পিণীর মত ফণা তুলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কি বললি? এত বড় কথা তোর? তা, তোর দোষ কি, পরের অন্নে যারা মানুষ হয় তাদের কথাটা চিরকাল বড় বড় হয়, সুর পঞ্চমে উঠেই থাকে।

সোমেশ্বর বলিলেন, তোমার কথার উত্তর তুমি নিজেই দিলে, কাকের বাসায় কোকিল মানুষ হয়, সুর তার পঞ্চমে ওঠে, সেটা তার জাতের গুণ, কাক তাতে চিরকাল ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে।

ওদিকে তখন তেজচন্দ্র সদরে সাহেবদের নিকট হরদম লোক পাঠাইতেছেন। সে সংবাদ সোমেশ্বরও শুনিলেন, তাঁহার মাও শুনিলেন। সোমেশ্বর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, রায়হাট ভূমিসাৎ ক'রে দেব, রায়-বংশ নির্ব্বংশ ক'রে দেব আমি।

সত্য বলিতে গেলে, সে গর্জ্জন তাঁহার শূন্যগর্ভ কাংস্যপাত্রের নিনাদ নয়, তাঁহার অধীনে তখন হাজারে হাজারে সাঁওতাল উন্মত্ত শক্তি লইয়া ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে। সোমেশ্বরের গৌরবর্ণ, রূপ, পিঙ্গল চোখ, পিঙ্গল চুল দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি

করিত, বলিত, রাঙা-ঠাকুর। সোমেশ্বরের মা পিতৃবংশের মমতায় বিহ্বল হইয়া পুত্রের পা দুইটা চাপিয়া ধরিলেন। সোমেশ্বর সর্পদষ্টের মত চমকিত হইয়া সরিয়া আসিয়া নিতান্ত অবসন্নের মত বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, তুমি করলে কি মা, এ তুমি করলে কি? বাপের বংশের মমতায় আমার মাথায় বজ্রাঘাতের ব্যবস্থা করলে?

মা ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া লক্ষ আশীর্ব্বাদ করিলেন, ছেলে তাহাতে বুঝিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সোমেশ্বর বলিলেন, এ পাপের ক্ষালন নেই মা, তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, রায়-বংশের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করবে না।

সেই রাত্রেই তিনি নীরবে গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন, একবস্ত্রে নিঃসম্বল অবস্থায়, হাতে শুধু এক উলঙ্গ তলোয়ার। ঘর ছাড়িয়া সাঁওতালদের আস্তানা শাল-জঙ্গলের দিকে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন, পিছন হইতে কে বলিল, এত জোরে হাঁটতে যে আমি পারছি না গো? একটু আস্তে চল।

চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া সোমেশ্বর দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী শৈবলিনী তাঁহার পিছন পিছন আসিতেছেন। তিনি স্তম্ভিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমি কোথায় যাবে?

শৈবলিনী প্রশ্ন করিলেন, আমি কোথায় থাকব?

কেন, ঘরে মায়ের কাছে।

তারপর যখন সাহেবরা আসবে, তোমায় জব্দ করতে আমায় ধ'রে নিয়ে যাবে?

হুঁ। কথাটা সোমেশ্বরের মনে হয় নাই। সম্মুখেই গ্রামের সিদ্ধপীঠ সর্ব্বরক্ষার আশ্রম। সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সোমেশ্বর বলিলেন, দাঁড়াও, ভেবে দেখি। খোকাকে রেখে এলে! যেন সেটাও তাঁহার মনঃপূত হয় নাই।

শৈবলিনী বলিলেন, সে তো মায়ের কাছে! মাকে তো জাগাতে পারলাম না।

বহুক্ষণ পদচারণা করিয়া সোমেশ্বর বলিলেন, হয়েছে। মায়ের কাছ ছাড়া আর রক্ষা পাবার স্থান নাই। এইখানেই তুমি থাকবে।

বিস্মিত হইয়া শৈবলিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, এখানে লুকিয়ে থাকবার মত জায়গা আছে নাকি?

আছে। ভক্তিভরে মাকে প্রণাম কর, আশ্রয় ভিক্ষা কর। মাকে অবিশ্বাস ক'রো না।

হিন্দুর মেয়ে—প্রায় এক শত বৎসরের পূর্ব্বের হিন্দুর মেয়ে এ-কথা মনে প্রাণেই বিশ্বাস করিত! শৈবলিনী পরম ভক্তিভরে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণতা হইলেন।

পরমুহূর্ত্তে রক্তাক্ত অসি উদ্যত করিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া অথবা কাঁদিয়া নীরব স্তব্ধ নৈশ আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া সোমেশ্বর শাল-জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। শাল-জঙ্গল তখন মশালের আলোয় অদ্ভুত ভয়াল শ্রী ধারণ করিয়াছে, উপরে নৈশ অন্ধকার, আর অন্ধকারের মত গাঢ় জমাট অখণ্ড নিবিড় বনশ্রী—মধ্যস্থলে আলোকিত শালকাণ্ডের ঘন সন্নিবেশ ও মাটির উপর তাহাদের দীর্ঘছায়া, তাহারই মধ্যে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া সিন্দূরে চিত্রিত মুখ রক্তমুখ দানবের মত হাজার সাঁওতাল। একসঙ্গে প্রায় শতাধিক মাদল বাজিতেছে—ধিতাং ধিতাং, ধিতাং ধিতাং। থাকিয়া থাকিয়া হাজার সাঁওতাল একসঙ্গে উল্লাস করিয়া কুক দিয়া উঠিতেছে—উ—র্—র্! উ—র্—র্!

সোমেশ্বর হাজার সাঁওতাল লইয়া অগ্রসর হইলেন; একটা থানা লুট করিয়া, গ্রাম পোড়াইয়া, মিশনারিদের একটা আশ্রম ধ্বংস করিয়া, কয়েকজন ইংরেজ নরনারীকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া অগ্রসর হইলেন। পথে ময়ূরাক্ষী নদী। নদীর ও-পারে বন্দুকধারী ইংরেজের

ফৌজ। সোমেশ্বর আদেশ করিলেন, আর এগোস না যেন, গাছের আড়ালে আড়ালে দাঁড়া।

ও-দিক হইতে ইতিমধ্যে ইংরেজের ফৌজ ভয় দেখাইবার জন্য ফাঁকা আওয়াজ আরম্ভ করিল। সাঁওতালরা সবিস্ময়ে দেখিল, তাহারা অক্ষতই আছে—কাহারও গায়ে একটি আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে নাই। সেই হইল কাল। গুলি আমরা খেয়ে লিলম!—বলিয়া উন্মত্ত সাঁওতালের দল ভরা ময়ূরাক্ষীর বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তে ও-পারে আবার বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবার ময়ূরাক্ষীর গৈরিক জলস্রোত রাঙা হইয়া গেল—মৃতদেহ ভাসিয়া গেল কুটার মত। সোমেশ্বর চিত্রার্পিতের মতই তটভূমির উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনিও এক সময় তটচ্যুত বৃক্ষের মত ময়ূরাক্ষীর জলে নিপাতিত হইলেন—বুকে বিঁধিয়া রাইফেলের গুলি পিঠ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

অতঃপর সোমেশ্বরের মা পৌত্র রামেশ্বরকে লইয়া লড়াই করিতে বসিলেন—সরকার বাহাদুরের সঙ্গে। সরকার সোমেশ্বরের অপরাধে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে চাহিলেন। সোমেশ্বরের মা মকদ্দমা করিলেন—সম্পত্তি তাঁহার, সোমেশ্বরের নয়। আর সরকার-বিরোধী সোমেশ্বরকে তিনি ঘরেও রাখেন নাই, সুতরাং সোমেশ্বরের অপরাধে তাঁহার দণ্ড হইতে পারে না।

সরকার হইতে তলব হইল রায়বাবুদের, তাহার মধ্যে তেজচন্দ্র প্রধান। তাঁহাদের কাছে জানিতে চাহিলেন, সোমেশ্বরের মায়ের কথা সত্য কি না। বিদ্রোহী-সোমেশ্বরের সহিত সত্যই তিনি কোন সম্বন্ধ রাখেন নাই কি না!

বাড়ী হইতে বাহির হইবার মুখে তেজচন্দ্রের মা বলিলেন, ও-বাড়ীর

ঠাকুরঝি রায়-বংশকে বাঁচাবার জন্য সোমেশ্বরের পায়ে ধরেছিলেন। আমাকেও কি—

তাড়াতাড়ি মায়ের পদধূলি লইয়া তেজচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, তোমার সঙ্গে তো তোমার ঠাকুরঝির পাতানো সম্বন্ধ মা, আমার সঙ্গে যে ওঁর রক্তের সম্বন্ধ।

মা বলিলেন, আশীর্ব্বাদ করি, সেই সুমতিই হোক তোমাদের। কিন্তু কি জান, রায়বাবুদের বোনকে ভালবাসা—কংসের ভালবাসা।

তেজচন্দ্র বলিলেন, চক্রবর্ত্তী জয়দ্রথের গুষ্ঠী মা, শ্যালক-বংশ নাশ ক'রতে ব্যূহমুখে সর্ব্বাগ্রে থাকেন ওঁরা। যাকগে—ফিরে আসি, তারপর বিচার ক'রে যা করতে হয় ক'রো, যা বলতে হয় ব'লো।

সেখানে রায়-বংশীয়েরা একবাক্যে রায়-বংশের কন্যাকে সমর্থন করিয়া আসিলেন। তেজচন্দ্রের জননীকে কিছু বলিতে বা করিতে হইল না—স্বয়ং সোমেশ্বরের জননীই পৌত্র রামেশ্বরের হাত ধরিয়া রায়-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যারতির সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিতে তিনি কিছু পারিলেন না, কিন্তু প্রতিজনের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তেজচন্দ্র রামেশ্বরকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তাঁহার মা ননদের হাত ধরিয়া বলিলেন, বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে হবে।

বাড়ীতে ঢুকিয়া তেজচন্দ্রের মা বলিলেন, রাধি, আসন নিয়ে আয়।

রাধি—রাধারাণী—তেজচন্দ্রের সাত বৎসরের কন্যা। সে একটা কি করিতেছিল, সে জবাব দিল, আমি কি তোমার ঝি নাকি? বল না ঝিকে।

কঠোর-স্বরে ঠাকুরমা বলিলেন, উঠে আয় বলছি হারামজাদী।

হাসিয়া সোমেশ্বরের মা বলিলেন, কেন ধাঁটাচ্ছ ভাই বউ; আমাদের বংশের মেয়ের ধারাই ওই। আমারও তাই—রায়-বাড়ীর মেয়ে চিরকেলে জাহাঁবাজ।

বলবেন, ছাড়বি না। আমি ধরেছি, রামেশ্বরের সঙ্গে রাধুর বিয়ের জন্য।

তেজচন্দ্র পিসিমার পাদস্পর্শ করিয়াই বসিয়া ছিলেন। এ কথাটা শুনিয়া তাঁহারও মন পুলকিত হইয়া উঠিল। রামেশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তাহাকে তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে। তাহার উপর আজিকার এই প্রণাম-আশীর্ব্বাদের বিনিময়ের ফলে মন হইয়াছিল মিলনাকাঙ্ক্ষী; কথাটা শুনিবামাত্র তেজচন্দ্র সত্যই সোমেশ্বরের মায়ের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

তেজচন্দ্রের মা বলিলেন, আমি তোমায় মিনতি করছি ঠাকুরঝি, 'না' তুমি ব'লো না। এ সর্ব্বনেশে ঝগড়ার শেষ হোক, সেতু একটা বাঁধ।

সোমেশ্বরের মায়ের চোখে জল আসিল। তিনি নিজে রায়-বংশের কন্যা, আপনার পিতৃকুলের সহিত এই আক্রোশভরা দ্বন্দ্ব তাঁহারও ভাল লাগে না। চক্রবর্ত্তীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে রায়েদের পরাজয় ঘটিলে, অন্তরালে লোকে তাঁহাকে বংশনাশিনী কন্যা বলিয়া অভিহিত করে, সে-সংবাদ ও তাঁহার অজানা নয়। আর, রামেশ্বর সবেমাত্র দশ বৎসরের বালক, এদিকে তাঁহার জীবন-প্রদীপেও তৈল নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে; তাঁহার অন্তে রামেশ্বরকে এই রায়-জনাকীর্ণ রায়হাটে দেখিবে কে, এ-ভাবনাও তাঁহার কম নয়। তিনি আর দ্বিধা করিলেন না, সজল চক্ষে বলিলেন, তাই হোক বউ, রামেশ্বরকে তেজচন্দ্রের হাতেই দিলাম।—বলিয়া তিনি রাধারাণীকে কোলে তুলিয়া লইলেন, তাহার কানে কানে বলিলেন, কি ভাই বর পছন্দ তো?

রাধারাণী রামেশ্বরের দিকে চাহিয়া দেখিয়া আবার সোমেশ্বরের মায়ের কাঁধে মুখ লুকাইয়া বলিল, বাবা কি কটা চোখ!

সোমেশ্বরের মা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, রায়-বংশের মেয়ে জব্দ ক'রতে চক্রবর্ত্তী-বংশ সিদ্ধহস্ত। তখন তেজচন্দ্রের বাড়ীখানা শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেতুবন্ধ রচিত হইল।

তেজচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সেতুর উপর লোকচলাচলের বিরাম ছিল না। রাধারাণী এ-বাড়ী হইতে ও-বাড়ী যাইত আসিত, রামেশ্বর আসিতেন যাইতেন, তেজচন্দ্র স্বয়ং একবেলা রামেশ্বরের কাছারিতে বসিয়া হিসাব-নিকাশ কাগজ-পত্র দেখিতেন, অন্দরে রাধারাণীর মা করিতেন গৃহস্থালির তদারক।

সেকালে উচ্চশিক্ষার সুযোগ তেমন ছিল না, কিন্তু তেজচন্দ্র পুত্র-জামাতার শিক্ষার জন্য যথাসাধ্য করিয়াছিলেন; পুঁথি-বই সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিত মৌলবী দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ইন্দ্রচন্দ্র ফারসীতে পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন, আইনের বইয়ে তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। রামেশ্বর পড়িতেন কাব্য।

ইন্দ্রচন্দ্র হাসিয়া বলিতেন, কাব্য আর প'ড়ো না; জান তো, রসাধিক্য হ'লে বিকার হয়।

রামেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন, আহা বন্ধু, তোমার বাক্য সফল হোক, হোক আমার রসবিকার। রায়-বংশের 'তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি'রা ঘিরে বসুক আমাকে, পদ্মপত্র দিয়ে বীজন করুক, চন্দনরসে অভিষিক্ত ক'রে দিক আমার অঙ্গ—

বাধা দিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বলিতেন, থাম, ফক্কর কোথাকার! রামেশ্বর আপন মনেই আওড়াইতেন, শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রাস্তনাভ্যাং। ইহার ফলে সত্যসত্যই রামেশ্বর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। বাড়ীর মধ্যে রাধারাণী, রায়-বাড়ীর স্বভাব-মুখরা মেয়ে,

কঠোর কলহ-পরায়ণা হইয়া উঠিল। তেজচন্দ্রের পরলোকগমনের পর রায়-বংশের মেয়ে ও চক্রবর্ত্তীবংশের ছেলের কলহ আবার ঘটনাচক্রে উভয় বংশে সংক্রামিত হইয়া পড়িল।

সেদিন রাধারাণী স্বামীর সহিত কলহ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যায় রামেশ্বর একগাছি বেলফুলের মালা গলায় দিয়া চারিদিকে আতরের সৌরভ ছড়াইতে ছড়াইতে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উঠিলেন। ইন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সম্ভাষণও করিলেন না, রামেশ্বর নিজেই আসন পরিগ্রহ করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, নমস্তভ্যং শ্যালকপ্রবরং কঠোরং কুন্তবদনং—

বাধা দিয়া ইন্দ্রচন্দ্র বলিলেন, তুমি অতি ইতর!

রামেশ্বর বলিলেন, শ্রেষ্ঠ রস যেহেতু মিষ্ট এবং মিষ্টান্নে যেহেতু ইতরেরই একচেটিয়া অধিকার, সেই হেতু ইতর আখ্যায় ধন্যোহং। তা হ'লে মিষ্টান্নের ব্যবস্থা ক'রে ফেল।

আদরের ভগ্নী রাধারাণীর মনোবেদনার হেতু রামেশ্বরকে ইন্দ্র রায় ইহাতেও মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না, তিনি আর কথা না বাড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রামেশ্বরও আর অপেক্ষা করিলেন না, তিনি উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, নাঃ, অরসিকেষু রস নিবেদনটা নিতান্ত মূর্খতা। চললাম অন্দরে।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনি ডাকিলেন, কই, সখী মদলেখা কই?

শ্যালক ইন্দ্রচন্দ্রের পত্নী হেমাঙ্গিনীকে তিনি বলিতেন—সখী মদলেখা। তাঁহাদের কথোপকথন হইত মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীর ভাষায়। স্বয়ং রামেশ্বর তাঁহাদিগকে কাদম্বরী পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

হেমাঙ্গিনী আদর করিয়া রাধারাণীর নামকরণ করিয়াছিলেন,

কাদম্বরী। রামেশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন, তা হ'লে রায়-গিন্নীকে যে নর্ম্মসহচরী 'মদলেখা' হতে হয়।

হেমাঙ্গিনী বলিয়াছিলেন, তা হ'লে আপনি আমাদের 'চন্দ্রাপীড' হলেন তো?

কাদম্বরীর সম্বন্ধনির্ণয়-সূত্রানুসারে অবশ্যই হতে হয়; না হয়ে উপায় কি? আর আমার জন্মকুণ্ডলীতেও নাকি লগ্নে আছেন চন্দ্রদেবতা, সুতরাং মিলেও নাকি যাচ্ছে খানিকটা?

খানিকটা! বিস্ময় প্রকাশ করিয়া হেমাঙ্গিনী বলিয়াছিলেন, খানিকটা। বিনয় প্রকাশ করছেন যে! রূপে গুণে ষোল-আনা মিল যে। রূপের কথা দর্পণেই দেখতে পাবেন। আর গুণেও কম যান না। দিবসে সমস্ত দিনটিই নিদ্রা, উদয় হয় সন্ধ্যার সময়; আর চন্দ্রদেবতার তো সাতাশটি প্রেয়সী, আপনার কথা আপনি জানেন; তবে হার মানবেন না, এটা হলফ ক'রেই বলতে পারি।

সেদিন অর্থাৎ এই নামকরণের দিন, রাধারাণীর অভিমান রামেশ্বর সন্ধ্যাতেই ভাঙাইয়াছিলেন, কাজেই রাধারাণী এ কথায় উগ্র না হইয়া শ্লেষভরে বলিয়াছিল, আমাদের দেশে কুলীনের ছেলেরা সবাই চন্দ্রলগ্ন পুরুষ, কারু এক শ বিয়ে, কারু এক শ ষাট। কপালে আগুন কুলীনের!

জোড়হাত করিয়া রামেশ্বর বলিয়াছিলেন, দেবী, সে অপরাধে তো অপরাধী নয় এ দাস। আর আজ থেকে, এই নবচন্দ্রাপীড়জন্মে চন্দ্রাপীড় দাসখত লিখে দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, রাধারাণী-কাদম্বরী ছাড়া সে আর কাউকে জানবে না।

রাধারাণী তর্জ্জনী তুলিয়া শাসন করিয়া বলিয়াছিল, দেখো, মনে থাকবে তো!

আজ রামেশ্বরের আহ্বান শুনিয়া হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, আসুন দেবতা, আসুন।

চাপা-গলায় সশঙ্ক ভঙ্গীতে রামেশ্বর বলিলেন, আপনার দেবী কাদম্বরী কই?

আসন পাতিয়া দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বসুন। তারপর গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, না চক্রবর্ত্তী মশায়, এবার আপনার নিজেকে শোধরানো উচিত হয়েছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রামেশ্বর বলিলেন, চেষ্টা আমি করি রায়-গিন্নী, কিন্তু পারি না।

'পারি না' বললে চলবে কেন? আপনার ব্যবহারে বিতৃষ্ণায় রাধুর চিত্তেই যদি বিকার উপস্থিত হয়, তখন কি করবেন বলুন তো?

রামেশ্বর একদৃষ্টে শ্যালক-পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, হুঁ, কেমন মনে হচ্ছে? তার চেয়ে সাবধান হোন এখন থেকে। রাধুর মন আজ যা দেখলাম, তাতে আত্মহত্যা করা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সময় থেকে সাবধান হোন।

রামেশ্বর নিজে উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র; তিনি হেমাঙ্গিনীর 'বিকার' শব্দের নূতন বিশ্লেষণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বিকার শব্দের যে অর্থ তিনি গ্রহণ করিলেন, শাস্ত্র সেই অর্থই অনুমোদন করে, এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রের মত ক্ষেত্রে সেই বিকার হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু তিনি রাগ করিতে পারিলেন না, শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত, মনে মনে তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন রায়-গিন্নী, হয় নিজেকে সংশোধন করব, নয় ব্রাহ্মণের উপবীত পরিত্যাগ করব।

হেমাঙ্গিনী আশ্বস্ত হইয়া এইবার হাসিমুখে বলিলেন, তবে চলুন চন্দ্রাপীড়, দেবী কাদম্বরী মান ও বিরহতাপিতা হয়ে হিমগৃহে অবস্থান করছেন। আসুন, অধীনী মদলেখা এখনই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবে।

দোতলার লম্বা দরদালানে প্রবেশদ্বারের সম্মুখেই মায়ের ঘরে

রাধারাণী শুইয়া ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর ঘরখানি বন্ধই থাকে, রাধারাণী আসিলে সে-ই ব্যবহার করে। দরদালানে প্রবেশ করিয়াই রামেশ্বর থমকিয়া দাঁড়াইলেন। রাধারাণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একটি তরুণকান্তি যুবক কি একখানা বই পড়িয়া রাধারাণীকে শুনাইতেছে।

ওটি কে, রায়-গিন্নী ?

রামেশ্বরের সচকিত ভাব দেখিয়া হেমাঙ্গিনী কৌতুকপ্রবণা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, দেব, উপেক্ষিতা কাদম্বরী দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য সম্প্রতি এই তরুণকান্তি কেয়ূরককে আমরা নিযুক্ত করেছি।

ছেলেটি রাধারাণীর পিসতুতো ভাই। পিতৃমাতৃহীন হইয়া সে মামার বাড়ীতে আশ্রয় লইতে আসিয়াছে আজই।

ইহার পর সমস্ত ঘটনা রহস্যের আবরণে আবৃত, সেইজন্যই সংক্ষিপ্ত। জানেন একমাত্র রামেশ্বর আর জানিত রাধারাণী। তবে ইহার পর দিন হইতে সেতুেত যেন ফাট ধরিল। রাধারাণীর পিত্রালয়ে আসা বন্ধ হইয়া গেল। রামেশ্বর নিজে হইয়া উঠিলেন কঠোর নিষ্ঠাপরায়ণ ব্রাহ্মণ, অন্য দিক দিয়া একাগ্রচিত্তে বিষয়-অনুরাগী। বাল্যকালে রামেশ্বরের যে পিঙ্গল চোখ দেখিয়া রাধারাণী ভয় পাইয়াছিল, সে চোখ কৌতুক-সরসতা হারাইয়া এমন তীব্র হইয়া উঠিল যে, রাধারাণী ভয় না করিয়া পারিল না। ওদিকে রায়বংশের সহিত আবার খুঁটিনাটি আরম্ভ হইয়া গেল। পরস্পরের যাওয়া-আসা সংক্ষিপ্ত হইয়া অবশিষ্ট রহিল কেবল লৌকিকতাটুকু। ইহার বৎসরখানেক পরে রাধারাণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। কিন্তু মাসখানেক পর অকস্মাৎ সন্তানটি মারা গেল ; কয়েক দিন পরই একদিন রাত্রে রাধারাণীও হইল নিরুদ্দিষ্ট। প্রথমে সকলে ভাবিয়াছিল, রাধারাণী বোধহয় আত্মহত্যা করিয়াছে। ইন্দ্র রায় সন্দেহ করিয়াছিলেন, রাধুকে হত্যা করিয়াছে রামেশ্বর। কিন্তু রাধারাণীর সন্ধান পাওয়া গেল দশ মাইল দূরবর্তী রেল-স্টেশন পর্যন্ত।

লজ্জায় রায়-বংশের মাথা কাটা গেল। রামেশ্বর আবার বিবাহ করিলেন পশ্চিম-প্রবাসী এক শিক্ষক-কন্যা সুনীতিকে। মহীন্দ্র এবং অহীন্দ্র দুইটি সন্তান সুনীতির। তারপর রামেশ্বর এই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আজ দুই বৎসর একরূপ শয্যাশায়ী হইয়া একেবারে ঘরে ঢুকিয়া বসিয়াছেন। আপনার মনে মৃদুস্বরে কথা বলেন আর চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া থাকেন।

এই হইল রায়-বংশ এবং চক্রবর্ত্তী-বংশের ইতিহাস। এই সম্বন্ধেই সুনীতি ইন্দ্র রায়কে বলেন, ও-বাড়ীর দাদা।

* * *

সুনীতি সেদিন অপরাহ্ণে অহীন্দ্রকে বলিলেন, তুই যাবি একবার ও-বাড়ীর দাদার কাছে?

অহি বলিল, কি বলব?

বলবি—সুনীতি খানিকটা চিন্তা করিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন, নাঃ, থাক অহি, মজুমদার-ঠাকুরপো আর মহী ফিরেই আসুক। আবার কি বলবেন রায়-বাবুরা, তার চেয়ে থাক।

অহি বলিল, ঐ তোমাদের এক ভয়। মানুষকে বিনা কারণে অপমান করা কি এতই সোজা মা? মহাত্মা গান্ধী সাউথ আফ্রিকায় কি করেছিলেন জান? সেখানে ইংরেজরা রাস্তায় যে-ধারে যেত, রাস্তার সেধারে কালা আদমীকে যেতে দিত না। গেলে অপমান করত, জেল পর্য্যন্ত হ'ত। মহাত্মাজী সমস্ত অপমান নির্যাতন সহ্য ক'রে সেই রাস্তাতেই যেতে আরম্ভ করলেন। অপমানের ভয়ে ব'সে থাকলে কি কখনও সেই অধিকার পেত কালা আদমী? বল, কি বলতে হবে?

সুনীতি দেবী শিক্ষকের কন্যা, তাঁহার বড় ভাল লাগে এই ধারার আদর্শনিষ্ঠার কথা। তিনি ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বেশ, তবে যা, গিয়ে বলবি, এই যে এত বড় গ্রাম জুড়ে বিবাদ—এটা কি

ভাল ? আপনি এখন গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, আপনিই এটা মিটিয়ে দেন। তবে গরীব প্রজা যেন কোনমতেই মারা না পড়ে, সেইটে দেখবেন, এই কথাটা মা বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছেন।

ইন্দ্র রায় কাছারি-ঘরে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন একজন মহাজনের সঙ্গে। ঐ চর লইয়াই কথা। মহাজনের বক্তব্য, পাঁচ শত টাকা নজরস্বরূপ গ্রহণ করিয়া রায় মহাশয় তাহার দাবি স্বীকার করুন।

ইন্দ্র রায় হাসিয়া বলিলেন, চরটা অন্তত পাঁচ শ বিঘে, দশ টাকা বিঘে সেলামি নিয়ে বন্দোবস্ত করলেও যে পাঁচ হাজার টাকা হবে দত্ত, আর এক টাকা বিঘে খাজনা হ'লেও বছরে পাঁচ শ টাকা খাজনা।

কিন্তু সে তো মামলা-মকদ্দমার কথা হুজুর।

ডিগ্রী তো আমি পাবই, আর ডিক্রী হ'লে খরচাও পাব। সুতরাং লোকসান করতে যাবার কোন কারণ নেই আমার।

মহাজন চিন্তা করিয়া বলিল, আমি আপনাকে হাজার টাকা দেব, আর খাজনা ওই পাঁচ শ টাকা। অগ্রিম বরং আমি পাঁচ শ টাকা দিচ্ছি। চার দিন পর আসব আমি।

নিস্পৃহতার সহিত রায় বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে বলিলেন, ভাল, এস।

লোকটা চলিয়া যাইতেই রায় বাহিরে আসিলেন। অহীন্দ্র তাঁহার অপেক্ষাতে বাহিরেই বসিয়া ছিল। অহীন্দ্রকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। অহি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার মা আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

তুমি রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ছেলে, না? রায়েরা চক্রবর্ত্তীদের কখনও বাবু বলেন না।

হ্যাঁ।

হুঁ, চোখ আর চুল দেখেই চেনা যায়। রামেশ্বরের কোন্ ছেলে তুমি? রায়ের সকল কথার মধ্যে তাচ্ছিল্যের একটি সুর তীক্ষ্ণ সূচিকার মত মানুষকে যেন বিদ্ধ করে। কিন্তু সমস্ত উপেক্ষা করিয়া হাসিয়া স্বচ্ছন্দে সরল ভঙ্গীতে অহি উত্তর দিল, আমি তাঁর ছোট ছেলে।

কি কর তুমি? পড়, না পড়া ছেড়ে দিয়েছ?

না, আমি ফার্স্ট ক্লাসে পড়ি—শহরের স্কুলে।

রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ফার্স্ট ক্লাসে পড় তুমি? কিন্তু বয়স যে তোমার অত্যন্ত কম! বাঃ, বড় ভাল ছেলে তুমি! তা তোমার বাপও যে খুব বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু তোমার বড় ভাই, কি নাম তার? সে তো শুনিছি পড়াশুনো কিছু করে নি। স্কুলে তো তার খারাপ ছেলে ব'লে খ্যাতিই ছিল, মাস্টার বলেছিলেন আমাকে।

অহি স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমার কথাগুলো একবার শুনে নিন।

হাসিয়া রায় বলিলেন, তুমি তো বলবে ঐ চরটার কথা।

হ্যাঁ।

দেখ: ও-চরটা আমার। অবশ্য আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত। এই কথাই বলবে তোমার মাকে।

বেশ, তাই বলব। তবে মায়ের অনুরোধ ছিল, যেন প্রজাদের ওপর কোন অবিচার না হয়, সেইটে আপনি দেখবেন।

রায় এ কথার কোন জবাব দিলেন না। অহীন্দ্রও আর অপেক্ষা না করিয়া গমনোদ্যত হইয়া বলিল, তা হ'লে আমি আসি।

সে কি? একটু জল খেয়ে যাও।

না, জল থেয়েই বেরিয়েছি চরেব দিকটায় একটু বেড়াতে যাব।

রায় বলিলেন, শোন। তখন অহীন্দ্র কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। অহীন্দ্র দাঁড়াইল, রায় বলিলেন, চরের ওপারটায় শুনেছি বড় সাপের উপদ্রব। তোমার না যাওয়াই ভাল।

অহীন্দ্র সবিনয়ে বলিল, আচ্ছা, আমি ভেতরে যাব না।

৩

ইন্দ্র রায় সত্যই বলিয়াছিলেন, চরটা কীট-পতঙ্গ-সরীসৃপে পরিপূর্ণ। গ্রামের কোলেই কালিন্দী নদীর অগভীর জলস্রোত পার হইয়া খানিকটা বালি ও পলিমাটিতে মিশানো তৃণহীন স্থান, তারপরেই আরম্ভ হইয়াছে চর। সমগ্র চরটা বেনাঘাস আর কাশের ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহারই মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে—অসংখ্য প্রকারের কীট-পতঙ্গ আর সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মত ভয়ঙ্কর নানা ধরণের বিষধর সাপ।

প্রৌঢ় রংলাল মণ্ডল বলিল, এই তো ক বছর হ'ল গো বাবু মশায়, একটা বাছুর কি রকম ছটকিয়ে গিয়ে পড়েছিল চরের ওপর। বাস্, আর যায় কোথা, ইয়া এক পাহাড়ে চিতি—ধরলে পিছনের ঠ্যাঙে। আঃ, সে কি বাছুরটার চেঁচানি! বাস্, বার কতক চেঁচানির পরই ধরলে পাক দিয়ে জড়িয়ে, দেখতে দেখতে বাছুরটা হয়ে গেল ময়দার নেচির মত লম্বা। কিন্তু কারু সাহস হ'ল না যে এগিয়ে যাই।

অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আগে নাকি ওই চরের ওপরেই ছিল কালী নদী?

হ্যাঁ গো। ঠিক ওই চরের মাঝখানে। নদীর ঘাট থেকে গেরাম ছিল একপো রাস্তার ওপর। বোশেখ মাসে দুপুরবেলায় নদীর ঘাটে আসতে পায়ে ফোস্কা প'ড়ে যেত।

তুমি দেখেছ ?

অহীন্দ্রের ছেলেমানুষিতে কৌতুক অনুভব করিয়াই যেন রংলাল বলিল, অ্যাই দেখেন, দাদাবাবু আবার বলেন কি দেখ! কালী নদীর ধারেই—ওই দেখেন, চরের পরই যেখানে চোরাবালি—ওইখানে আমাদের পঁচিশ কাঠা আওয়ল জমি ছিল, তারপর ওই চর যেখানে আরম্ভ হয়েছে—ওইখানে ছিল গো-চর নদীর ওলা। ছেলেবেলায় আমি ওইখানে গরু চরিয়েছি। ওই জমিতে আমি নিজে লাঙল চষেছি। তখন আমাদের গরু ছিল কি মশায়—এই হাতীর মত বলদ ; আর রতন কামারের গড়া ফাল—এক হাত মাটি একেবারে দু ফাঁক হয়ে যেত! আঃ! সে মাটিরই বা কি রঙ—একবারে লাল—সেরাক!

বৃদ্ধ চাষী মনের আবেগে পুরাতন স্মৃতিকথা বলিয়া যায়, অহীন্দ্র কালী নদীর তটভূমিতে চরের প্রান্তভাগে বসিয়া চরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শুনিয়া যায়। বৃদ্ধ বলে, কালী নদীর একেবারে তটভূমিতে সে কি নধর কচি ঘাস গালিচার মত পুরু হইয়া থাকিত, সারা গ্রামের গরু খাইয়া শেষ করিতে পারিত না। তাহার পর ছিল তরির জমি। সে আমলে তুঁতপাতার চাষ ছিল একটা প্রধান চাষ। জবাগাছের পাতার মত তুঁতের পাতা। চাষীরা বাড়ীতে গুটিপোকা পালন করিত, —গুটিপোকার খাদ্য এই তুঁতপাতা। যে চাষী গুটিপোকা পালন করিত না, সেও তুঁতগাছের চাষ করিত, তুঁতপাতা বিক্রয় করিয়া সেও দশ টাকা রোজগার করিত। তখন গ্রামেরই বা শোভা কি! বাবুরাই বা কি সব, এক-একজন দিকপাল যেন। ছাতি কি বুকের! রংলাল বলিল, আপনকার কত্তাবাবা, বাপ রে, বাপ রে, 'রংলাল' বলে হেঁকেছেন তো জান একেবারে খাঁচাছাড়া হয়ে যেত!

অহীন্দ্র চরের উপর দৃষ্টি রাখিয়াই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কোন্ বছর কালী প্রথম এ-কূল ভাঙলে, তোমার মনে আছে ?

পিতামহ-প্রপিতামহের ইতিহাস সে বহুবার শুনিয়াছে, আর ওই চরটাই তাহার মন অধিকার করিয়া আছে। নদীর বুকে নাকি ব-দ্বীপগুলি এবং নদী সাগর-সঙ্গমের মুখে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পলি জমিয়া জমিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, উঠিতেছে এবং উঠিবে। বাংলার নিম্নাংশটা গোটাই নাকি এমনই করিয়া জলতল হইতে উঠিয়াছে। কত প্রবালকীট, কত শুক্তি-শামুকের দেহ পলির স্তরে স্তরে চাপা পড়িয়া আছে! ভূগোলের মাস্টার কৃষ্ণবাবু কি চমৎকারই না কথাগুলি বলেন!

রংলাল বলিল, কালী তো তোমাদের সামান্য নদী নয় দাদাবাবু, উনি হলেন সাক্ষাৎ যমের ভগ্নী। কবে থেকে যে উনি রায়হাটের কূল তলে তলে খেতে আরম্ভ করেছেন, তা কে বলবে বলেন! তবে উনি যে কালে হাত বাড়িয়েছেন, তখন আপনার রায়হাট উনি আর রাখবেন না। বললাম যে, যমের ভগ্নী উনি। বুঝলেন, কালী যাকে নিলে, কার সাধ্যি তাকে বাঁচায়! কত গেরাম যে উনি খেয়েছেন, তার আর ঠিক-ঠিকেনা নাই। ফি বছর দেখবেন, কত চাল, কত কাঠ, কত গরু, কত মানুষ কালীর বানে ভেসে চলেছে যমের বাড়ী। একবার সাক্ষাৎ পেত্যক্ষ করেছি আমি। তখন আমার জোয়ান বয়েস; দেখলাম, একখানা ঘরের চালের ওপর ব সে ভেসে যাচ্ছে একটি মেয়ে, কোলে তার কচি ছেলে। উঃ, কি তার কান্না, সে কান্নায় গাছপাথর কাঁদে দাদাবাবু! আমি মশায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমাদের সরু লৌকো নিয়ে, সঙ্গে নিলাম কাছি। একে সোতের মুখে, তার ওপর ক'ষে ঠেল মারলাম দাঁড়ের। সোঁ-সোঁ ক'রে গিয়ে পড়লাম চালের কাছে। আঃ, তখন মেয়েটির কি মুখের হাসি! সে বুঝল আমি বাঁচলাম। মাশায়, বলব কি, ঠিক সেই সময়েই উঠল একটি ঘুরনচাকি, আর বাস্, বোঁ ক'রে ঘুরপাক

মেরে নিলে একবারে চালসুদ্ধ পেটের ভেতর ভ'রে। কলকল ক'রে জল যেন ডেকে উঠল, বলব কি দাদাবাবু, ঠিক যেন খলখল করে হেসে উঠলেন কালী। সে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশে কালীকে প্রণাম করিল। অ্যাই, সেই বছরেই দেখলাম, কালী-মা এই কূল দিয়ে চলেছেন।

সে বলিল, সেই বৎসরেই শীতকালে দেখা গেল, কালীর অগভীর জলস্রোত ওপরের দিকে বালি ঠেলিয়া দিয়া রায়হাটের কোল দিয়া ঘেঁসিয়া আসিয়া প্রবাহিত হইতেছে। তারপর বৎসরের পর বৎসর ও-পাশে জমিতে আরম্ভ করিল বালি আর এদিক হইল গভীর। বর্ষায় যখন কালী হইত দুকূলপ্লাবী, তখন কিন্তু এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত জল ছাড়া কিছুই দেখা যাইত না। তখন ওপারটা ছিল ছয় মাস জল আর ছয় মাস বালির স্তূপ। তারপর প্রথমেই কালী গ্রাস করিল এপারের গো-চারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট তৃণশ্যামল তটভূমিটুকু। ওপারে তখন হইতে বর্ষার শেষে বালির উপর পাতলা পলির স্তর জমিতে আরম্ভ করিল।

রংলাল বলিল, বুঝলেন দাদাবাবু, শুধু কি পলি; রাজ্যের জিনিস—এই আপনার খড়কুটো ঘাসপাতা আর মরা মানুষ, গরু ছাগল, তার ওপর সাপ-ব্যাঙের তো সংখ্যা হয় না। এই, ওপারে যা খেতেন কালী, এসে উগরে দিতেন এই চরের ওপর। আর তার ওপর দিতেন মাটি আর বালি চাপা।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ চাষীর মনে যেন দার্শনিকতার উচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিল, সে বলিল, কালী ঠিক যেন বালিকার মত খেলা-ঘর পাতিয়াছিল ওইখানে। বালিকার মত যেখানে যাহা পাইত, আনিয়া ওইখানে জড়ো করিয়া রাখিত। আর তার উপর চাপা দিত বালি আর পলি।

এই আমাদের মেয়েগুলো খেলে দেখেন না, ভিজে বালির ভেতর পা-পূরে তার ওপর বালি চাপিয়ে চাপড়িয়ে চাপড়িয়ে পা-টি বার ক'রে নেয়, কেমন ঘর হয়! আবার মনে হ'লে লাথি মেরে—ভাঙে আর বলে হাতের সুখে গড়লাম, আর পায়ের সুখে ভাঙলাম। কালীও আমাদের তাই—ভাঙতে যেমন, আর গড়তে তেমন। উঃ, কত কি যে এসে জমা হ'ত দাদাবাবু, শামুক-গুগলি-ঝিনুক সে-সব কত রকমের, বাহার কি সব! খরার সময় যখন সব সেঁতানি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত, তখন ছেলেমেয়েরা চরের ধারে ধারে সে-সব ঝিনুক কুড়োতে যেত। ছোট ছোট ঝিনুকে ঘামাচি মারত সব পুটপাট ক'রে। কেউ কেউ লক্ষ্মী-বেদীতে বসিয়ে বসিয়ে আলপনার মত লতাপাতা তৈরি করত। তখন আপনার জলথল পড়লে খুদি খুদি ঘাস হ'ত এই আপনার গরুর রোঁয়ার মত।

অহীন্দ্র আবার প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমরা সব তখন এই চর কার তা মীমাংসা ক'রে নাও নি কেন?

রংলাল অহীন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতায় হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, অ্যাই দেখেন, দাদাবাবু কি বলেন দেখেন। তখন উ চর নিয়ে লোকে করবে কি? এই এখানে খানিক খাল, চোরাবালি, ওখানে খানিক বালির ঢিপি; আর যে পোকার ধুম। ছোটলোকের মেয়েরা পর্য্যন্ত কাঠকুটো কুড়োতে চরের ভেতর যেত না। বুঝলেন, খুদি খুদি পোকায় একেবারে অষ্টাঙ্গ ছেঁকে ধরত। তার আবার জ্বালা কি, ফুলে উঠত শরীর।

চৈত্র মাসের অপরাহ্ণ; সূর্য্য পশ্চিমাকাশে রক্তাভ হইয়া অস্তাচলের সমীপবর্ত্তী হইতে চলিয়াছে। কালীর ওপারে রায়হাটে তটভূমিতে বড় বড় গাছ, শিমুলগাছই বেশি, শিমুলের নিঃশেষে পত্রহীন শাখা-প্রশাখার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া রক্ত-রাঙা ফুলের সমারোহ। পালদে

গাছগুলিও তাই, পত্ররিক্ত এবং শিমুলের চেয়েও গাঢ় রক্তবর্ণের পুষ্পসম্ভারে সমৃদ্ধ। বসন্তের বাতাসে কোথা হইতে একটি অতি মধুর গন্ধ আসিয়া শ্বাসযন্ত্র ভরিয়া দিল।

অহীন্দ্র বার বার গন্ধটি গ্রহণ করিয়া বলিল, কি ফুলের গন্ধ বল তো?

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত রংলাল বলিল, উ ওই চরের মধ্যে কোন ফুলটুল ফুটে থাকবে। ওর কি কেউ নাম জানে। কোথা থেকে কি এনে কালী যে লাগান ওখানে, ও এক ওই কালীই জানেন। বুঝলেন, এই প্রথম বার যে-বার ঘাস বেশ ভাল রকমের হ'ল, আমরা গরু চরাব বলে দেখতে এসেছিলাম।

বলিতে বলিতে রংলালের মুখে সেই দিনের সেই বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, সে বলিয়া যায়, কত রকমের নাম-না জানা চোখে-না-দেখা ছোট ছোট লতা-গাছ-ঘাস ওই চরের উপর তখন যে জন্মিয়াছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আর ঘাসে পা দিলেই লাফাইয়া উঠিত ফড়িং-জাতীয় শত শত কীট, উপরে উড়িয়া বেড়াইত হাজারো রকমের প্রজাপতি-ফড়িং। তারপর জন্মিয়াছে ওই বেনাঘাস আর কাশগুল্ম। কিন্তু উহার ভিতরে ভিতরে কত যে গাছ, কত যে লতা আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহার সংখ্যা কি কেহ জানে? আর ওই সব মধুগন্ধী গাছের গোড়ায় বাসা বাঁধিয়াছে কত বিষধর—! বলিতে বলিতে রংলাল শিহরিয়া উঠিল, বলিল, খবরদার দাদাবাবু, কখনও যেন গন্ধের লোভে ভেতরে ঢুকবেন না। বরং ও সাঁওতাল বেটাদের বলবেন, ওরা ঠিক জানে সব, কোথা কি আছে। ফুলের ওপর ওদের খুব ঝোঁক তো।

অকস্মাৎ বৃদ্ধ রংলাল মহা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল, যাবেন দাদাবাবু সাঁওতালপাড়ায়? আ-হা-হা, কি ফসলই সব লাগিয়েছে, অঃ, আলু হয়েছে কি, ইয়া মোটা মোটা? বরবটি শুঁটি আপনার আধ

হাত করে লম্বা! সাধে কি আর গাঁসুদ্ধ লোক হঠাৎ ক্ষেপে উঠল দাদাবাবু!

অহি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সাঁওতাল কোথায়? ওরা তো থাকে অনেক দূরে পাহাড়ের ওপর।

ঘাড় নাড়িয়া রংলাল বলিল, অ্যাই দেখেন, আপনি কিছুই জানেন না। চরে যে সাঁওতাল বসেছে গো? উই দেখেন, ধোঁয়া উঠছে না! বেটারা সব রান্না চড়িয়েছে ওরাই তো চোখ ফুটিয়ে দিলে গো। আমাদের বাঙালী জাতের সাধ্যি কি, এই বন কেটে আর ওই সব জন্তু-জানোয়ার মেরে এখানে চাষ করে! ওরা কিন্তু ঠিক বেছে বেছে আসল জায়গাটি এসে ধরেছে। কোথা থেকে এল আর কবে এল—কেউ জানে না, ওরা আপনিই এসেছে, আপন মগজেই খানিকটা জায়গা-জমি সাফ ক'রে বসেছে, চাষ করেছে, এইবার সব ঘর তুলেছে। গাঁয়ের লোক তো জানলে, ওখানে মাঝি বসেছে, চাষ হ'চ্ছে। সেই দেখেই তো চোখ ফুটল সব। বাস্, আর যায় কোথা, লেগে গেল ফাটাফাটি! জমিদার বলছে, চর আমাদের; আমরা চাষীরা বলছি, ইপারে আমাদের জমি গিয়ে ওপারে চর উঠেছে, চর আমাদের। আসল ব্যাপার হ'ল—ওই সাঁওতালরা ওখানে সোনা ফলাচ্ছে, বুঝলেন?

অহীন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল, চল, যাব। কোন্ দিকে?

ওই দেখেন, বেনার ঝোপ থেকে মাঝিনদের দল বেরিয়েছে নদীতে জল আনতে।

অহীন্দ্র দেখিল, গাঢ় সবুজ বেনাবনের মধ্য হইতে বাহির হইতেছে আট-দশটি কালো মেয়ের সারি, মাথায় কলসী লইয়া একটানা সুরে গান গাহিতে গাহিতে তাহারা নদীর দিকে চলিয়াছে।

দুই পাশে এক বুক উঁচু ঘন কাশ ও বেনাঘাসের জঙ্গল। তাহারই

মধ্য দিয়া স্বল্পপরিসর পরিচ্ছন্ন একটি পথ সর্পিল ভঙ্গিতে চরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ঘাসের বনের মধ্যে নানা ধরণের অসংখ্য লতা ও গাছ জন্মিয়াছে। গুচ্ছ গুচ্ছ বেনাঘাস অবলম্বন করিয়া লতা-গুলি লতাইয়া লতাইয়া ঘাসের মাথায় যেন আচ্ছাদনী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। সাপের ফণার মত উদ্যত বঙ্কিম ডগাগুলি স্থানে স্থানে একেবারে পথের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, মানুষের গায়ে ঠেকিয়া সেগুলি দোল খায়। মাঝে মাঝে চৈত্রের উতলা বাতাস আসিয়া ঘাসের জঙ্গলের এক প্রান্ত পর্য্যন্ত অবনত করিয়া দিয়া যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সরসর সনসন শব্দ।

রংলাল একটা লতার ডগা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া বলিল, অঃ, অনন্তমূল হয়েছে দেখ দেখি! কত যে লতা আছে!

অহীন্দ্র এই পথটির পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া সাঁওতালদের কথা ভাবিতেছিল—এমন কালো জাতি, অথচ কি মসৃণ পরিচ্ছন্নতা ইহাদের জীবনে! কোথায় যেন বনান্তরালে কোলাহল শুনা যাইতেছে! চারিদিকে চাহিয়া অহীন্দ্র দেখিল, একেবারে ডান দিকে কতকগুলি কুঁড়েঘরের মাথা জাগিয়া আছে। পথে একটা বাঁক পার হইয়াই সহসা যেন তাহারা পল্লীর মধ্যে আসিয়া পড়িল।

ঘাসের জঙ্গল অতি নিপুণভাবে পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া তাহারই মধ্যে দশবারো ঘর আদিম অর্দ্ধ-উলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মানুষ বসতি বাঁধিয়াছে। ঘর এখনও গড়িয়া উঠে নাই, সাময়িকভাবে চালা বাঁধিয়া, চারিদিকে বেড়া দিয়া তাহার উপর মাটির প্রলেপ লাগাইয়া তাহারই মধ্যে এখন তাহারা বাস করিতেছে। আশেপাশে মাটির দেওয়াল দিয়া স্থায়ী ঘরের পত্তনও শুরু হইয়াছে। প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে গোবর ও মাটি দিয়া নিকানো পরিচ্ছন্ন উঠান। উঠানের পাশে পৃথক্ পৃথক আঁটিতে বাঁধা নানা প্রকার শস্যের বোঝা। বরবটির লতা, আলুগুলি ছাড়াইয়া লইয়া

সেই গাছগুলি, মুসুরির ঝাড়, ছোলার ঝাড় সবই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রক্ষিত; দেখিয়া অহীন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল।

রংলাল ডাকিয়া বলিল, কই, মোড়ল মাঝি কই রে? কে এসেছে দেখ!

কে বেটে?—তু কে বেটিস?—বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল এক কৃষ্ণকায় সচল প্রস্তরখণ্ড। আকৃতির চেয়ে আকারটাই তাহার বড় এবং সেইটাই চোখে পড়িয়া মানুষকে বিস্মিত করিয়া দেয়। পেশীর পুষ্টিতে এবং দৃঢ়তা ও বিপুলতায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে; লোকটি সবিস্ময়ে উগ্র-গৌরবর্ণের কৃশকায় দীর্ঘতনু বালকটিকে দেখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, তোর তো অনেক বয়েস হ'ল, তোদের রাঙা-ঠাকুরের নাম জানিস্? তোদের সাঁওতালী হাঙ্গামার সময়—

রংলালকে আর বলিতে হইল না, বিশাল বিন্ধ্যপর্ব্বত যেন অগস্ত্যের চরণে সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

রংলাল বলিল, ইনি তাঁর নাতি—ছেলের ছেলে, বেটার বেটা।

মাঝি আপন ভাষায় ব্যস্তভাবে আদেশ করিল, চৌপায়া নিয়ে আয়, শিগগির!

ছোট্ট টুলের আকারে দড়ি দিয়া বোনা বসিবার আসনে অহীন্দ্রকে বসাইয়া মাঝি তাহার সম্মুখে মাটির উপর উবু হইয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া বসিয়া অহীন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে বলিল, হুঁ ঠিক সেই পারা, তেমুনি মুখ, তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ! হুঁ, ঠিক বেটে, ঠিক বলেছিস তু মোড়ল।

রংলাল হাসিয়া বলিল, তুই তাকে দেখেছিস মাঝি?

হুঁ, দেখলম বৈকি গো। শাল-জঙ্গলে মাদল বাজছিলো, হাঁড়িয়া খাইছিলো সব বড় বড় মাঝিরা, আমরা তখন সব

ছোট বেটে; দেখলম সি, সেই আগুনের আলোতে, রাঙাঠাকুর এল।

অহীন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, তোমার কত বয়েস হবে মাঝি?

অনেক চিন্তা করিয়া মাঝি বলিল, সি অনেক হ'ল বৈকি গো, তা তুর চুকুড়ি হবে।

রংলাল হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, ওদের হিসেব অমনই বটে। তা ওর বয়েস পঁচাত্তর আশী হবে দাদাবাবু।

পঁচাত্তর, আশী! অহীন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এখনও এই বজ্রের মত শক্তিশালী দেহ! ইতিমধ্যে পাড়ার যত সাঁওতাল এবং ছেলেমেয়ে অহীন্দ্রের চারিপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল। পাড়াময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, রাঙাঠাকুরের বেটার বেটা আসিয়াছেন, আর তিনি নাকি ঠিক রাঙাঠাকুরেরই মত দেখিতে—আগুনের মত গায়ের রঙ! ভিড়ের সম্মুখেই ছিল মেয়েদের দল। কষ্টিপাথরের খোদাই-করা মূর্ত্তির মত দেহ, তেমনই নিটোল এবং দৃঢ় তৈলমসৃণ কষ্টির মত উজ্জ্বল কালো। পরনে মোটা খাটো কাপড়, মাথায় চুলে তেল দিয়া পরিপাটী করিয়া আঁচড়াইয়া এলোখোঁপা বাঁধিয়াছে, সিঁথি উহারা কাটে না, কানে খোঁপায় নানা ধরনের পাতা সমেত সদ্যফোটা বনফুলের স্তবক। অহীন্দ্র অনুভব করিল, সেই গন্ধ এখানে যেন বেশ নিবিড় হইয়া উঠিতেছে।

সে প্রশ্ন করিল, এ কোন্ ফুলের গন্ধ মাঝি?

মাঝি মেয়েদের মুখের দিকে চাহিল। চার-পাঁচজনে কলরব করিয়া কি বলিয়া উঠিয়া আপন খোঁপা হইতে ফুলের স্তবক খুলিয়া ফেলিল। অহীন্দ্র দেখিল, লবঙ্গের মত ক্ষুদ্র আকারের ফুল, একটি স্তবকে কদম্বকেশরের মত গোল হইয়া অসংখ্য ফুটিয়া আছে। কিন্তু মোড়ল মাঝি গম্ভীর ভাবে কি বলিল। মেয়েগুলি ফুলের স্তবক আবার

খোঁপায় গুজিয়া সারি বাঁধিয়া ওই দমকা বাতাসের মত বেনাবন ঠেলিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

রংলাল বলিল, কি হ'ল? কোথা গেল সব?

ফুল আনতে, রাঙাবাবুর লেগে।

কেনে, ওই ফুল দিলেই তো হ'ত।

ধ্যুৎ, রাঙাঠাকুরের লাতিকে ওই ফুল দিতে আছে? তুরা দিস?

অহীন্দ্র বলিল, না গেলেই হ'ত মাঝি, কত সাপ আছে চরে। নাই?

তাচ্ছিল্যের সহিত মাঝি বলিল, উ সব স'রে যাবে, কুন্ দিকে পালাবে তার ঠিক নাই।

অহীন্দ্র বলিল, এখানে নাকি খুব বড় বড় সাপ আছে?

অহীন্দ্রের কথাকে ঢাকিয়া দিয়া মেয়ের ও ছেলের দল কলরব করিয়া উঠিল। মাঝি হাসিয়া বলিল, আজই একটা মেরেছি আমরা, দেখবি বাবু? ইয়া চিতি।

সোৎসাহে আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়া অহীন্দ্র বলিল, কোথায়? কই? সঙ্গে সঙ্গে পরমোৎসাহে মাঝির দল আগাইয়া চলিল, সর্ব্বাগ্রে ছেলেমেয়েরা যেন নাচিয়া চলিয়াছে। পল্লীর এক প্রান্তে এক বিশাল অজগর ক্ষতবিক্ষত দেহে মরিয়া তাল পাকাইয়া পড়িয়া আছে চিত্রিত মাংসস্তূপের মত। অহীন্দ্র ও রংলাল উভয়েই শিহরিয়া উঠিল। অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল, কোথায় ছিল?

মাঝি পরম উৎসাহভরে বিকৃত ভাষায় বকিয়া গেল অনেক, সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা নাড়িবার কি তাহার বিচিত্র ভঙ্গী! মোটমাট ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এই—একটা নিতান্ত কচি ছাগলের ছানা, আপনার মনেই নাকি লাফাইয়া লাফাইয়া বেনাবনের কোল ঘেঁষিয়া নাচিয়া ফিরিতেছিল। নিকটেই একজন মাঝি বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছিল,

আর কাছে ছিল তাহার কুকুর। কুকুরটা সহসা সভয়ে গর্জ্জন করিয়া উঠিতেই মাঝি তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশা সাপ বেনাবন হইতে হাতখানেক মুখ বাহির করিয়া নিমেষহীন লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিতেছে ওই নর্ত্তনরত ছাগশিশুটিকে। সাঁওতালের ছেলে বাঁশীটি রাখিয়া দিয়া তুলিয়া লইল ধনুক আর কাঁড় তীর। তারপর অব্যর্থ লক্ষ্য সাপের মাথাটাই বিঁধিয়া দিল একেবারে মাটির সঙ্গে; তারপর চীৎকার করিয়া ডাকিল পাড়ার লোককে। তখন বিদ্ধমস্তক অজগর দীর্ঘ নমনীয় দেহ আছড়াইয়া ঘাসের বনে যেন তুফান তুলিয়া দিয়াছে। কিন্তু পাঁচ-সাতটা ধনুক হইতে সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণের মুখে সে বীর্য্য কতক্ষণ!

সাপ দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই একটি প্রৌঢ় সাঁওতাল-রমণী একটি বাটিতে সদ্যদোহা দুধ আনিয়া নামাইয়া দিল, দুধের উপর ফেণা তখনও ভাঙে নাই। মেয়েটি সম্ভ্রম করিয়া বলিল, বাবু তুমি খান।

অহীন্দ্র হাসিয়া ফেলিল। মাঝি বলিল, ই আমার মাঝিন বেটে বাবু। লে, গড় কর্ রাঙাবাবুকে—আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি।

রংলাল গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছিল, অকস্মাৎ আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল অ্যাঁ, একেই বলে ইঁদুরে গর্ত্ত করে, সাপে ভোগ করে।

দুধের বাটিটা নামাইয়া দিয়া অহীন্দ্র বলিল, কেন?

ম্লান হাসি হাসিয়া রংলাল বলিল, কেন আবার, চর উঠল লদীতে, সাপ-খোপের ভয়ে কেউ ই-দিক আসত না। মাঝিরা এল, সাফ করছে, চাষ করছে; উ-দিকে জমিদার সাজছে লাঠি নিয়ে।—কি? না, চর আমাদের। আমরা যত সব চাষী-প্রজা বলছি, চর আমাদের। এর পর মাঝিদিগে তাড়িয়ে দিয়ে সবাই বসবে জেঁকে। মাঝি

তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কেনে, আমরাও খাজনা দিব। তাড়াবে কেনে আমাদিগে ?

রংলাল বলিল, তাই শুধো গা দিয়ে বাবুদিগে। আর খাজনা দিব কাকে ? সবাই বলবে, আমাকে দে সোল-আনা খাজনা।

কেনে, আমরা খাজনা দিব আমাদের রাঙাঠাকুরের নাতিকে—এই রাঙাবাবুকে।

অহীন্দ্র বলিল, না না মাঝি, চর যদি আমাদের না হয় তো আমাদের খাজনা দিলে হবে কেন ? যার চর হবে, তাকেই খাজনা দেবে তোমরা।

তবে আমরা তুকেই খাজনা দিব, যাকে দিতে হয় তু দিস।

রংলাল হুঁশিয়ার লোক, প্রবীণ চাষী, ভূমিসংক্রান্ত আইন-কানুন সে অনেকটাই বোঝে আর এও সে বোঝে যে, চরের উপর চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর স্বত্ব যদি কোনরূপে সাব্যস্ত হয়, তবে অন্য বাড়ীর মত অন্যায়-অবিচার হইবে না., তাহাদেরও অনেক আশা থাকিবে। অন্তত মায়ের কথার কখনও খেলাপ হয় না। সে অহীন্দ্রের গা টিপিয়া বলিল, বাবু ছেলেমানুষ, উনি জানেন না মাঝি। চর ওঁদেরই বটে।

মাঝি বলিল, আমরা সোবাই বলব, আমাদের রাঙাবাবুর চর।

কথাটা কিন্তু চাপা পড়িয়া গেল, সেই মেয়ে কয়টি যেমন ছুটিতে ছুটিতে গিয়াছিল, তেমনি ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া রাঙাবাবুর সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের সকলেরই কোঁচড়ভরা ওই ফুলের স্তবক। একে একে তাহারা আঁচল উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল ফুলের রাশি। অতি সুমধুর গন্ধে স্থানটার বায়ুস্তর পর্য্যন্ত আমোদিত হইয়া উঠিল।

মাঝি একটি দীর্ঘাঙ্গী কিশোরীকে দেখাইয়া বলিল, এই দেখ্

রাঙাবাবু, ই আমার লাতিন বেটে! ওই যি আজ সাপ মেরেছে, উয়ার সাথে ইয়ার বিয়া হবে।

লজ্জাকুণ্ঠাহীন অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে মেয়েটি তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, চাহিয়াই রহিল। অহীন্দ্র বলিল, আজ যাই মাঝি।

মেয়েরা সকলে মিলিয়া কলরব করিয়া কি বলিয়া উঠিল। মাঝি হাসিয়া বলিল, ছেলেগুলা বুলছে, উয়ারা নাচবে সব, তুকে দেখতে হবে।

কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল মাঝি।

মাঝি বলিল, মশাল জেলে আমি তুকে কাঁধে করে রেখে আসব।

অহীন্দ্র আর 'না' বলিতে পারিল না। আর এমন সুন্দর হইয়া নাচে, আর এত সুন্দর ইহাদের একটানা সুরের সুকণ্ঠের গান! সে বলিল, তবে একটু শিগগির মাঝি।

মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে কলরব করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল, সিরিং সিরিং অর্থাৎ গান গান। মরং বাবু রাঙাবাবু, অর্থাৎ তাদের মালিক রাজা রাঙাবাবু দেখিবেন।

মাদল বাজিতে লাগিল—ধিতাং ধিতাং, বাঁশের বাঁশীতে গানের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রাঙাবাবুকে বেষ্টন করিয়া বসন্ত বাতাসে দোলার মত হিল্লোলিত দেহে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল সাঁওতাল তরুণীরা, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীর সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান। বৃদ্ধ মাঝি বসিয়া ছিল অহীন্দ্রের পাশে, অহীন্দ্র তাহাকে প্রশ্ন করিল, গানে কি বলছে মাঝি?

বলছে উয়ারা, রাজার আমাদের বিয়া হবে; তাথেই রাণী সাজ ক'রে ব'সে আছে, রাজা তাকে লাল জবাফুল এনে দিবে।

পরক্ষণেই অশীতিপর বৃদ্ধ প্রায় লাফ দিয়া উঠিয়া একটা মাদল লইয়া বাদক পুরুষদের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

* * * *

রাত্রি প্রায় আটটার সময়, রায় বাবুদের কাছারির সম্মুখ দিয়া কাহারা যাইতেছিল মশালের আলো জ্বালাইয়া। মশাল একালে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইন্দ্র রায় গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কে যায়?

শুষ্ক বেনাঘাসের আঁটি বাঁধিয়া তাহাতে মহুয়ার তেল দিয়া জ্বালাইয়া বৃদ্ধ মাঝি তাহাদের রাঙাবাবুকে পৌঁছাইয়া দিতে চলিয়াছিল। সে উত্তর দিল, আমি বেটে, উ-পারের চরের কমলা মাঝি।

বিস্মিত হইয়া রায় প্রশ্ন করিলেন, এত রাত্রে এমন আলো জ্বেলে কোথায় যাবি তোরা?

আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি মশায়, আমাদের রাঙাবাবুকে বাড়ীতে দিতে যেছি গো!

রাঙাঠাকুর! সোমেশ্বর চক্রবর্ত্তী! রায়ের মনে পড়িয়া গেল অতীতকাহিনী।

৪

সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া লক্ষ্মীর ঘরে গৃহলক্ষ্মীর সিংহাসনের সম্মুখে পিলসুজের উপর প্রদীপটি রাখিয়া সুনীতি গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিলেন। গনগনে আগুন ভরিয়া ঝি ধূপদানি হাতে ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। ধূপদানিটি তাহার হাত হইতে লইয়া সুনীতি আগুনের উপর ধূপ ছিটাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধূপগন্ধে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল।

ঘরের দরজা বন্ধ করিতে করিতে সুনীতি বলিলেন, তুলসীমন্দিরে আর ঠাকুরবাড়ীতে প্রদীপ আজ বামুনঠাকরুণকে দিতে বল্ মানদা। আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল, বাবু হয়তো এখুনি রেগে উঠবেন।

তাড়াতাড়ি তিলের তেলের বোতলটি লইয়া তিনি উপরে

রামেশ্বরের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। রামেশ্বরের ঘরের দরজা জানালা অহরহ বন্ধ থাকে, দিনরাত্রিই ঘরে একটি প্রদীপ জ্বলে, সে প্রদীপে পোড়ে তিলের তেল। উজ্জ্বল আলো তাঁহার চোখে একেবারে সহ্য হয় না। আলোর মধ্যে তিনি নাকি একেবারে দেখিতে পান না। অন্ধকারে বরং পান। তেলের বোতল হাতে সুনীতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রকাণ্ড বড় ঘরখানির মধ্যে ক্ষীণ শিখায় একটি মাত্র প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। এত বড় ঘরের সর্ব্বাংশে তাহার জ্যোতি প্রসারিত হইতে পারে নাই, চারি কোণের অন্ধকার অসীমের মত সীমাবদ্ধ জ্যোতির্মণ্ডলকে যেন ঘিরিয়া রহিয়াছে। আলো-অন্ধকারে সে যেন এক রহস্যলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারই মধ্যে ঘরের মধ্যস্থলে সে-আমলের প্রকাণ্ড পালঙ্কের উপর নিস্তব্ধ হইয়া রামেশ্বর বসিয়া ছিলেন।

ঘরের দরজা খুলিতেই রামেশ্বর অতি ধীর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন সুনীতি ?

ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে দিতে সুনীতি বলিলেন, হ্যাঁ আমি। তেল দিয়ে দিই প্রদীপে। জানালাগুলো খুলে দিই, সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

দাও।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে ঘরের জানালা খোলা হয়। কখনও কখনও রামেশ্বর তখন খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বহির্জগতের সহিত পরিচয় করেন। জানালা খুলিয়া দিতেই বন্ধ ঘরে বাহিরের বাতাস অপেক্ষাকৃত জোরেই প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপটি নিবিয়া গেল। রামেশ্বর বাহিরের নির্ম্মল শীতল বাতাসে বুক ভরিয়া নিশ্বাস লইয়া বলিলেন, আঃ!

সুনীতি বলিলেন, আলোটা নিবে গেল যে।

রামেশ্বর বলিলেন, বাতাসে চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে। এটা কি মাস বল তো ?

চৈত্র মাস। তারপর চিন্তিতভাবে সুনীতি আবার বলিলেন, প্রদীপ তো এ বাতাসে থাকবে না।

রামেশ্বর বলিতেছেন, 'ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।'

বাতি দিয়ে একটা সেজ জ্বেলে দেব ?

সেজ ?

হ্যাঁ, বাতির আলোও তো খুব ঠাণ্ডা। এ বাতাসে প্রদীপ থাকবে না।

তাই দাও।—বলিয়া আবার আপন মনে আবৃত্তি করিলেন, 'মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে।'

ঘরে সেজ ও বাতি ঠিক করাই থাকে, মধ্যে মধ্যে জ্বালিতেও হয়। বাতাসের জন্যও হয়, আবার মধ্যে মধ্যে রামেশ্বরবাবুর ইচ্ছাও হয়। সুনীতি বাতি জ্বালিয়া সেজের মধ্যে বসাইয়া দিলেন, তারপর কতকগুলি ধূপশলাকা জ্বালিয়া দিয়া বলিলেন, কাপড় ছাড়, সন্ধ্যের জায়গা ক'রে দিই।

হুঁ। করতে হবে বৈকি! না করলেই পাপ। করলে কিছুই না—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।

সুনীতি বাধা দিয়া বলিলেন, ও কি বলছ ? রামেশ্বর মধ্যে মধ্যে এমনই করিয়া বকিতে আরম্ভ করেন, তখন বাধা দিতে হয়। অন্যথায় সেই একটা কথাই তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া এমনই করিয়া বকিয়া যান।

বাধা পাইয়া রামেশ্বর চুপ করিলেন। সুনীতি আবার বলিলেন, কাপড় ছাড়, সন্ধ্যে কর। আর এমন ক'রে বকছ কেন ?

না না না, আমি বকি নি তো। বকব কেন? কই, কাপড় দাও। রামেশ্বর অতি সন্তর্পণে বিছানা হইতে নামিয়া আসিলেন। স্বামীকে সন্ধ্যা করিতে বসাইয়া দিয়া সুনীতি বলিলেন, সন্ধ্যে ক'রে ফেল, আমি দুধ গরম ক'রে নিয়ে আসি।

সুনীতি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রামেশ্বর সন্ধ্যা শেষ করিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। সুনীতিকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন, কি বাজছে বল তো?

দূরে ওই চরটার উপরে তখন অহীন্দ্রকে ঘিরিয়া সাঁওতালেরা মাদল ও বাঁশী বাজাইতেছিল, মেয়েরা নাচিতেছিল—তাহারই শব্দ। সুনীতি বলিলেন, সাঁওতালেরা মাদল বাজাচ্ছে।

বাঁশী শুনছ, বাঁশী?

হ্যাঁ। সন্ধ্যের সময় তো। মাঝিরা মাদল বাজাচ্ছে, বাঁশী বাজাচ্ছে, মেয়েরা নাচছে। ওদের ওই আনন্দ।

তুমি কবিরাজগোস্বামীর শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়েছ?—

"করতলতালতরলবলয়াবলি কলিত কলস্বন বংশে।
রাসরসে সহনৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে।"

যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির সঙ্গে তাল দিয়ে গোপবালারাও একদিন নাচত। গীতগোবিন্দ তুমি পড় নি?

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া সুনীতি একটা দীর্ঘনিঃশাস ফেলিয়া বলিলেন, তুমি কখনও পড়ে' শোনাও নি, আমি নিজে তো সংস্কৃত জানি না।

আজ তোমাকে শোনাব, আমার মুখস্থ আছে।

বেশ, এখন দুধটা খেয়ে নাও দেখি। বলিয়া সম্মুখে দুধের বাটি আগাইয়া দিলেন। পান করিয়া বাটি সুনীতির হাতে দিতেই সুনীতি জলের গ্লাস ও গামছা স্বামীর সম্মুখে ধরিলেন। হাতমুখ

ধুইয়া রামেশ্বর আবার বলিলেন, কবিরাজগোস্বামী বলেছেন কি জান ?—

"যদি হরি স্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাসু কুতূহলং।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম॥"

শোনাব, তোমাকে আজ শোনাব।

আনন্দে সুনীতির বুকখানি যেন ভরিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, তা হ'লে তাড়াতাড়ি আমি কাজগুলো সেরে আসি। পরমুহূর্ত্তেই সুনীতি যেন স্তিমিত হইয়া গেলেন—কতক্ষণ, এ রূপ কতক্ষণের জন্য ?

হ্যাঁ, এস। বাতাস আজ বড় মিষ্টি বইছে। বসন্তকাল কিনা। আচ্ছা সুনীতি, দোল-পূর্ণিমা চ'লে গেছে ?

হ্যাঁ। আজ কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী।

কই, আমাকে তো আবীর দিলে না ?

সুনীতি অপরাধিনীর মত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এনো, এনো, আবীর থাকে তো নিয়ে এস এক মুঠো আজ।

সুনীতি এ কথারও উত্তর দিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

আর শোন। জয়দেব সরস্বতীর পদাবলী যদি শুনবে, তবে অতি সুন্দর একখানি কাপড় পরবে। সুন্দর ক'রে বেণী রচনা করবে। তারপর রসরাজের মূর্ত্তি হৃদয়ে স্মরণ ক'রে লীলাবিভোর মন নিয়ে শুনতে হবে।

সুনীতি ভাল করিয়াই জানেন যে, ফিরিয়া আসিতে আসিতে স্বামীর এ রূপ আর থাকিবে না। কিন্তু তিনি কখনও স্বামীর কথার প্রতিবাদ করেন না, তাই ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, তাই আসব।

চুলটা যেন বেঁধে ফেলো

বাঁধব।

হ্যাঁ। ঘরে আতর নেই—আতর ?

আছে, তাও আনব।

আমায় এখুনি একটু দিতে পার ?

দিচ্ছি। সুনীতি সঙ্গে সঙ্গে বাক্স খুলিয়া একটি সুদৃশ্য আতরদান বাহির করিলেন। তূলায় আতর মাখাইয়া স্বামীর হাতে দিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য ফিরিলেন। কিন্তু রামেশ্বর ডাকিলেন, শোন।

সুনীতি বলিলেন, বল।

ওই আলোর সম্মুখে তুমি একবার দাঁড়াও তো। অন্ধকারের মধ্যে আমার বাস, অনেক দিন তোমাকে যেন আমি ভাল ক'রে দেখি নি।

সুনীতি স্থিরভাবে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইলেন। রামেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, দৃষ্টি যাওয়ার চেয়ে মানুষের বড় দুঃখ আর নেই। ভীষণ পাপে, অভিসম্পাত না হ'লে মানুষের চোখ যায় না।

সুনীতি ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, কিন্তু চোখ তো তোমার খারাপ হয় নি; তিন-চার বার ডাক্তার দেখানো হ'ল, তাঁরা তো তা বলেন না।

তারস্বরে প্রতিবাদ করিয়া রামেশ্বর বলিলেন, জানে না, তারা কিছুই জানে না, তুমিও জান না। দিনের আলোর মধ্যে চোখ আমার আপনি বন্ধ হ'য়ে যায়, কে যেন ধ'রে চোখে সূচ ফুটিয়ে দেয়। নিবিয়ে দাও সুনীতি, ও আলোটা নিবিয়ে দাও, নয় আড়ালে সরিয়ে দাও। আঃ!

আলোটা অন্তরালে সরাইয়া দিয়া সুনীতি নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সে আমলের চকমিলানো বাড়ী, নীচের তলায় চারিদিকেই ঘর, একেবারে অবরুদ্ধ বলিলেই হয়। বাহিরে এমন মিষ্ট বাতাস, অথচ

এ-বাড়ীর নীচের তলায় বেশ যেন গরম পড়িয়া গিয়াছে। স্বামীর জন্য খাবার সুনীতি নিজের হাতেই প্রস্তুত করেন, খাবার প্রস্তুত করিতে করিতে তিনি ঘামিয়া যেন স্নান করিয়া উঠিলেন।

পাচিকা বলিল, ওরে বাপ রে, মা যেন ঘেমে নেয়ে উঠলেন একেবারে! আমি যে এতক্ষণ আগুনের আঁচে রয়েছি, আমি তো এত ঘামি নি!

মানদা ঝি বলিল, পাখাটা নিয়ে আসি আমি।

অত্যন্ত লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত ভাবে সুনীতি বলিলেন, না রে, না, থাক! এই তো হয়ে গেছে আমার। এমন ভাবে ঘামিয়া উঠাটা তাহার কাছেও অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার খাবার তৈয়ারিও শেষ হইয়াছিল, তিনি খাবারগুলি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। খাবার রাখিয়া দিয়া বলিলেন, দু-বালতি জল তুলে দে তো মানদা, গা ধুয়ে ফেলি একটু।

মানদা পুরানো ঝি, সে বলিল, এই যে সন্ধ্যায় গা ধুলেন মা। আবার গা ধোবেন কি গো, এই দো-রসার সময়? ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছে ফেলুন বরং।

না রে, সমস্ত শরীর যেন ঘিনঘিন করছে আমার। তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমার কি কখনও মরণ হয় রে মানী, তা হ'লে সংসারে ভুগবে কে?

মানদা আর কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি জল তুলিয়া গামছা আনিয়া সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া দিল। আপনার হাত দুইখানি নাকের কাছে আনিয়া শুঁকিয়া সুনীতি বলিলেন, নাঃ, ধোঁয়ার গন্ধ, সাবান না দিলে যাবে না। তুই কার কাছে ঘুঁটে নিস মানদা? ঘুঁটে ভিজে থাকে।

বলিতে বলিতে তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সাবান বাহির করিয়া

লইয়াও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তোলা কাপড় একখানা বাহির করিলে হয়, কিন্তু—। আবার তিনি এক গা ঘামিয়া উঠিলেন। মনের মধ্যে একটা দারুণ সঙ্কোচ তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল।

মানদা ডাকিল, মা, আসুন।

সুনীতি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, বাক্স খুলে দেখলাম, কাপড়গুলো সব পুরনো হয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম, কি হবে রেখে, প'রে ফেলি। কিন্তু তোরা হাসবি ব'লে আর পরলাম না।

মানদা ও পাচিকা একসঙ্গে দুইজনেই হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, না মা, না, আপনি পরুন, একটু ভাল কাপড় পরলে আপনাকে যা সুন্দর লাগে দেখতে! পরুন না, পরুন।

পরব ?

হ্যাঁ মা পরুন, পরবেন বৈকি।

বুড়ো মেয়ের শখ দেখে তোরা হাসবি তো ?

হেই মা, তাই হাসতে পারি ? আর আপনি বুড়ো হলেন কি ক'রে মা ? বড় দাদাবাবু এই আঠারোতে পড়লেন ; আমি তো জানি, আপনার পনেরো বছরে দাদাবাবু কোলে আসে। তা'হলে কত হয়—এই তো মোটে তেত্রিশ বছর বয়েস আপনার।

সুনীতির সকল সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। তিনি আবার বাক্স খুলিয়া বাছিয়া একখানি ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া আনিলেন। গা ধুইতে ধুইতে বলিলেন, গরমের দিন এল, আর আমার এই চুলের বোঝা নিয়ে হ'ল মরণ।

মানদা বলিল, উঠুন আপনি গা ধুয়ে, আপনার চুলটা বেঁধে দেব আজ। চুল বাঁধতে বললেই আপনি বলেন, ছেলে বড় হয়েছে, বুড়ো হয়েছি, কত কি। দেখুন গিয়ে ছোট-তরফের রায়-গিন্নীকে, আপনার চেয়ে কত বড়, চুলে পাক ধরেছে, তবু রোজ চুল বাঁধবেন।

হাতে মুখে সাবান দিয়া গা ধোয়া শেষ করিয়া সুনীতি বলিলেন, দে তাই, চুলগুলো বিনুনি ক'রে দে তো। এলোচুল খুলে পিঠে প'ড়ে এমন সুড়সুড় করে পিঠ!

সুনীতির চুলগুলো ভ্রমরের মত কালো আর কোঁকড়ানো। হাতের মুঠিতে চুলগুলি ধরিয়া মানদা বলিল, বাহারের চুল বটে মা। আ-হা-হা, কি নরম। ছোট দাদাবাবু ঠিক তোমার মত দেখতে, কিন্তু চুলগুলিনও পায় নাই, এমন বাহারের চোখও পায় নাই।

সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন, কই, অহীন্দ্র তো এখনও ফিরিল না? তিনি উৎকণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, তাই তো রে, অহি তো এখনও ফিরল না? বেরিয়েছে সেই কখন?

মানদা বলিল, বেশ, দেখুন গিয়ে তিনি ব'সে ব'সে রংলাল মোড়লের সঙ্গে গপ্প ক'রছেন। আমি দেখে এসেছি তাদের দুজনকে জল আনতে গিয়ে নদীর ধারে। মোড়ল একবার এই হাত ছুড়ছে, একবার ওই হাত ছুড়ছে, যেন বক্তৃতে ক'রছে।

সুনীতি বলিলেন, ওই ওর এক নেশা। যত চাষীভুষির সঙ্গে ব'সে গল্প করবে। রায়েরা নিন্দে করে, মহী তো আমার ওপরেই তাল ঝাড়বে। তবু তো বাবুর কানে ওঠে না।

মানদা বলিল, রায়েদের কথা ছাড়ান দেন মা, ওরা এ-বাড়ীর নিন্দে পেলে আর কিছু চায় না। আর ছোট দাদাবাবুর মত ছেলে তোমার হাজারে একটা নাই। আমি তো দেখি নাই। দেখে এস গিয়ে রায়বাড়ীর ছেলেদিগে, কথা কি সব, যেন ছুঁচে বিঁধছে। তুই-তুকারি চোপরাও, হারামজাদা-হারামজাদী তো ঠোঁটে লেগে আছে।—নেন মা, এইবার সিঁথিতে সিঁদুর নেন, কপালেও নেবেন, নিতে হয়।

সুনীতি স্থিরদৃষ্টিতে পশ্চিম দিকে একতলার ছাদের উপর দিয়া ও-পারের শূন্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া ছিলেন। ও-পাশে কাছারি-বাড়ীর

প্রাঙ্গণে এত আলো কিসের? শূন্যমণ্ডলটা পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি শঙ্কিত হইয়া বলিলেন, দেখ্ তো বেরিয়ে মানদা, বাইরে এত আলো কিসের?

মানদা সশঙ্কচিত্তে সন্তর্পণে বাহিরে গিয়া কিছুক্ষণ পরই ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল।—ওগো মা, একদল সাঁওতাল, এই সব মশাল জ্বেলে দাদাবাবুকে পৌঁছে দিতে এসেছে। এই সব ঠকাঠক পেনাম করছে। দাদাবাবুকে বলছে 'রাঙাবাবু'।

রাঙাবাবু? সুনীতি শিহরিয়া উঠিলেন। সাঁওতালদের রাঙাঠাকুর—তাঁহার শ্বশুরের কাহিনী তিনি বহুবার শুনিয়াছেন। পরক্ষণেই আবার তাঁহার মন তাঁহার শ্বশুরকুলের গৌরবে ভরিয়া উঠিল। আর ওই আদিম বর্ব্বর মানুষদের সকৃতজ্ঞ আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের প্রতিও মমতার সীমা রহিল না। এ-বাড়ীকে সাঁওতালেরা কোনদিন ভোলে নাই, সরকারের সহিত মকদ্দমার পর হইতে এই বাড়ীই সযত্নে সাঁওতালদের সহিত সংস্রব পরিহার করিয়া চলিয়াছে। বহু দিন ধরিয়া সরকার-পক্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন তাঁহার স্বামীর উপর।

হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে প্রবেশ করিল অহীন্দ্র, তাহার পিছনে পিছনে রংলাল আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইল।

আজ ওই চরটা দেখে এলাম মা। সাঁওতালেরা যা খাতির করলে। আমার নাম দিয়েছে রাঙাবাবু। একটা যা অজগর চিতি ওরা মেরেছে—প্রকাণ্ড বড়। অহীন্দ্রের ইচ্ছা হইতেছিল, একেবারে সকল কথা এক মুহূর্ত্তে সব জানাইয়া দেয়।

মা বলিলেন, ওই সাপখোপ-ভরা চর, ওখানে তুমি কেন গিয়েছিলে?

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, 'সাত কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ-জননী

রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি'। গেলাম তো হ'ল কি? ভয় কিসের?

বাহির-দরজায় রংলাল দাঁড়াইয়া ছিল, সে ডাকিল, দাদাবাবু। তাহার গামছায় ছিল সেই ফুলগুলি।

সুনীতি চকিত হইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া বলিলেন, মাঝিরা চলে গেল নাকি? মানদা, দাঁড়াতে বল্ তো মাঝিদের। মুড়কি আর নাড়ু দিতে হবে ওদের।

রংলাল বলিল, ওগো মানদা, এইগুলো বরং নাও তুমি, আমি যাই, মাঝিদের আটক করি। যে বোঙা জাত, হয়তো তোমার কথা বুঝবেই না।

মানদা ফুলগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিল, তাই বলি, দাদাবাবু এলেন আর এমন গন্ধ কোথা থেকে উঠল। আহা-হা, এ কি ফুল গো? কি ফুল দাদাবাবু?

ফুলের গন্ধে ও কদম্বফুলের মত পুষ্পগুচ্ছগুলির গঠন-ভঙ্গি দেখিয়া সুনীতিও আকৃষ্ট হইলেন, তিনিও কয়েকটি পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া বলিলেন, ভারী সুন্দর ফুল তো?

উচ্ছ্বসিত হইয়া অহীন্দ্র বলিল, ওই ফুলের গন্ধেই তো চরের ভেতরে গেলাম। রংলাল বললে, মাঝিরা ঠিক সন্ধান জানে। গেলাম যদি তো, আমাকে দেখেই কমল মাঝি, ওদের মোড়ল—উঃ, কি চেহারা তার মা, ঠিক যেন একটা পাহাড়ের মত—আমাকে দেখেই ঠিক চিনে ফেললে, বললে, হুঁ, ঠিক তেমনি পারা, তেমনি আগুনের মত রঙ, তেমনি চোখ, তেমনি চুল; ঠিক আমাদের রাঙাঠাকুরের নাতি! সেখানে মেয়েরা সব গোছায় গোছায় এই ফুল খোঁপায় প'রে আছে। সেই মেয়েরা এনে দিলে এত ফুল। সবাই নিয়ে এল এক এক আঁচল ভ'রে। যার না নিই, সে-ই রাগ করে। রংলাল বললে, সবারই নোব দাদাবাবু, চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

সুনীতি বলিলেন, যা, তুই কতকগুলো নিয়ে বাবুর ঘরে দিয়ে আয়। ভারী খুশি হবেন উনি। শুনেছিস তো, উনি নাকি সেকালে রোজ সন্ধ্যেতে ফুলের মালা পরতেন। যা, নিয়ে যা।

অহীন্দ্র বলিল, না, তুমি গিয়ে দিয়ে এস।

সে কি? এবার এসে একবারও তো তুই বাবুর সঙ্গে দেখা করিস নি! না না, এ তো ভাল নয় অহি।

আমার বড় কষ্ট হয় মা। তিনি কেমন হয়ে গেছেন। অথচ এত বড় পণ্ডিত, কি সুন্দর সংস্কৃত বলেন! আমার কান্না পায়।

সুনীতিরও চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিজেই ফুল লইয়া উঠিলেন। বলিলেন, কি করব বল্, তোদের অদৃষ্ট আর আমার পোড়া কপাল! আচ্ছা, আমিই দিয়ে আসছি। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ওগো বামুন-মেয়ে, মাঝিদের মুড়কি আর নাড়ু দিও সকলকে।

এতক্ষণে অহীন্দ্র মাকে দেখিয়া বলিল, বাঃ, বড় সুন্দর লাগছে মা তোমাকে আজ! অথচ কেন তুমি চব্বিশ ঘণ্টা এমন গরিব-গরিব সেজে থাক?

সুনীতি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলেন, তবু চট করিয়া আপন লজ্জা ঢাকিয়া বলিলেন, আজ আমি রাঙাবাবুর মা হয়েছি কিনা, তাই। আর বেয়াই আসবে ব'লে সেজেছি এমন, তোর ওই সাঁওতালদের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব।

ছেলে লজ্জিত হইয়া পড়িল, মাও দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। অতি অল্পক্ষণ পরেই মাঝিদের লইয়া রংলাল আসিয়া অন্দরের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল, দাদাবাবু!

মানদা বলিল, এস মোড়ল, ভেতরে নিয়ে এস ওদের, মা ওপরে আছেন।

*　　*　　*　　*

স্নীতি দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঘর অন্ধকার, বাতিটা বোধ হয় নিবিয়া গিয়াছে। তিনি দরজাটা আবার খুলিয়া অহিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, একটা প্রদীপ নিয়ে আয় তো অহি।

অন্ধকার কক্ষের মধ্য হইতে রামেশ্বর বলিলেন, কে, স্নীতি? তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উত্তেজিত এবং মৃদু চাপা ভঙ্গির মধ্যে আশঙ্কার আভাস সুপরিস্ফুট।

স্নীতি বুঝিলেন, আলো নিবিয়া যাওয়ায় রামেশ্বর উত্তেজিত হইয়াছেন। চোখে তাঁহার আলো সহ্য হয় না, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একা থাকিতেও তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। স্নীতি বলিলেন, এই এক্ষুনি আলো নিয়ে আসছে। কিন্তু আমি কি এনেছি বল তো? খুব একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছ?

স্নীতির কথার উত্তর তিনি দিলেন না, উত্তেজিতভাবেই তেমনি চাপা গলায় বলিলেন, এত আলো কেন কাছারি-বাড়ীতে স্নীতি? এত লোক? আমাকে কি ওরা ধ'রে নিয়ে যাবে? তাই আমি আলোটা নিবিয়ে দিয়েছি।

স্নীতির সকল আনন্দ ম্লান হইয়া গেল, তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না না। ওরা সব সাঁওতাল, অহিকে পৌছে দিতে এসেছিল।

অহিকে পৌছে দিতে এসেছিল? সাঁওতাল?

হ্যাঁ, কালীর ওপারে যে চরটা উঠেছে, অহি আজ সেই চরে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে সাঁওতালেরা এসে বাস করছে; রাত্রি হ'তে তারা সব মশাল জ্বেলে অহিকে পৌছে দিয়ে গেল। অহি তোমার জন্যে খুব চমৎকার ফুল এনেছে, গন্ধ পাচ্ছ না?

ফুল? তাই তো, চমৎকার গন্ধ উঠেছে তো! অহি এনেছে? আমার জন্যে?

হ্যাঁ।

অহি আলো লইয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সুনীতি আলোর ছটায় ফুলের স্তবকটি রামেশ্বরের সম্মুখে ধরিলেন। রামেশ্বর মুগ্ধ-দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে বলিলেন, কুটজ কুসুম। বনবালারা, পর্ব্বতদুহিতারা সেকালে কানে চুলে আভরণস্বরূপ ব্যবহার করতেন। আমরা বলি কুর্চি ফুল।

অহি বলিয়া উঠিল, সাঁওতালদের মেয়েরা দেখলাম থরে থরে সাজিয়ে খোঁপায় পরেছে।

সুনীতি বলিলেন, অহিকে নাকি সাঁওতালেরা দেবতার মত খাতির করেছে, শ্বশুরের নাম ক'রে বলেছে, তুই বাবু আমাদের রাঙাঠাকুরের নাতি, দেখতেও ঠিক তেমনি। এক বুড়ো সাঁওতাল তাঁকে দেখেছিল, সে বলেছে, অহি নাকি ঠিক আমার শ্বশুরের মত দেখতে। ওর নাম দিয়েছে রাঙাবাবু।

রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া অহির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোল তো, আলোটা তোল তো সুনীতি, দেখি।

সুনীতি আলো তুলিয়া অহীন্দ্রের মুখের পাশে ধরিলেন। দেখিতে দেখিতে সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে তিনি বলিলেন, হুঁ। কণ্ঠস্বরে একটি সকরুণ বিষণ্ণ-সুর সুনীতি ও অহীন্দ্র দুইজনকেই স্পর্শ করিল। হয়তো কোনও অবান্তর অসম্ভব কথা এইবার তিনি বলিয়া উঠিবেন আশঙ্কা করিয়া সুনীতি বলিলেন, অহি যা, বাবা, তুই খেয়ে নিগে। আমি আলোটা জ্বেলে দিয়ে আসছি।

অহি চলিয়া গেল। সুনীতি আলোটা জ্বালিয়া দিয়া একটি শ্বেতপাথরের গ্লাসে ফুলগুলি সাজাইয়া দিয়া বলিলেন, এই দেখ, খুব

সুন্দর কাপড় পরেছি আজ, চুলও বেঁধেছি। গীতগোবিন্দ শোনাবে তো?

রামেশ্বরের কানে সে কথা প্রবেশই করিল না, তিনি যেন কোন গভীর চিন্তার মধ্যে আত্মহারার মত মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। সুনীতি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, কি ভাবছ?

ভাবছি, অহি যদি সাঁওতালদের নিয়ে গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা করে!

না না না, অহি সে-রকম ছেলে নয়; খুব ভাল ছেলে, প্রত্যেক বার স্কুলে ফার্স্ট হয়। তুমি তো ডেকে কথাবার্ত্তা বল না; কথা ব'লে দেখো, ভালো সংস্কৃত শিখেছে, কত দেশ-বিদেশের গল্প বলে!

রামেশ্বরের দুর্ভাবনা ইহাতেও গেল না, তিনি বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন সাঁওতালেরা চিনেছে যে! আবার নাম দিয়েছে বলছ—রাঙাবাবু, আর ঠিক সেই রকম দেখতে!

সুনীতির এক এক সময় ইচ্ছা হয়, কঠিন একটা পাথরের নিষ্ঠুর আঘাতে আপনার কপালখানাকে ভাঙিয়া ললাটলিপিকে ধূলার মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া দেন। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিলেন। নীচে মানদা ও বামুন-ঠাকুরণ বসিয়া সাঁওতালদের কথা আলোচনা করিতেছিল, মানদা বলিতেছিল, আমার সবচেয়ে ভাল লাগে ওদের বাঁশী। শুনছ, বাড়ী ফিরতে ফিরতে বাঁশী বাজাচ্চে, শুনতে পাচ্ছ?

সুনীতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, এখনও তোমাদের গল্প হচ্ছে মা? ছি!

৫

অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করা ইন্দ্র রায়ের চিরদিনের অভ্যাস। এক কালে ভোরে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। বয়সের সঙ্গে ব্যায়ামের অভ্যাস আর নাই, কিন্তু এখনও তিনি শয্যা

পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া নিয়মিত খানিকটা হাঁটিয়া আসেন।

একলাই যাইতেন। গ্রামের উত্তরে লাল মাটির পাথুরে টিলা, অবাধ প্রান্তর। ক্রোশ কয়েক দূরে একটা শাল-জঙ্গল, জঙ্গলের গায়েই একটা পাহাড়, সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের একটা প্রান্ত আসিয়া এ-অঞ্চলেই শেষ হইয়াছে। ওই টিলাটাই ছিল তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট স্থান, পৃথিবীর কক্ষপথের মত প্রাতর্ভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথ। সম্প্রতি তাঁহার একজন সঙ্গী জুটিয়াছে। তাঁহারই সমবয়সী এক বিদেশী ভদ্রলোক, ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় মৃতপ্রায় হইয়া স্বাস্থ্যকর স্থানের সন্ধানে এখানেই আসিয়া পড়েন, ইন্দ্র রায়েরই আশ্রয়ে। ইন্দ্র রায় বর্ত্তমানে বাড়ী-ঘর ও কিছু জমিজায়গা দিয়া তাঁহাকে এখানেই বাস করাইয়াছেন। প্রাতর্ভ্রমণে পথে ইন্দ্র রায়ের সঙ্গে সঙ্গী হন এই ভদ্রলোক।

আজ ইন্দ্র রায় বাহিরে আসিয়া বাড়ীর ফটক খুলিয়া বাহির হইতে গিয়া আবার ফিরিলেন। হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ মুচকুন্দ সিং কাছারির বারান্দায় চিত হইয়া পড়িয়া অভ্যাসমত নাক ডাকাইতেছিল, রায় তাঁহার স্থূল উদরের উপর হাতের ছড়িটার প্রান্ত দিয়া ঠেলিয়া ডাকিলেন, এই, উঠো, জলদি উঠো।

সিং নড়িল না, নিদ্রারক্ত চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, লোকটা কে? রায়কে দেখিয়া তাহার সমস্ত দেহটা নড়িয়া উঠিল চমকানোর ভঙ্গিতে, পরমুহূর্ত্তে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, হুজুর!

এস আমার সঙ্গে, লাঠি নাও।

চাপরাস, আওর পাগড়ি?

ধমক দিয়া রায় বলিলেন, না, এমনি লাঠি নিয়ে এস, তা হ'লেই হবে।

লাঠি লইয়া সিং খুঁজিতেছিল, আঃ,তেরি আঙ্গোছা কাঁহা গইল বা? অন্তত গামছাটা কাঁধে না ফেলিয়া যাইতে কোনমতেই তাহার মন উঠিতেছিল না। গামছাটা কোনমতে বাহির করিয়া সেখানাই মাথায় জড়াইয়া লইয়া মুচকুন্দ বাহির হইল।

রায়ের সঙ্গী অচিন্ত্যবাবু ততক্ষণে উঠিয়া আপনার মেটে ঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিবিষ্ট মনে চোখের তারা দুইটি গোঁফের উপর আবদ্ধ করিয়া বোধ হয় কাঁচা চুল বাছিতেছিলেন।

রায় আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, কাঁচা গোঁফ আর নাই বললেই চলে রায় মশায়।

রায় হাসিয়া বলিলেন, সেটা তো আয়নাতেই দেখতে পান অচিন্ত্যবাবু।

অচিন্ত্যবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উঁহু, আয়না আমি দেখি না।

রায় আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, আয়না দেখেন না? কেন?

ও দেখলেই আমার মনে হয়, শরীরটা ভয়ঙ্কর খারাপ হয়ে গেছে। মনে হয়, আর বেশি দিন বাঁচব না। কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে বাহন যে?

আজ একটু দিগন্তরে যাব; নদীর ও-পারে একটা চর উঠেছে সেই দিকে যাব।

অচিন্ত্যবাবু চমকিয়া উঠিলেন, ওরে বাপ রে! ওখানে শুনেছি ভীষণ সাপ মশায়। শেষকালে কি প্রাণ হারাবেন? না না, ও মতলব ছাড়ুন, চর-ফর দেখতে ওই বরকন্দাজ-ফরকন্দাজ ভেজে দেন, না হয় নায়েব-গোমস্তা।

আরে না না, ভয় নেই আপনার। ওখানে এখন সাঁওতাল এসে বসেছে, রীতিমত রাস্তা করেছে, চাষ করেছে, কুয়ো খুঁড়েছে, কুয়োর জল নাকি খুব উৎকৃষ্ট। নদীর জলটাই আবার ফিল্টার হয়ে যায়

তো। চলুন, চাষের জায়গা কি রকম দেখবেন, আপনার তো অনেক রকম প্ল্যান-ট্ল্যান আছে, চলুন, কোনটা যদি কাজে লাগানো যায় তো দেখা যাক।

অচিন্ত্যবাবু আর আপত্তি করিলেন না, কিন্তু গতি তাঁহার অতি মন্থর হইয়া পড়িল। ভদ্রলোকের বাপ ছিলেন দারোগা, নিজে এফ. এ. পাশ করিয়া চাকরি পাইয়াছিলেন পোষ্ট অফিসে। কিন্তু রোগের জন্য অকালে ইন্‌ভ্যালিড পেন্‌শন লইয়াছেন। সামান্য পেন্‌শনে সংসার চলিয়া যায়; পিতার ও নিজের চাকরি-জীবনের সঞ্চয় লইয়া নানা ব্যবসায়ের কথা ভাবেন, সে সম্বন্ধে খোঁজ-খবর লইয়া কাগজে-কলমে লাভ-লোকসান কষিয়া ফেলেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ কর্ম্মের সময় হাত-পা গুটাইয়া বসেন। পুনরায় অন্য ব্যবসায়ের কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন।

কালিন্দীর কূলে আসিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, বিউটিফুল সানরাইজ! আপনি বরং ঘুরে আসুন রায় মহাশয়, আমি ব'সে ব'সে সূর্য্যোদয় দেখি।

রায় মৃদু-হাসিয়া বলিলেন, যাবেন না? কিন্তু ভয় কি মৃত্যুর গতি রোধ করতে পারে অচিন্ত্যবাবু?

অচিন্ত্যবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তবু যথাসাধ্য সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, তা ব'লে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার নাম বাহাদুরি নয়! ধরুন্, পাঁচহাজার টাকার তোড়ার পাশে একটা ভীষণ সাপ রেখে দিয়ে যদি কেউ বলে, নিয়ে যেতে পারলে টাকাটা তোমার; যাবেন আপনি নিতে?

রায় এবার হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়। সাপটাকে মেরে টাকাটা নিয়ে নেব।

অচিন্ত্যবাবু সবিস্ময়ে রায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া

থাকিয়া বলিলেন, তা আপনি নিন গিয়ে মশায়, ও আমি নিতেও চাই না, যেতেও চাই না। কথা শেষ করিয়াই তিনি নদীর ঘাটে শ্যামল ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন ; বলিলেন, এই হ'ল ঠিক আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রে—জবাকুসুমসঙ্কাশ।

ইন্দ্র রায় হাসিয়া জুতা খুলিয়া নদীর জলে নামিলেন।

আসল কথা, ইন্দ্র রায় বিগত সন্ধ্যার সেই মশালের আলো জ্বালিয়া সাঁওতালবেষ্টিত রাঙাঠাকুরের পৌত্রের ওই শোভাযাত্রা নিতান্ত সাধারণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাঙাঠাকুরের নাতি—আমাদের রাঙাবাবু, কথাটার মধ্যে একটা বিশেষ অর্থের সন্ধান যেন তিনি পাইয়াছিলেন। রাত্রির শেষ প্রহর পর্য্যন্ত তিনি বসিয়া বসিয়া এই কথাটাই শুধু চিন্তা করিয়াছিলেন। একটা দুগ্ধপোষ্য বালক এক মুহূর্ত্তে হিমালয়ের মত অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল যে! সাঁওতাল জাতের প্রকৃতি তো তাঁহার অজানা নয়! আদিম বর্ব্বর জাতি যাহাকে দেবতা বলিল, তাহাকে কখনও পাথর বলিবে না। বলুক, রামেশ্বরের ওই সুকুমার ছেলেটিকে দেবতা তাহারা বলুক, কিন্তু দেবতাটি ওই চর প্রসঙ্গে কোন দৈববাণী করিয়াছে কি না সেইটুকুই তাঁহার জানার প্রয়োজন। আসলে সেইটুকুই আশঙ্কার কথা। সেই কথাই জানিতে তিনি আজ দিক-পরিবর্তন করিয়া চরের দিকে আসিয়াছেন।

চরের ভিতর সাঁওতাল-পল্লীর প্রবেশমুখে দাঁড়াইয়া তিনি মুচকুন্দ সিংকে বলিলেন, ডাকতো মাঝিদের।

মুচকুন্দ সিং পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মোটা গলায় হাঁকে-ডাকে সোরগোল বাধাইয়া তুলিল। তাহার নিজের প্রয়োজন ছিল একটু চুন ও খানিকটা তামাক-পাতার। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিবার সময় ওটা ভুল হইয়া গিয়াছে। পল্লীর মধ্যে পুরুষেরা

কেহ নাই, তাই সকলেই আপন আপন গরু মহিষ ছাগল এই বন জঙ্গলের মধ্যেই কোথায় চরাইতে লইয়া গিয়াছে। মেয়েরা আপন আপন গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত, তাহারা কেহই মুচকুন্দর উত্তর দিল না। দুই-একজন মাটি কোপাইয়া মাটির বড় বড় চাঙড় তুলিতেছে, পরে জল দিয়া ভিজাইয়া ঘরের দেওয়াল দেওয়া হইবে। মাত্র একজন আধাবয়সী সাঁওতাল এক জায়গায় বসিয়া একটা কাঠের পুতুল লইয়া কি করিতেছিল। পুতুলটার কোমর হইতে বেশ বড় এক ফালি কাপড় ঘাঘরার মত পরানো। এই ঘাঘরার মধ্যে হাত পুরিয়া ভিতরে সে পুতুলটাকে ধরিয়া আছে। হাঁক-ডাক করিতে করিতে মুচকুন্দ সেখানে আসিয়া তাহাকে বলিল, আরে চল্ উধার, বাবু আসিয়েসেন তুদের পাড়া দেখতে।

মাঝি নিবিষ্টমনে আপন কাজ করিতে করিতে বলিল, সি—তু বল্‌গা যেঁয়ে মোড়ল মাঝিকে। আমি এখন যেতে লারব।

কৌতূহলপরবশ হইয়া মুচকুন্দ প্রশ্ন করিল, উটা কি আসে রে? কেয়া করেগা উ লেকে?

মাঝি হাতটি বাড়াইয়া পুতুলটা মুচকুন্দের মুখের কাছেই ধরিল, পুতুলটা সঙ্গে সঙ্গে দুইটা হাতে তালি দিয়া মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিল। মুচকুন্দ আপনার মুখ খানিকটা সরাইয়া লইয়া মুগ্ধভাবেই বলিল, আ—হা!

কয়টি তরুণী মেয়ে আঙিনা পরিষ্কার করিতেছিল, তাহারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কখন একটা ছেলে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিল মোড়ল মাঝির নিকট, সংবাদ পাইয়া কমল মাঝি ঠিক এই সময়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। মুচকুন্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে বেশ বিনয়সহকারেই বলিল, কার সিপাই বটিস গো তু? বুলছিস কি?

মুচকুন্দ বলিল, ইন্দর রায়, ছোট তরফ। চল্, বাহারমে হুজুর দাঁড়াইয়ে আসেন।

মাঝি ব্যস্ত হইয়া আদেশ করিল, চৌপায়া নিয়ে আয়।

রায় এতক্ষণ চারিদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা চরটা পাঁচশ বিঘা হইবে না, তবে তিন শ বিঘা খুব। হাতে খানিকটা মাটি তুলিয়া তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। মাটির ঢেলাটা আয়তনের অনুপাতে লঘু। সূক্ষ্ম বালুকণাগুলি সূর্য্যকিরণে ঝিকমিক করিতেছে। বুঝিলেন, উর্ব্বরতায় যাহাকে বলে স্বর্ণপ্রসবিনী ভূমি—এ তাই। আবার একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া তিনি চরটার সংলগ্ন এ-পারের গ্রামখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। এ-গ্রামখানা চক-আফজলপুর, চক্রবর্ত্তীদের সম্পত্তি। এটার সম্মুখীন হইলে তো চরটা হইবে চক্রবর্ত্তীদের। কিন্তু ঠিক কি চক-আফজল-পুরের সম্মুখেই পড়িতেছে? আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি তরুণ সূর্য্য এবং আপনার ছায়াকে এক রেখায় রাখিয়া দাঁড়াইলেন। চৈত্র মাস—আজ পনরোই চৈত্র; সূর্য্য প্রায় বিষুবরেখায় অবস্থান করিতেছেন। তাহা হইলে চক-আফজলপুর একেবারে উত্তরে। অন্তত বারো আনা চর আফজলপুরের সীমানাতেই পড়িবে! একেবারে পশ্চিম প্রান্তের এক-চতুর্থাংশ—ষোল আনা রায়বংশের সীমানায় পড়িতে পারে। রায় হাসিলেন, মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের। ইহারও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু রাধারাণীর সন্তানের ভোগ্যবস্তু তাহার সপত্নীপুত্র ভোগ করিবে—এইটাই তাঁহার কাছে মর্ম্মান্তিক।

মাঝি আসিয়া ঈষৎ নত হইয়া রায়কে প্রণাম করিল, একটা ছেলে চৌপায়টা আনিয়া দিল। রায় হাতের ছড়িটাকে চৌপায়ার উপর রাখিয়া ছড়িটার উপর ঈষৎ ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, বসিলেন না। তারপর প্রশ্ন করিলেন, তুই এখানকার মোড়ল মাঝি?

হাতজোড় করিয়া মাঝি উত্তর দিল, হ্যাঁ বাবুমশায়।

হুঁ। কতদিন এসেছিস এখানে?

তা আজ্ঞা, এক দুই তিন মাস হবে গো; সেই কাত্তিক মাসে এসেই তো এখানে আলু লাগালম গো।

হাসিয়া রায় বলিলেন, বুঝলাম, ছ মাস হ'ল এসেছিস। কিন্তু কাকে ব'লে বসলি এখানে তোরা?

কাকে বুলব? দেখলম জঙ্গল জমি, প'ড়ে রয়েছে, ব'সে গেলম।

সুগভীর গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রায় বলিলেন এ চর আমার।

মাঝি বলিল, সি আমরা জানি না।

আমাকে কবুলতি দিতে হবে, এখানে বাস করতে হ'লে কবুলতি লিখে দিতে হবে।

মাঝি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, সিটো আবার কি বেটে গো?

কাগজে লিখে দিতে হবে যে, আপনি আমাদের জমিদার, আপনাকে আমরা এই চরের খাজনা কিস্তি-কিস্তি মিটিয়ে দেব। তারপর সেই কাগজে তোরা আঙুলের টিপছাপ দিবি।

মাঝি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, যেন কথাটা সে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেছে। রায় বলিলেন, কথাটা বুঝলি তো? কবুলতি লিখে দিতে হবে।

ইহারই মধ্যে সাঁওতালদের মেয়েগুলি আসিয়া এক পাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া খুব গম্ভীরভাবে সমস্ত কথা শুনিতেছিল, মৃদুস্বরে আপনাদের ভাষায় পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল। মাঝির নাতনীটি এবার বলিয়া উঠিল, কেনে, তা লিখে দিবে কেনে? টিপছাপটি দিবে কেনে?

নইলে এখানে থাকতে পাবি না।

মেয়েটিই বলিল, কেনে পাব না কেনে?

না, চর আমার। থাকতে হ'লে কবুলতি দিতে হবে।

এতক্ষণে মাঝি ঘাড় নাড়িয়া প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জানাইয়া বলিল, উঁহু।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া রায় বলিলেন, 'উঁহু' বললে চলবে না মাঝি। প্রজাবন্দোবস্তির এই নিয়ম, কবুলতি না দিলে চলবে না।

সেই মেয়েটি বলিয়া উঠিল, তুরা যদি খত লিখে লিস এক শ, দু শ টাকা পাবি লিখিস?

রায় হাসিয়া ফেলিলেন, না না, সে ভয় নেই, তা লিখে নেব না। জমিদার কি তাই কখনও করে?

মেয়েটা বলিল, করে না কেন? ঐ—উ গাঁয়ে, সি গাঁয়ে লিখে লিলে যি!

মাঝি এবার বলিল, তবে সিটো আমরা শুধাবো আমাদের রাঙা-বাবুকে, সি যদি বলে তো, দিবো টিপছাপ।

রায়ের মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হইয়া উঠিল, তিনি গম্ভীরভাবে শুধু বলিলেন, হুঁ। তারপর পল্লীর দিকে পিছন ফিরিয়া ডাকিলেন, মুচকুন্দ সিং!

মুচকুন্দ তখন সেই পুতুল-নাচের ওস্তাদ সাঁওতালটির সহিত জমাইয়া বসিয়াছিল। সে চুন ও তামাকের পাতা সহযোগে খৈনি প্রস্তত করিতেছিল; আর ওস্তাদ নানা ভঙ্গিতে নাচিতে নাচিতে বোল বলিতেছিল—চিলক্, চিলক্, চিলক্। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাঠের পুতুলটাও ঘাড় ও মাথা নাড়িয়া তালে তালে তালি দিতেছিল, খটাস, খটাস, খটাস, খটাস।

মুচকুন্দ বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়া তারিফ করিতেছিল।

প্রভুর ডাক শুনিয়া সে বলিল, গাঁওমে যাস্ মাঝি, রোজগার হোবে তোর।

রায়-বংশ শাখাপ্রশাখায় বহুধাবিভক্ত। আয়ের দিক দিয়া বাৎসরিক পাঁচ শত টাকার আয় বড় কাহারও নাই। কেবল ছোট বাড়ী আজ তিন পুরুষ ধরিয়া এক সন্তানের বিশেষত্বের কল্যাণে এখনও উহারই মধ্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন। ইন্দ্রচন্দ্র রায়ের বাৎসরিক আয় দেড় হাজার হইতে দুই হাজার হইবে। আর ও-দিকে মাঝের বাড়ী অর্থাৎ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী রায়েদের সম্পত্তির তিন আনা চার গণ্ডা যা এক-পঞ্চমাংশের অধিকারী। তাঁহার অংশের আয় ওই হাজার দুইয়েক টাকা; আয় অল্প হইলেও ইন্দ্র রায়ের প্রতাপ এ অঞ্চলে যথেষ্ট। রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর মস্তিষ্কবিকৃতির পর ইন্দ্র রায়ের এখন অপ্রতিহত প্রতাপ। বাড়ী ফিরিয়া তিনি সাঁওতাল-পল্লীতে দশজন লাঠিয়াল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন; আদেশ দিলেন, ঠিক বেলা তিনটার সময় মাঝিদের ধরিয়া আনিয়া কাছারিতে বসাইয়া রাখিবে। সেইটাই তাহাদের খাইবার সময়। সাধারণতঃ সাঁওতালেরা অত্যন্ত শান্ত নিরীহ প্রকৃতির জাতি—মাটির মত; উত্তপ্ত সহজে হয় না, কখনও কখনও ভিতর হইতে প্রলয়াগ্নিশিখা বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সেও শতাব্দীতে একবার হয় কি না সন্দেহ।

অপরাহ্ণের দিকে লাঠিয়ালরা গিয়া তাহাদের আনিয়া ছোট বাড়ীর কাছারিতে আটক করিল। ইন্দ্র রায় বাড়ীতে তখনও দিবানিদ্রায় মগ্ন। মোড়ল মাঝি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, কই গো, বাবুমহাশয় কই গো? একসঙ্গে সাত আটজন লাঠিয়াল সমস্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, চো—প!

কাছারি-বাড়ীর সাজসজ্জা আজ একটু বিশিষ্ট রকমের, সাধারণ

অবস্থার চেয়ে জাঁকজমক অনেক বেশি। কাছারি-ঘরে প্রবেশের দরজার দুই পাশে বারান্দায় দেওয়ালের গায়ে গুণ-চিহ্নের ভঙ্গীতে আড়াআড়িভাবে দুইখানা করিয়া চারিখানা তলোয়ার ঝুলিতেছে, দুইদিকেই মাথার উপরে এক-একখানা ঢাল। ইন্দ্র রায়ের বসিবার আসন ছোট তক্তপোশটার উপর একটা বাঘের চামড়া বিছানো। মুচকুন্দ সিং প্রকাণ্ড পাগড়ি বাঁধিয়া উর্দ্দি ও তকমা আঁটিয়া ছোট একটা টুলের উপর বসিয়া আছে। সাঁওতালেরা অবাক হইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। ইন্দ্র রায় কূটকৌশলী ব্যক্তি, তিনি জানেন চোখে ধাঁধা লাগাইতে না পারিলে সম্ভ্রমের যাদুতে মানুষকে অভিভূত করিতে পারা যায় না। চাপরাসী নায়েব সকলেই ফিসফাস করিয়া কথা কহিতেছিল, এতটুকু জোরে শব্দ হইলেই নায়েব ভ্রূকুটি করিয়া করিয়া বলিতেছিলেন, উঃ!

অচিন্ত্যবাবু প্রত্যহ অপরাহ্নে এই সময়ে ইন্দ্র রায়ের নিকট আসেন। তিনি আসিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যেন একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। নায়েবের নিকট আসিয়া চুপিচুপি প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপার কি মিত্তির মশায়? এত লোকজন, ঢাল-তরোয়াল? কোন দাঙ্গা-টাঙ্গা নাকি?

মিত্তির হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—হঠাৎ বাবুর খেয়াল আর কি!

অচিন্ত্যবাবুর দৃষ্টি ততক্ষণে কমল মাঝির উপর পড়িয়াছিল, তিনি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশ! সাক্ষাৎ যমদূত! আচ্ছা, আমি চললাম এখন, অন্য সময় আসব।

বসবেন না?

উঁহু। একটু ব্যস্ত আছি এখন। মানে ওই চরটায় শুনছি অনেক রকম ওষুধের গাছ আছে। তাই ভাবছি, কলকাতায় গাছগাছড়া চালানের একটা ব্যবসা করব। তারই প্ল্যান—হিসেব-নিকেশ করতে হবে। তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ইন্দ্র রায় কাছারিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখাদেখি সাঁওতালেরাও উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্দ্র রায় আসন গ্রহণ করিয়া কর্ম্মান্তরে মনোনিবেশ করিলেন, অস্নাত অভুক্ত সাঁওতাল দল নীরবে জোড়হাত করিয়া বসিয়া রহিল। কাছারি-বাড়ীর দরজায় কয়টি সাঁওতালের মেয়ে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া আপন আপন বাপ-ভাই-স্বামীর সন্ধানে আসিয়াছে। আপনাদের ভাষায় তাহারা কথা বলিতে বলিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিল।

ইন্দ্র রায় লাঠিয়ালদিগকে কি ইঙ্গিত করিলেন, একজন লাঠিয়াল অগ্রসর হইয়া গিয়া মেয়েদের বাধা দিয়া বলিল, কি দরকার তোদের এখানে? যা, এখানে গোলমাল করিস নি।

কমলের নাতিনী—দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বলিল, কেনে তোরা আমাদের লোককে ধ'রে এনেছিস?

বৃদ্ধ কমল মাঝি আপন ভাষায় তাহাদের বলিল, যাও যাও, তোমরা বাড়ী যাও। বাবু রাগ করবেন। সে বড় খারাপ হবে।

মেয়েগুলি সভয়ে ক্ষুণ্ণ মনেই চলিয়া গেল।

এতক্ষণে বৃদ্ধ মাঝি করজোড়ে বলিল, আমরা এখুনও খাই নাই বাবু, ছেড়ে দে আজ আমাদিগে।

ইন্দ্র রায় বলিলেন, কবুলতিতে টিপ্‌ছাপ দিয়ে বাড়ী চ'লে যা।

মাঝি বলিল, হাঁ বাবু, সিটি কি ক'রে দিবো? আমাদের রাঙাবাবুকে আমরা গিয়ে শুধাই, তবে তো দিবো।

নায়েব ধমক দিয়া উঠিলেন, রাঙাবাবু কে রে? তাকে কি জিজ্ঞেস করবি? টিপছাপ দিতে হবে।

অদ্ভুত জাত, বিদ্রোহও করে না, আবার ভয়ও করে না; কমল মাঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁ—হু।

আবার সাঁওতালদের মেয়েগুলির কলরব বাহিরে ফটক-দুয়ারের সম্মুখে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আবার উহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। রায়ের মনে এবার করুণার উদ্রেক হইল, আহা! কোনোমতেই ইহাদের এখানে রাখিয়া যাইতে বেচারাদের মন উঠিতেছিল না। যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি একজন লাঠিয়ালকে বলিলেন, দরজা খুলে ওদের আসতে বল্। তিনি স্থির করিলেন, সকলকেই এখানে আহার করাইয়া আজিকার মত অব্যাহতি দিবেন। টিপসই উহারা স্বেচ্ছায় দিয়া যাইবে।

লাঠিয়াল অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু ফটকের দরজা খুলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল অহীন্দ্র। তাহার পিছনে পিছনে ওই মেয়েগুলি। রায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সুকঠিন ক্রোধে বজ্রের মত তিনি উত্তপ্ত এবং উদ্যত হইয়া উঠিলেন।

অহীন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, এদের ছেলেমেয়েরা কাঁদছে মামাবাবু। ভয়ে আপনার সামনে আসতে পারছে না। এ বেচারারা এখনও স্নান করে নি, খায় নি, এখন কি এমনি করে বসিয়ে রাখতে আছে? এদের ছেড়ে দিন।

অহীন্দ্র এতগুলি কথা বলিয়া গেল, বজ্রগর্ভ অন্তরেই রায় বসিয়া রহিলেন, কিন্তু ফাটিয়া পড়িবার তাঁহার অবসর হইল না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অন্তর্লোকই সে বিদ্যুৎশিখা এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে বর্ষণোন্মুখ করিয়া তুলিল। সহসা তাঁহার মনে হইল, রাধারাণীর ছেলেই যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে, মামাবাবু!

অহীন্দ্র এবার সাঁওতালদের বলিল, যা, তোরা বাড়ী যা এখন, আবার ডাকতে গেলেই আসবি, বুঝলি?

সাঁওতালেরা হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু একজন লাঠিয়াল বলিয়া উঠিল, খবরদার বলছি, ব'স সব, ব'স।

এতক্ষণে বজ্রপাত হইয়া গেল, দারুণ ক্রোধে ইন্দ্র রায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, চোপরাও হারামজাদা! তারপর সাঁওতালদের বলিলেন, যা, তোরা বাড়ী যা।

৬

সমস্ত গ্রামে কিন্তু রটিয়া গেল, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ছোট ছেলে অহীন্দ্র ইন্দ্র রায়ের নাক কাটিয়া ঝামা ঘষিয়া দিয়াছে; ইন্দ্র রায় সাঁওতালদের আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন, অহীন্দ্র জোর করিয়া তাহাদের উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছে। রটনার মূলে ওই অচিন্ত্যবাবুটি। তিনি একটু আড়ালে দাঁড়াইয়া দূর হইতে যতটা দেখা ও শোনা যায়, দেখিয়া শুনিয়া গল্পটি রচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচণ্ড একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার কল্পনা করিয়া সভয়ে স্থানত্যাগ করিয়াও নিরাপদ দূরত্বের আড়ালে থাকিয়া ব্যাপারটা দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই।

সাময়িক দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়া ইন্দ্র রায়ও লজ্জিত হইয়াছিলেন। মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্য সকলে তাঁহার মাথায় যে অপমানের অপবাদ চাপাইয়া দিল, সে অপবাদ সংশোধন করা এখন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বড়ছেলে মহীন্দ্র এবং বিচক্ষণ নায়েব যোগেশ মজুমদার আসিয়া পৌছিয়া গিয়াছে। কাল রাত্রেই তাহারা আসিয়া পৌছিয়াছে। আজ প্রাতঃকালে তাঁহার লোক সাঁওতাল-পাড়ায় গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর নায়েব সাঁওতাল-পাড়ায় বসে রয়েছেন, লোকজনও অনেকগুলি রয়েছে। আমরা সাঁওতালদের ডাকলাম, তাতে ওঁদের নায়েব বললেন, আমি ওদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি, বলগে বাবুকে।

ইন্দ্র রায় গম্ভীর মুখে মাথা নত করিয়া পদচারণা আরম্ভ করিলেন,

মনে মনে নিজেকেই তিনি বার বার ধিক্কার দিতেছিলেন। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন, ও-পারের চর ও তাঁহার মধ্যে প্রবহমাণা কালিন্দী অকস্মাৎ দুকূল পাথার হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই মজুমদার আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার পিছন পিছন সাঁওতালেরাও আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মজুমদার রায়কে প্রণাম করিয়া বলিল, ভাল আছেন?

রায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ। তারপর আবার বলিলেন, কি রকম? আবার নাকি চক্রবর্ত্তীরা সাঁওতালদের নিয়ে দেশ জয় করবে শুনছি?

তাঁহারই কথার কৌতুকে হাসিতেছে, এমনি ভঙ্গিতে হাসিয়া মজুমদার বলিল, এসে শুনলাম সব। তা, আমাদের ছোটবাবু অনেকটাই ওঁর পিতামহের মত দেখতে, এটা সত্যি কথা।

রায় ঠোঁট দুইটি ঈষৎ বাঁকাইয়া বলিলেন, তা সাঁওতালবাহিনী নিয়ে লড়াইটা প্রথম আমার সঙ্গেই করবে নাকি তোমরা?

লজ্জায় জিভ কাটিয়া মজুমদার বলিয়া উঠিল, রাম রাম রাম, এই কথা কি হয়, না হ'তে পারে? তা ছাড়া আপনার অসম্মান কি কেউ এ-অঞ্চলে করতে পারে বাবু?

রায় চুপ করিয়া রহিলেন, মজুমদার আবার বলিল, সেই কথাই হচ্ছিল কাল ও-বাড়ীর গিন্নী-ঠাকরুণের সঙ্গে। তিনি বললেন, এ-বিবাদ গ্রামজুড়ে বিবাদ। এখনও কেউ এগোয় নি বটে, কিন্তু বিবাদ আরম্ভ হ'লে কেউ পেছিয়ে থাকবে না। আমি সেইজন্যে অহিকে ও-বাড়ীর দাদার কাছে পাঠিয়েছিলাম। কাল তুমি একবার যাবে মজুমদার ঠাকুরপো, বলবে, তাঁর মত লোক বর্ত্তমান থাকতে যদি এমন গ্রামনাশা বিবাদ বেধে ওঠে, তবে তার চেয়ে আর আক্ষেপের বিষয় কিছু হতে পারে না।

রায় শুধু বলিলেন, হুঁ।

মজুমদার আবার বলিল আমাদের বড়বাবু—মহীন্দ্রবাবু একটু তেজীয়ান; অল্প বয়স তো! তিনি অবশ্য বলছিলেন, মামলা-মকদ্দমাই হোক; যার ন্যায্য হবে, সে-ই পাবে চর। আমাকেও বললেন, সাঁওতালদের কারও ডাকে যেতে নিষেধ করতে। কিন্তু গিন্নী-ঠাকরুণ বললেন, তাই কখনও হতে পারে? আর আমাদের অহীন্দ্রবাবু তো অন্য প্রকৃতির ছেলে, তিনি বললেন, তা হতে পারে না দাদা, আমি মামাকে ব'লে তাদের ছুটি ক'রে দিয়েছি। কড়ার করে ছুটি ক'রে দিয়েছি, তিনি ডাকলেই ওদের যেতে হবে। আমি নিজে ওদের ওখানে হাজির ক'রে দেব। তিনি নিজেই আসতেন, তা আজ স্কুল খুলবে, ভোরেই চ'লে গেলেন শহরে।

রায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া উঠিলেন, এই ছেলেটি তাঁহার কাছে যেন একটি জটিল রহস্যের মত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সমস্ত সকালটাই তিনি ওই ছেলেটির সম্পর্কে ভাবিয়াছেন, অদ্ভুত কূট-বুদ্ধি ছেলেটির। সেদিন মশালের আলো জ্বালাইয়া সে যখন যায়, তখনও তিনি সেই কথাই ভাবিতেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই ছেলেটি তাঁহাকে লজ্জিত করিয়া সহাস্যমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

মজুমদার বলিল, আপনার মত ব্যক্তিকে আমার বেশি বলাটা তো ধৃষ্টতা। গ্রাম জুড়ে বিবাদ হ'লে তো মঙ্গল কারু হবে না। এদিকে কাগজপত্র, কার কি স্বত্ব, এখানকার সমস্ত হাল-হদিস আপনার নখদর্পণে, আপনিই এর বিচার ক'রে দিন।

রায় বলিলেন, রামেশ্বরের ছোট ছেলেটি সত্যিই বড় ভাল ছেলে। ক্ষুরের ধারের মত স্বচ্ছন্দে কেটে চলে, কোথাও ঠেকে যায় না। ছেলেটি ওদের বংশের মতও নয় ঠিক, চক্রবর্ত্তী-বংশের চুল কটা, চোখ কটা, কিন্তু গায়ের রংটা তামাটে। এ ছেলেটি বোধ হয় মায়ের রং পেয়েছে, না হে?

মজুমদার বলিল, হ্যাঁ, গিন্নী-ঠাকরুণ আমাদের রূপবতী ছিলেন এক কালে, আর প্রকৃতিতেও বড় মধুর। ছেলেটি মায়ের মতই বটে, তবে আমাদের কর্ত্তাবাবুর বাপের রং ছিল এমনি গৌরবর্ণ!

হ্যাঁ, সাঁওতালেরা সেইজন্তেই তাঁর নাম দিয়েছিল—রাঙাঠাকুর। একেও নাকি সাঁওতালেরা নাম দিয়েছে—রাঙাবাবু?

মাঝির দল এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবার সর্দ্দার কমল মাঝি বলিল, হুঁ, আমি দিলম সি নামটি। রাঙাঠাকুরের লাতি, তেমুনি আগুনের পারা গায়ের রং—তাথেই আমি বললম, রাঙাবাবু।

রায় গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিলেন, সাঁওতালের কথার উত্তর তিনি দিলেন না। সুযোগ পাইয়া মজুমদার আবার বর্ত্তমান প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিল, তা হ'লে সেই কথাই হ'ল। গ্রামের সকল শরিককে ডেকে চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে এর মীমাংসা হয়ে যাক। চর যাঁর হবে তিনিই খাজনা নেবেন ওদের কাছে। ওরা এখন যাক্। গরীব দুঃখী লোক, যতক্ষণ খাটবে ততক্ষণ ওদের অন্ন।—বলিয়া রায় কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মজুমদার মাঝিদের বলিয়া দিল, যা, তাই তোরা এখন বাড়ী গিয়ে আপন আপন কাজকর্ম্ম করগে। আমরা সব নিজেরা ঠিক করি কে খাজনা পাবে, তাকেই তোরা কবুলতি দিবি, খাজনা দিবি।

মাঝির দল প্রণাম করিয়া তাহাদের নিজস্ব ভাষায় বোধ করি এই প্রসঙ্গ লইয়াই কলকল করিতে করিতে চলিয়া গেল। রায় গম্ভীর মুখেই একই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেমন বসিয়া ছিলেন বসিয়া রহিলেন। সাঁওতালের দল বাহির হইয়া গেলে তিনি বলিলেন, সেই ভাল মজুমদার, ও বেচারাদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি, যাক ওরা। আগে এই বিবাদের মীমাংসাই হয়ে যাক।

আজ্ঞে হ্যাঁ, একদিন গ্রামের সমস্ত শরিককে ডেকে—

বাধা দিয়া রায় বলিলেন, শরিকরা তো তৃতীয় পক্ষ, সর্ব্বাগ্রে হোক ছোট তরফ আর চক্রবর্ত্তীদের মধ্যে।

বেশ, তাই হোক। একদিন প্রমাণ-প্রয়োগ দেখুন, তাতে যা ব'লে দেবেন, তাই হবে।

না। একদিন প্রমাণী লাঠি প্রয়োগ ক'রে, তাতে শক্তিতে যার হবে, সেই নেবে চর। তারপর মামলা-মকদ্দমা পরের কথা।

হাতজোড় করিয়া মজুমদার বলিল, না না বাবু, এ কথা কি আপনার মুখে সাজে? আপনি হলেন ও-বাড়ীর মুরব্বী; ছেলেদের—

বাধা দিয়া রায় বলিলেন, ও কথা ব'লো না মজুমদার। বার বার আমার অপমান তুমি ক'রো না। ও-কথা মনে পড়লে আমার বুকের ভেতর আগুন জ্বলে ওঠে।

মজুমদার স্তব্ধ হইয়া গেল; কিছুক্ষণ পর আবার সবিনয়ে বলিল, আপনি বিজ্ঞ বিবেচক ব্যক্তি, বড়লোক; আপনাদের চাকর ব'লেই সাহস ক'রে বলছি, এ আগুন কি জ্বেলে রাখা ভাল বাবু?

অস্থির হইয়া বার বার ঘাড় নাড়িয়া রায় বলিলেন, রাবণের চিতা মজুমদার, ও নিববে না, নেববার নয়।

মজুমদার আর কথা বাড়াইল না, তাহার চিত্তও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আপন প্রভুবংশের মানমর্য্যাদা আর সে খাটো করিতে পারিল না, সবিনয়ে হেঁট হইয়া রায়কে প্রণাম করিয়া এবার বলিল, আজ্ঞে, বেশ। আপনি যেমন আদেশ করলেন, তেমনি হবে।

রায় বলিলেন, ব'স। বেলা অনেক হয়েছে, একটু শরবৎ খেয়ে যাও। না খেলে আমি দুঃখ পাব মজুমদার।

মজুমদার আবার আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, আজ্ঞে, এ তো আমার চেয়ে খাবার ঘর।

মজুমদার চলিয়া গেল। রায় গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেলেন।

কুক্ষণে অহীন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাধারাণীর সুপ্ত স্মৃতি সুপ্তি ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চক্রবর্ত্তীদের উপর দারুণ আক্রোশে ও ক্রোধে তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছেন। রামেশ্বরের মস্তিষ্কবিকৃতি এবং দৃষ্টি রুগ্ন হওয়ার পর তিনি শান্ত হইয়াছিলেন। আবার এই চর উপলক্ষ্য করিয়া অহীন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে আক্রোশ আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। রাধারাণীর সপত্নীপুত্রের জন্য তিনি পথ ছাড়িয়া দিবেন? আজ এই ছেলেটি যদি রাধারাণীর হইত, তবে অমনি দ্বন্দ্বের অভিনয় করিয়া তিনি গোপনে হাসিতে হাসিতে পরাজয় স্বীকার করিয়া ঘরে ঢুকিতেন। লোকে বলিত ইন্দ্র রায় ভাগিনেয়ের কাছে পরাজিত হইল। এ ক্ষেত্রে পরাজয়ে রাধারাণীর গৃহত্যাগের লজ্জা দ্বিগুণিত হইয়া লোক-সমাজে তাঁহার মাথাটা ধুলায় লুটাইয়া দিবে। আর তাঁহার সরিয়া দাঁড়ানোর অর্থই হইল রাধারাণীর সপত্নীপুত্রের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দেওয়া।

অচিন্ত্যবাবু রায়-বাড়ীর ভিতর হইতেই বাহির হইয়া আসিলেন। রায়ের দশ বৎসরের কন্যা উমাকে তিনি পড়াইয়া থাকেন। উমাকে পড়াইয়া কাছারিতে আসিয়া রায়ের সম্মুখে তক্তাপোশটার উপর বসিয়া বলিলেন, চমৎকার একটা প্ল্যান ক'রে ফেলেছি রায় মশায়। দেশী গাছ-গাছড়া সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। চরটার ওপর নাকি হরেক রকমের গাছগাছড়া আছে। যা শুনলাম, তাতে শতকরা দু'শ লাভ। দেখবেন নাকি হিসেবটা?

থাক এখন।

আচ্ছা, থাক। আর ভাবছি, পাঁচ রকম মিশিয়ে অম্বলের ওষুধ একটা বের করব। বাংলাদেশে এখন অম্বলটাই, মানে ডিস্‌পেপসিয়াটাই হ'ল প্রধান রোগ।

রায় ও-কথা গ্রাহ্যই করিলেন না, তিনি ডাকিলেন নায়েবকে, মিত্তির! একবার ননীচোরা পালকে তলব দাও তো, বল জরুরি দরকার। আর—আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি ভেতরে। রায় উঠিয়া কাছারি-ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। নায়েবকে বলিলেন, দু'খানা ডেমিতে একটা বন্দোবস্তির পাট্টাকবুলতি ক'রে ফেল। আমরা ননী পালকে কুড়ি বিঘে চর বন্দোবস্ত করছি। ননী আমাদের বরাবর কবুলতি দিচ্ছে।

নায়েব বলিল, যে আজ্ঞে।

ননী পাল একজন সর্ব্বস্বান্ত চাষী। দাঙ্গা-হাঙ্গামায়, ফৌজদারি মকদ্দমায় তাহার যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে, জেলও সে কয়েক বার খাটিয়াছে। এখন করে পানবিড়ি-মুড়ি-মুড়কির দোকান। লোকে বলে, চোরাই মালও নাকি সে সামলাইয়া থাকে, বিশেষ করিয়া চোরাই ধান। একবার দারোগার নাকে কিল মারিয়া সে তাহার নাকটা ভাঙিয়া দিয়াছিল, একবার দুই আনা ধারের জন্য রায়েদেরই ফুলবাড়ীর একটি ছেলের সহিত বচসা করিয়া তাহার কান দুইটা মলিয়া দিয়া বলিয়াছিল, এতেই আমার দু'আনা শোধ হ'ল। এমনি প্রকৃতির লোক ননীচোরা পাল। রায় কণ্টক দিয়া কণ্টক তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন; বিশ বিঘা জমির জন্য তাঁহাকে জমিদার স্বীকার করিয়া চক্রবর্ত্তীদের সহিত বিবাদ করিতে ননী বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না।

এই লইয়া আরও দুই-চারিটা কথা বলিয়া রায় বাহিরে আসিলেন। অচিন্ত্যবাবু তখন কাছারি-বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, রায় বলিলেন, চললেন যে?

অচিন্ত্যবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, হ্যাঁ।

রায় হাসিয়া বলিলেন, বসুন বসুন, আপনার প্ল্যানটা শোনা যাক

আজ্ঞে না, দুর্জ্জন আসবার আগেই স্থান ত্যাগ করাই ভাল। ননী পালটা বড় সাংঘাতিক লোক। ব্যাটা হঠাৎ মেরে বসে।

পাগল নাকি আপনি? দেখেছেন, দেওয়ালের গায়ে কখানা তলোয়ার ঝুলছে?

শিঠরিয়া উঠিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, খুলে ফেলুন, ওগুলো বড় সাংঘাতিক জিনিস। বাঙালীর হাতে অস্ত্র, গভর্মেণ্ট অনেক বুঝেই আইন ক'রে কেড়ে নিয়েছে। ওগুলোর লাইসেন্স আছে তো আপনার?

বলিতে বলিতেই তিনি বাহির হইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই কন্যা উমা আপন মনেই হারাধনের দশটি ছেলের ছড়া বলিতে বলিতে আসিয়া ওই ছড়ার সুরেই বলিল, বাবা আপনাকে মা ডাকছেন, বেলা অনেক হয়েছে, স্নান করুন।—বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। আবার হাসি থামাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, কানে কানে একটা কথা বলি বাবা।

উমা মেয়েটি একটু তরঙ্গময়ী। রায় তাহার মুখের কাছে কান পাতিয়া দিলেন, সে ফিসফিস করিয়া বলিল, প—অন্তস্থ য়—দন্ত্য সা আকার।

হাসিয়া রায় বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা হচ্ছে। তুমি বাড়ীর মধ্যে চল, আমার যেতে একটু দেরি হবে, তোমার মাকে বল গিয়ে।

উমা প্রশ্ন করিল, কয়ে একার দন্ত্য ন?

কাজ আছে মা।

না, চলুন আপনি।

ছি! ও রকম করে না, কাজ আছে শুনছ না? ওই দেখ লোক এসেছে কাজের জন্যে।

ননী পাল আসিয়া একটি সংক্ষিপ্ত প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

বেঁটেখাটো লোকটি, কাঠের মত শক্ত শরীর, চওড়া কপালের নীচেই নাকের উপর একটি অদ্ভুত খাঁজ; ওই খাঁজটা একটা নিষ্ঠুর হিংস্র মনোভাব তাহার মুখের উপর ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

গ্রামে কিন্তু ততক্ষণে ননীপালকে জমি-বন্দোবস্তের সংবাদ রটিয়া গিয়াছে। অচিন্ত্যবাবু গাছ-গাছড়ার ব্যবসার কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছেন।—সর্ব্বনাশ, চরের উপর ব্যাটা কোন্ দিন খুন ক'রেই দেবে আমাকে!

*　　*　　*

হেমাঙ্গিনী স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া ছিলেন। কাজ শেষ করিয়া স্নান সারিয়া রায় যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন দুপুর প্রায় গড়াইয়া গিয়াছে। স্বামীর পূজা-আহ্নিকের আসনের পাশে বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া হেমাঙ্গিনী কি যেন ভাবিতেছিলেন। রায়কে দেখিয়া বলিলেন, এত বেলা কি ক'রে? খাবে আর কখন?

রায় পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্যই অকারণে একটু হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, দেরি একটু হয়ে গেল। জরুরি কাজ ছিল একটা।

বেশ, স্নান-আহ্নিক সেরে নাও দেখি আগে। এখনও পর্য্যন্ত বাড়ীর কারও খাওয়া হয় নি। উমাই কেবল খেয়েছে।

স্নান সারিয়া রায় আহ্নিকে বসিলেন। তারা, তারা মা!

আহারাদির পর রায় শয্যায় শুইয়া গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিতেছিলেন। সমস্ত বাড়ীটা একরূপ নিস্তব্ধ হইয়াছে। বাহিরে চৈত্রের রৌদ্র তরুণ বহ্ন্যুত্তাপের মত অসহ্য না হইলেও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, পাখীরা এখন হইতেই এ সময়ে ঘনপল্লব গাছের মধ্যে বিশ্রাম শুরু করিয়া দিয়াছে। বাড়ীর বারান্দার মাথায় ঘুলঘুলিতে বসিয়া পায়রাগুলি গুঞ্জন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে রুদ্ধদ্বার জানালার খড়খড়ি দিয়া উত্তপ্ত এক এক দমকা বাতাস আসিতেছে; উত্তপ্ত বাতাসের মধ্যে

বয়ড়া ও মহুয়া ফুলের উগ্রমাদক-গন্ধ। ঝর ঝর সরসর শব্দে বাহিরে বাতাসে ঝরা পাতা উড়িয়া চলিয়াছে। সূর্য্য আর পবন দেবতার খেলা চলিতেছে বাহিরে। দুইটি কিশোরের মিতালীর লীলা।

হেমাঙ্গিনী ভাঁড়ারে ও লক্ষ্মীর ঘরে চাবি দিয়া আসিয়া স্বামীর শয্যার পার্শ্বে বসিলেন! রায় প্রশ্ন করিলেন, সারা হ'ল সব?

হ'ল।

খুব ক্ষিদে পেয়েছিল তোমার, না?

হ্যাঁ, খুব। মনে হচ্ছিল, বাড়ীর ইট-কাট ছাড়িয়ে খাই—হ'ল তো? রায় হাসিয়া বলিলেন, রাগটুকু আছে খুব!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, দেখ, একটা কথা বলছিলাম।

বল।

বলছিলাম, আর কেন?

রায় ওইটুকুতেই সব বুঝিলেন, তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন, কোন উত্তর দিলেন না। রামেশ্বরের প্রতি হেমাঙ্গিনীর স্নেহের কথা তিনি জানেন। সে স্নেহ হেমাঙ্গিনী আজও ভুলিতে পারেন নাই।

হেমাঙ্গিনী একটু অপ্রতিভের মতই বলিলেন, মুখ ফিরিয়ে শুলে যে? ভাল, ও-কথা আর বলব না। এখন আর একটা কথা বলি, শোন। এটা আমার না বললেই নয়।

না ফিরিয়াই রায় বলিলেন, বল।

দৃঢ়তার সহিত হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বিবাদ করবে, কর, কিন্তু অন্যায় অধর্ম্ম তুমি করতে পাবে না। আমার অনেকগুলি সন্তান গিয়ে অবশিষ্ট অমল আর উমা; ওদের অমঙ্গল আমি হতে দিতে পারব না।

রায় এবার সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কয়েকটি সন্তানই শৈশব অতিক্রম করিয়া বালক হইয়া মারা গিয়াছে। তাহাদের

অকাল-মৃত্যুর হেতু বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া হেমাঙ্গিনী যখন তাঁহার পাপপুণ্যের হিসাব করিতে বসেন, তখন তাঁহার মাথাটা যেন মাটিতে ঠেকিয়া যায়।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বল, আমাকে ছুঁয়ে তুমি শপথ কর, কোন অন্যায় অধর্ম্ম তুমি করবে না।

রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কেন তুমি প্রতি কাজে ওই কথা স্মরণ করিয়ে দাও, বল তো?

রুদ্ধকণ্ঠে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, এতগুলো সন্তান যাওয়ার দুঃখ যে রাবণের চিতার মত আমার বুকে জ্বলছে। তুমি ভুলেছ, কিন্তু আমি তো ভুলতে পারি না। তাই তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হয়।

রায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, জানালাটা খুলে দাও দেখি। বেলা বোধ হয় প'ড়ে এল। হেমাঙ্গিনী জানালা খুলিয়া দিলেন, রোদ অনেকটা পড়িয়া আসিয়াছে, পাখীরা থাকিয়া থাকিয়া সমবেত স্বরে ডাকিয়া উঠিতেছে, বিশ্রাম তাহাদের শেষ হইয়া গেল—এ ইঙ্গিত তাহারই। রায় জানালা দিয়ে নদীর ও-পারে ওই চরটার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন ওই কথাই। অমল-উমা, রাধারাণী-রামেশ্বর, রায়-বাড়ী। এ কি দ্বিধার মধ্যে তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া নিক্ষেপ করিল হেমাঙ্গিনী?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বল।

রায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই হবে। তিনি স্থির করিলেন, অপরাহ্ণেই ননীকে ডাকাইয়া পাট্টা-কবুলতি স্বহস্তে নাকচ করিয়া দিবেন।

হেমাঙ্গিনী চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেলেন, বোধ করি, আবেগ তাঁর ধৈর্য্যের কূল ছাপাইয়া উঠিতে চাহিতেছিল। রায় নীরবে ওই চরের দিকে চাহিয়াই বসিয়া রহিলেন। মনটা কেমন

উদাস হইয়া গিয়াছে। দীপ্ত সূর্য্যালোকে কালীর বালি ঝিকমিক করিতেছে। চরের উপরে বেনাঘাস দমকা বাতাসে হাজার হাজার সাপের ফণার মত নাচিতেছে। আকাশ ধূসর। এত বড় প্রান্তরের মধ্যে কোথাও একটা মানুষ দেখা যায় না। অথচ মাটি লইয়া মনুষের কাড়াকাড়ি সেই সৃষ্টির আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কোন কালেও বোধ করি এ কাড়াকাড়ির শেষ হইবে না। নাঃ, ভাল বলিয়াছে হেমাঙ্গিনী ; কাজ নাই ; রায়হাটের সঙ্গে রায়-বাড়ী না হয় কালীর গর্ভেই যাইবে। ক্ষতি কি ?

হেমাঙ্গিনী ফিরিয়া আসিলেন, অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে বলিলেন, অমলকে টাকা পাঠিয়েছ ?

অমল মামার বাড়ীতে থাকিয়া পড়ে। রায় অন্যমনস্কভাবেই বলিলেন, পাঠিয়েছি।

দেখ।

বল।

এ-দিকে ফিরেই চাও। দোষ তো কিছু করি নি আমি।

অল্প একটু হাস্যের সহিত মুখ ফিরাইয়া রায় বলিলেন, না, তুমি ভালই বলেছ। আর কি হুকুম, বল ?

উমাকে আমি দাদার ওখানে পাঠিয়ে দেব। শহরে থেকে একটু লেখাপড়া শিখবে, একটু সহবৎ শিখবে। জামাই আমি ভাল করব। এখানে থাকলে গেঁয়ো মেয়ের মত ঝগড়া শিখবে, আর যত রাজ্যের পাকামো।

রায় বলিলেন, হ্যাঁ, রায়-বাড়ীর মেয়ের অখ্যাতিটা আছে বটে। তাঁহার মুখে এক বিচিত্র করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল সেদিনের কথা, রামেশ্বরের পিতামহী বলিয়াছিলেন রাধারাণীর প্রসঙ্গে, রায়-বাড়ীর মেয়ের ধারাই ওই, চিরকেলে জাঁহাবাজ।

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, স্বামী কথাটায় আহত হইয়াছেন, তিনি অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাকুল হইয়া দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, রাগ করলে?

পত্নীর কণ্ঠে সাদরে একখানি হাত ন্যস্ত করিয়া রায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, না না, তুমি সত্যি কথা বলেছ।

প্রৌঢ়-দম্পতির উভয়েরই চোখে অনুরাগভরা দৃষ্টি। কিন্তু সহসা চমকাইয়া উঠিয়া দুইজনেই পরস্পরকে ছাড়িয়া দিলেন। এ কি, এত গোলমাল কিসের? গ্রামের মধ্যে কোথাও একটা প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে! কোথাও আগুন লাগিল নাকি? রায় বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া ব্যস্ত হইয়া কাপড় ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কর্ত্তাবাবু!—নীচে কে ডাকিল, নায়েব মিত্র বলিয়াই মনে হইতেছে।

কে? মিত্তির?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

গোলমাল কিসের মিত্তির?

আজ্ঞে, রামেশ্বরবাবুর বড়ছেলে মহীন্দ্রবাবু ননী পালকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছেন।

রায় কাপড় পরিতেছিলেন, সহসা তাঁহার হাত স্তব্ধ হইয়া গেল, তিনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিলেন। হেমাঙ্গিনীর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, তিনি বলিলেন, তুমি করলে কি? ছি ছি!

রায় দ্রুতপদে নামিয়া গেলেন।

৭

মহীন্দ্র যোগেশ মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া, পূর্ব্বদিন রাত্রেই আসিয়া পৌছিয়াছিল। বার্ত্তা নাকি বায়ুর আগে পৌছিয়া থাকে—এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও মিথ্যা বলিয়া একেবারেই অস্বীকার করা চলে না। পঞ্চাশ মাইল দূরে বহির্জগতের সহিত ঘনিষ্ঠসম্পর্কহীন একখানি পল্লীগ্রামেও কেমন করিয়া কথাটা গিয়া পৌছিল, তাহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। সুনীতির পত্রও তখন গিয়া পৌছে নাই। সরীসৃপ-সঙ্কুল জঙ্গলে পরিপূর্ণ চরটায় নাকি সাঁওতালরা আসিয়া সব সাফ করিয়া ফেলিয়াছে, আশেপাশের চাষীরা নাকি চরের মাটি দেখিয়া বন্দোবস্ত লইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি শহর-বাজার হইতে সঙ্গতিপন্ন লোকেও চরের জমি বন্দোবস্ত পাইবার জন্য প্রচুর সেলামি দিতে চাহিতেছে—এমনিধারা স্ফীতকলেবর অনেক সংবাদ। শেষ এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সংবাদ—চর দখল করিবার জন্য রায়বংশীয়েরা কৌরবের মত একাদশ অক্ষৌহিণী সমাবেশের আয়োজন করিতেছে; চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কাহাকেও নাকি ও-চরের মাটিতে পদার্পণ করিবার পর্য্যন্ত অধিকার দেওয়া হইবে না।

উত্তেজনায় মহীন্দ্র উৎসাহিত হইয়া উঠিল। ওই ধরণের উত্তেজনায় মহীন্দ্রের যেন একটা অধীরতা জাগিয়া উঠে। সে মজুমদারকে বলিল, থাক এখানকার কাজ এখন। চলুন আজই বাড়ী যাব।

মজুমদার বলিল, সেখান থেকে একটা সংবাদই আসুক, সেখানে যখন মা রয়েছেন—

মহীন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, মা কখনও সংবাদ দেবেন না, তিনি এসব বোঝেনই না, তা ছাড়া তাঁর একটা ভয়ঙ্কর ভয়—বিবাদ হবে।

চরে একবার খানকয়েক লাঙল ফেরাতে পারলেই আমাদের কঠিন মামলায় পড়তে হবে। তখন সেই টাইটেল স্যুটে যেতে হবে।

মজুমদার আর আপত্তি করিতে পারিল না, সেই দিনই তাহারা রওনা হইয়া প্রায় শেষরাত্রে বাড়ী আসিয়া পৌছিল। অহীন্দ্র এবং সুনীতির কাছে চরের বৃত্তান্ত শুনিয়া মহীন্দ্র খুশি হইয়া উঠিল। মজুমদার হাসিয়া বলিল, তবে তো ও আমাদের হয়েই গিয়েছে; সাঁওতালরা যখন রাঙাবাবুকে ছাড়া খাজনা দেবে না বলেছে, তখন তো দখল হয়েই গেল। চরটার নাম দিতে হবে কিন্তু রাঙাবাবুর চর, সেরেস্তাতে আমরা ওই বলেই পত্তন করব।

মহীন্দ্র বলিল, না, ঠাকুরদাদার নামেই হোক—রাঙাঠাকুরের চর। আর কাল সকালেই চাপরাসী নিয়ে যান ওখানে, বলে দিন সাঁওতালদের, কেউ যেন রায়েদের ডাকে না যায়। যে যাবে তার জরিমানা হবে, তাতে রায়েরা জোর করে, আমরা তার প্রতিকার করব।

অহীন্দ্র এবার বলিল, না, সে হবে না দাদা। মহীন্দ্রকে সে ভয় করে, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

মহীন্দ্র রুক্ষদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কেন?

আমি ও-বাড়ীর মামার কাছে কথা দিয়ে এসেছি···

ও-বাড়ীর মামা? কে ও-বাড়ীর মামা? ইন্দ্র রায় বুঝি? সম্বন্ধটা পাতিয়ে দিয়েছেন বুঝি মা? বাঃ চমৎকার!

সুনীতি অহীন্দ্র দুজনেই নীরব হইয়া এ তিরস্কার সহ্য করিলেন। মহীন্দ্র আবার বলিল, তারপর—কথাই বা কিসের? আমাদের ন্যায্য সম্পত্তি, তিনি আমার অনুপস্থিতিতে সাঁওতালদের হুমকি দিয়ে দখল ক'রে নেবেন, আর তুমি একটা দুগ্ধপোষ্য বালক, তুমি না জেনে কথা দিয়েছ, সে কথা আমায় মানতে হবে?

অহীন্দ্র আবার সবিনয়ে বলিল, ওঁরাও তো বলেছেন, চর আমাদের।

ওঁরা যদি কাল এসে বলেন, এই বাড়ীখানা আমাদের—

অহীন্দ্র এ কথার জবাব দিতে পারিল না। সুনীতি অন্তরে অন্তরে অহীন্দ্রকে সমর্থন করিলেও মুখ ফুটিয়া মহীন্দ্রের কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। মজুমদার কৌশলী ব্যক্তি, সে অহীন্দ্রর মুখ দেখিয়া সুকৌশলে একটা মীমাংসা করিয়া দিল, বলিল, বেশ তো গো, অহিবাবু যখন কথাই দিয়েছেন, তখন কথা আমরা রাখব। ছোট রায় মহাশয় তলব পাঠালে আমি নিজে সাঁওতালদের নিয়ে যাব। দেখিই না, তিনি কি করতে পারেন।

মহীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল ; কথাটা সুসঙ্গত এবং যুক্তির দিক দিয়াও সুযুক্তিপূর্ণ, তবু তাহার মন ইহাতে ভাল করিয়া সায় দিল না।

মজুমদার বলিল, তা ছাড়া মুখোমুখি কথা ক'য়েই দেখি না, কোন্ মুখে চরটা তিনি আপনার ব'লে 'কেলেম' (claim) করেন।

সুনীতি বলিলেন, এটা খুবই ভাল কথা মহীন, এতে আর তুমি আপত্তি ক'রো না।

মহীন্দ্র এবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিল, তাই হবে। কিন্তু অহি কালই চ'লে যাক স্কুলে, ওর এ-ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। আর একটা কথা, ও-রকম ধারার সম্বন্ধ পাতাবার চেষ্টা যেন আর করা না হয় ; তিন পুরুষ ধ'রে ওঁরা আমাদের শত্রুতা ক'রে আসছেন।

তাহাই হইল, অহীন্দ্র ভোরে উঠিয়া স্কুলে চলিয়া গেল। সকালেই মজুমদার সাঁওতালদের সঙ্গে লইয়া ইন্দ্র রায়ের কাছারিতে উপস্থিত হইল ; এবং শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্র রায়ের দ্বন্দ্বঘোষণা মর্য্যাদার সহিত গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মজুমদারের মুখে সমস্ত শুনিয়া মহীন্দ্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিল, খুব ভাল ব'লে এসেছেন। মায়ের যেমন, তিনি ভাবেন, দুনিয়াভোর মানুষের অন্তর বুঝি তাঁর মতন। ব'লে আসুন তাঁকে, তাঁর ও-বাড়ীর দাদার কথাটা ব'লে আসুন।

মজুমদার বলিল, না না মহীবাবু, ও-কথা মাকে ব'লো না; তিনি আপনাদের ভালর জন্যই বলেন, আর ঝগড়া-বিবাদে তাঁর ভয়ও হয় তো।

মহীন্দ্র বলিল, সেটা ঠিক কথা। ভয়টা তাঁর খুবই বেশী, জমিদারি ব্যাপারটাই হ'ল ওঁর ভয়ের কথা, ওঁর বাপেদের তিন পুরুষ হলো চাকরে।

মজুমদার এ-প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াইল না। মহীন্দ্রকে সে ভাল করিয়াই জানে। প্রসঙ্গটা পরিবর্ত্তন করিয়া সে বলিল, বাবুর সঙ্গে একবার পরামর্শ দরকার।

এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহীন্দ্র বলিল, আজ সকালে আমি তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম, তাঁকে দেখে আমার বুক ফেটে গেল মজুমদার-কাকা, তিনি বোধ হয় সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছেন।

মজুমদার স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, মহীন্দ্রও নীরব। এই স্তব্ধ অবসরের মধ্যে কলরব করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এক দল সাঁওতালদের ছেলেমেয়ে। হাতে তীর ও ধনুক, একজনের ধনুকের প্রান্তে দুইটা সদ্যনিহত ছোট জন্তু ঝুলিতেছিল। এখনও জন্তু দুইটার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছে। ছেলেদের পিছনে কয়টি তরুণী মেয়ে; মেয়েদের মধ্যে কমল মাঝির নাতনী, সেই দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটি ছিল সকলের আগে। সমগ্র দলটি মহীন্দ্র ও মজুমদারকে দেখিয়া অকস্মাৎ যেন স্তব্ধ হইয়া গেল।

মজুমদার ও মহীন্দ্র একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ইহাদের আকস্মিক আগমনে তাহাদের মনে হইল, ইন্দ্র রায় আবার কোনও গোলমাল

বাধাইয়া তুলিয়াছেন। মহীন্দ্র মজুমদারকেই প্রশ্ন করিল, আবার কি হ'ল ? রায়েরা আবার কোনও গোলমাল বাধিয়েছে নিশ্চয়।

মজুমদার প্রশ্ন করিল সমগ্র দলটিকে লক্ষ্য করিয়া, কি রে, কি বলছিস তোরা ?

সমগ্র দলটি আপনাদের ভাষায় আপনাদেরই মধ্যে কি বলিয়া উঠিল। মজুমদার আবার বলিল, কি বলছিস, বাঙালী কথায় বল্ কেনে?

দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটি বলিল, বুলছি, আমাদের বাবুটি কুথা গো?

হাসিয়া মজুমদার বলিল, এই যে বড়বাবু রয়েছেন। বল্ না, কি বল্‌ছিলি ?

উ কেনে হবে গো ? সি আমাদের রাঙাবাবু, সি বাবুটি কুথা গো ?

তিনি পড়তে চ'লে গেছেন স্কুলে, সেই শহরে। ইনি হলেন বড়বাবু, ইনি হলেন মালিক—মরংবাবু।

কেনে, তা কেনে হবে ?

মজুমদার হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা একগুঁয়ে বোকা জাত! যা ধরবে, তা আর ছাড়বে না। তা কেনে হবে? তাই হয় রে, তাই হয়। ইনি বড় ভাই, তিনি ছোট ভাই। বুঝলি ?

হুঁ, সিটি তো আমরা দেখছি। ইটিও সেই তেমুনি, সিটির পারা বটে। তা সিটিই তো আমাদের রাঙাবাবু। উয়ার লেগে আমরা সুসুরে মেরে এনেছি।

মহীন্দ্র উৎসাহিত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, সুসুরে—খরগোশ! কই, দেখি দেখি ?

তাহারা এবার খরগোশ দুইটা আনিয়া কাছারির বারান্দায় নামাইয়া দিল। ধূসর রঙের বন্য খরগোস—সাধারণ পোষা খরগোস হইতে আকারে অনেকটা বড়। মহীন্দ্র বলিল, বাঃ, এ যে অনেক বড়, এদের রঙটাও মাটির মত। এ পেলি কোথায় তোরা ? সেই

মেয়েটি বলিল, কেনে, আমাদের ওই নদীর চরে, মেলাই আছে। শিয়াল আছে, খটাস খেঁকশিয়াল আছে, সুসুরে আছে, তিতির আছে, আমরা মারি পুড়িয়ে খাই।

মহীন্দ্র আরও বেশী উৎসাহিত হইয়া উঠিল, শিকারে তাহার প্রবল আসক্তি, নেশা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে বলিল, তা হ'লে চলুন মজুমদার কাকা, আজ বিকেলে যাব শিকার করতে; চরটাও দেখা হবে, শিকারও হবে, কি বলেন ?

বেশ তো।

মেয়েটি বলিল, তু যাবি ? বন্দুক নিয়ে যাবি ? মারতে পারবি ? খুঁজে বার করতে পারবি ?

হাসিয়া মহীন্দ্র বলিল; আচ্ছা, সে তখন দেখবি তোরা। যা তোরা, সর্দ্দার-মাঝিকে বলবি, আমরা বিকেলে যাব।

সে আমাদের রাঙাবাবুটি ? তাকে নিয়ে যাবি না ?

সে যে নেই এখানে।

কেনে, সে আসবে না কেনে ? তুরা তাকে নিয়ে যাবি না কেনে ?

মজুমদার হাসিয়া ফেলিলেন, কি আপদ !

কেনে, কি করলাম আমরা ? উ কেনে বলছিস তু ?

আচ্ছা আচ্ছা, বাবু এলে তাকে নিয়ে যাব। তোরা যা এখন।

এবার তাহারা আশ্বাস পাইয়া সোৎসাহে আপন ভাষায় কলরব করিয়া উঠিল। মেয়েটিই দলের নেত্রী, সে বলিয়া উঠিল, দেলা—দেলা বোঁ! অর্থাৎ—চল্ চল্ চল্।

মহীন্দ্র কাছারি-ঘরে ঢুকিয়া বন্দুকটা বাহির করিয়া আনিল। নলের মুখটা ভাঁজিয়া ভিতর দেখিয়া বলিল, বড্ড অপরিষ্কার হয়ে আছে। সে বন্দুকের বাক্সটা বাহির করিয়া আনিয়া বন্দুকের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

ইন্দ্র রায়ের এই কাজটি অচিন্ত্যবাবুর মনঃপূত হয় নাই ; তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তিনি গাছ-গাছড়া চালানের লাভ-ক্ষতি কষিয়া রায়কে বুঝাইয়াছেন, রায়ও আপত্তি করেন নাই, বরং উৎসাহই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই লাভকে উপেক্ষা করিয়া অকস্মাৎ তিনি কেন যে চর বন্দোবস্ত করিলেন, তাহার কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

আর ননী পালের মত দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিকে বিনা পণে চর দিয়া প্রশ্রয় দেওয়ার হেতুও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ওই লোকটার জন্য সমগ্র চরটা দুর্গম হইয়া উঠিল, কে উহার সহিত ঝগড়া করিতে যাইবে ? তাহার সীমানা বাদ দিয়া চরে পদার্পণ করিলেও ননী বিবাদ করিবেই। সেই বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে করিতেই তিনি পথ দিয়া চলিয়াছেন।

হ'ল, বেশই হ'ল, উত্তম হ'ল, খুবই ভাল করলেন। ওখানে আর কেউ যাবে ? থাকল ওই সমস্ত জায়গা প'ড়ে। গেলেই, ও গোঁয়ার চপেটাঘাত না ক'রে ছাড়বে না। বাব্বাঃ, আমি আর যাই ! সর্ব্বনাশ ! কোন্‌দিন পাষণ্ড আমাকে একেবারে এক চড়ে খুনই ক'রে ফেলবে। এক মনেই বকিতে বকিতে তিনি চলিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তীবাবুদের কাছারির বারান্দায় মজুমদার হাসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, কি হ'ল অচিন্ত্যবাবু, হঠাৎ চ'টে উঠলেন কেন মশায় ?

হঠাৎ ? অচিন্ত্যবাবু যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, হঠাৎ ? বলেন কি মশায় ? আজ তিন দিন তিন রাত্রি ধ'রে, হিসেব ক'ষে লাভ-লোকসান দেখলাম, টু-হাণ্ড্রেড পার্‌সেণ্ট লাভ। কলকাতার সাত-আটটা ফার্মকে চিঠি লিখলাম সাত-আট আনা খরচ ক'রে ; আর আপনি বলেন হঠাৎ ?

মজুমদার বলিলেন, সে-সব আমরা কেমন ক'রে—

বাধা দিয়া অচিন্ত্য বলিলেন, ঠিক কথা, আমারই ভুল, কেমন ক'রে জানবেন আপনারা। তবে শুনুন, আপনাদের এই ইন্দ্র রায় মশায় একটা 'ডেঞ্জারাস গেমে' হাত দিয়েছেন। বাঘ নিয়ে খেলা, ননী পালও সাক্ষাৎ একটি ব্যাঘ্র।—বলিয়া সবিস্তারে সমস্ত ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে ক্ষোভে দুঃখে ভদ্রলোক কাঁদিয়া ফেলিলেন।—মশায়, তিনটি রাত্রি আমি ঘুমুই নি। দশ রকম ক'রে দশবার আমি লাভ-লোকসান ক'ষে দেখেছি। বেশ ছিলাম, বদহজম অনেকটা ক'মে এসেছিল, এই তিন রাত্রি জেগে আমার বদহজম আবার বেড়ে গেল।—কথা বলিতে বলিতেই যেন রোগটা তাঁহার বাড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গোটা কয়েক ঢেকুর তুলিয়া তিনি বলিলেন, ভাস্কর লবণ খানিক না খেলে এইবার গ্যাস হবে। যাই, তাই খানিকটে খাইগে। গ্যাসে হার্টফেল হওয়া বিচিত্র নয়। ভদ্রলোক উঠিয়া পড়িলেন এবং ক্রমাগত উদ্গার তুলিতে তুলিতে চলিয়া গেলেন।

মহীন্দ্র বন্দুক ফেলিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, চাপরাসীদের ব'লে দিন—ননী পাল রায়দের কাছারি থেকে বেরুলেই যেন তাকে ধ'রে নিয়ে আসে।

* * * *

মজুমদার খুব ভাল করিয়াই বলিলেন—আদেশের সুরে নয়, অনুরোধে জানাইয়াই বলিলেন, দেখ ননী, এ-কাজটা করা তোমার উচিত হবে না। এ আমাদের শরিকে শরিকে বিরোধ, এর মধ্যে তোমার যোগ দেওয়া কি ভাল?

ননী নখ দিয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, তা মশায়, ইয়ের ভালমন্দ কি? সম্পত্তি রাখতে গেলেও ঝগড়া, সম্পত্তি করতে গেলেও ঝগড়া, সে ভেবে, সম্পত্তি কে আর ছেড়ে দেয় বলুন?

মহীন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিল, দেখ ননী, ও সম্পত্তি হ'ল আমার, ওটা

ইন্দ্র রায়ের নয়। তোমাকে আমি বারণ করছি, তুমি এর মধ্যে এসো না।

মহীন্দ্রের স্বরগাম্ভীর্য্যে ননী রুক্ষ হইয়া উঠিল, সে বলিল, সম্পত্তি আপনার, তারই বা ঠিক কি?

আমি বলছি।

সেই রায় মশায়ও বলেছেন, সম্পত্তি তেনার।

তিনি মিথ্যা কথা বলছেন।

আর আপনি সত্যি বলছেন!—ব্যঙ্গভরে ননী বলিয়া উঠিল।

মহীন্দ্র বলিল, চক্রবর্ত্তী-বংশ তেমন নীচ নয়, তারা মিথ্যে কথা বলে না, বুঝলে?

ননী পাল প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, ইন্দ্র রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মহীন্দ্রকে অপমান করিবার সঙ্কল্প লইয়াই—ডাকিবামাত্র সে এখানে প্রবেশ করিয়াছিল। সে এবার বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ হাঁ সে-সব আমরা খুব জানি, চাকলাটার লোকই জানে; চক্রবর্ত্তী-গুষ্টির কথা আবার জানে না কে?

মহীন্দ্র রাগে আরক্তিম হইয়া বলিল, কি? কি বলছিস তুই?

মুখভঙ্গী করিয়া ননী বলিল, বলছি, তোমার সংমায়ের কথা হে বাপু, বলি, যার মা চ'লে যায়—

মুহূর্ত্তে একটা প্রলয় ঘটিয়া গেল। অসহনীয় ক্রোধে মহীন্দ্র আত্মহারা হইয়া অভ্যস্ত হাতের ক্ষিপ্রতার সহিত বন্দুকটা লইয়া টোটা পূরিয়া ঘোড়াটা টানিয়া দিল। ননী পালের মুখের কথা মুখেই থাকিয়া গেল, রক্তাপ্লুত দেহে মুখ গুঁজিয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বন্দুকের শব্দে, বারুদের গন্ধে, ধোঁয়ায়, রক্তে, সমস্ত কিছু লইয়া সে এক ভীষণ দৃশ্য! মজুমদার যেন নির্ব্বাক মূক হইয়া গেল, থরথর করিয়া সে কাঁপিতেছিল। মহীন্দ্রও নীরব, কিন্তু সে-ই প্রথমে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া

বন্দুকটা হাতে লইয়াই উঠিয়া বলিল, আমি চললাম কাকা থানায় সারেণ্ডার করতে।

মজুমদার একটা কিছু বলিবার চেষ্টায় বার কয়েক হাত তুলিল, কিন্তু মুখে ভাষা বাহির হইল না। মহীন্দ্র মায়ের সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করিল না; চৈত্রের উত্তপ্ত অপরাহ্ণে সে দৃঢ় পদক্ষেপেই ছয় মাইল দূরবর্ত্তী থানায় আসিয়া বলিল, আমি ননী পাল ব'লে একটা লোককে গুলি ক'রে মেরেছি।

৮

বজ্রের আঘাতের মত আকস্মিক নির্ম্মম আঘাতে সুনীতির বুকখানা ভাঙিয়া গেলেও তাঁহার কাঁদিবার উপায় ছিল না। সন্তানের বেদনায় আত্মহারা হইয়া লুটাইয়া পড়িবার শ্রেষ্ঠ স্থান হইল স্বামীর আশ্রয়। কিন্তু সেইখানেই সুনীতিকে জীবনের এই কঠিনতম দুঃখকে কঠোর সংযমে নিরুচ্ছ্বসিত স্তব্ধ করিয়া রাখিতে হইল। অপরাহ্ণে কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, সুনীতি সমস্ত অপরাহ্ণটাই মাটির উপর মুখ খুঁজিয়া মাটির প্রতিমার মত পড়িয়া রহিলেন, সন্ধ্যাতে তিনি গৃহলক্ষ্মীর সিংহাসনের সম্মুখে ধূপপ্রদীপ দিতে পর্য্যন্ত উঠিলেন না। সন্ধ্যার পরই কিন্তু তাঁহাকে উঠিয়া বসিতে হইল। মনে পড়িয়া গেল—তাঁহারই উপর একান্ত-নির্ভরশীল স্বামীর কথা। এখনও তিনি অন্ধকারে আছেন, দুপুরের পর হইতে এখনও পর্য্যন্ত তিনি অভুক্ত। যথাসম্ভব আপনাকে সংযত করিয়া সুনীতি রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। বন্ধ ঘরে গুমট গরম উঠিতেছিল, প্রদীপ জ্বালিয়া সুনীতি ঘরের জানালা খুলিয়া দিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিতে পারেন নাই, স্বামীর মুখ কল্পনামাত্রেই তাঁহার হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবার

উপক্রম করিতেছিল। এবার কঠিনভাবে মনকে বাঁধিয়া তিনি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন গভীর আতঙ্কে রামেশ্বরের চোখ দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে, নিস্পন্দ মাটির পুতুলের মত তিনি বসিয়া আছেন। সুনীতির চোখে চোখ পড়িতেই তিনি আতঙ্কিত চাপা কণ্ঠস্বরে বলিলেন, মহীনকে লুকিয়ে রেখেছ?

সুনীতি আর যেন আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। দাঁতের উপর দাঁতের পাটি সজোরে টিপিয়া ধরিয়া তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রামেশ্বর আবার বলিলেন, খুব অন্ধকার ঘরে, কেউ যেন দেখতে না পায়।

আবেগের উচ্ছ্বাসটা কোনমতে সম্বরণ করিয়া এবার সুনীতি বলিলেন, কেন মহী তো আমার অন্যায় কাজ কিছু করে নি, কেন সে লুকিয়ে থাকবে?

তুমি জান না, মহী খুন করেছে—খুন!

জানি।

তবে? পুলিসে ধরে নিয়ে যাবে যে!

সুনীতির বুকে ধীরে ধীরে বল ফিরিয়া আসিতেছিল, তিনি বলিলেন, মহী নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। সে তো আমার কোন অন্যায় কাজ করে নি, কেন সে চোরের মত আত্মগোপন ক'রে ফিরবে? সে তার মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে, সন্তানের যোগ্য কাজ করেছে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে সুনীতির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া রামেশ্বর বলিলেন, তুমি ঠিক বলেছ। মণিপুর-রাজনন্দিনীর অপমানে তার পুত্র বভ্রুবাহন পিতৃবধেও কুণ্ঠিত হয় নি। ঠিক বলেছ তুমি!

গাঢ়স্বরে সুনীতি বলিলেন, এই বিপদের মধ্যে তুমি একটু খাড়া হয়ে ওঠ, তুমি না দাঁড়ালে আমি কাকে আশ্রয় ক'রে চলাফেরা

করব? মহীর বিচারের মকদ্দমায় কে লড়বে? ওগো, মনকে একটু শক্ত কর, মনে কর, কিছুই তো হয় নি তোমার।

রামেশ্বর ধীরে ধীরে খাট হইতে নামিয়া খোলা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুনীতি বলিলেন, আমার কথা শুনলে?

সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে বার বার ঘাড় নাড়িয়া রামেশ্বর বলিলেন, হু। সুনীতি বলিলেন, হ্যাঁ, তুমি শক্ত হয়ে দাঁড়ালে মহীর কিছু হবে না। মজুমদার ঠাকুরপো আমায় বলেছেন, এ রকম উত্তেজনায় খুন করলে ফাঁসি তো হয়ই না, অনেক সময় বেকসুর খালাস পেয়ে যায়।

বলিতে বলিতে তাঁহার ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—ননী পালের রক্তাক্ত নিস্পন্দ দেহ। উঃ, সে কি রক্ত! কাছারি-বাড়ীর বারান্দাটায় রক্ত জমিয়া একটা স্তর পড়িয়া গিয়াছিল। সুনীতির মন হতভাগ্য ননী পালের জন্য হাহাকার করিয়া উঠিল। মহীন অন্যায় করিয়াছে, অপরাধ করিয়াছে। দণ্ড দিতে গিয়া মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। সেইটুকুর জন্য শাস্তি তাহার প্রাপ্য, এইটুকু শাস্তিই যেন সে পায়। আত্মহারা নির্ব্বাক হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পর মানদা ঘরের বাহির হইতে তাঁহাকে ডাকিল, মা!

সুনীতির চমক ভাঙিল, একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, যাই।

উনোনের আঁচ ব'য়ে যাচ্ছে মা।

আত্মসম্বরণ করিয়া সুনীতি স্বামীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

রামেশ্বর একদৃষ্টিতে বাহিরে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার জন্য সন্ধ্যাকৃত্যের জায়গা করিয়া দিয়া সুনীতি বলিলেন, কাপড় ছেড়ে নাও, সন্ধ্যে ক'রে ফেল। আমি দুধ গরম ক'রে নিয়ে আসি।

রামেশ্বর বলিলেন, একটা কথা ব'লে দিই তোমাকে। তুমি—

সুনীতি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, বল, কি বলছ?

তুমি একমনে তোমার দিদিকে ডাক—মানে রাধারাণী, রাধারাণী। সে বেঁচে নেই, ওপার থেকে সে আমার ডাক শুনতে পাবে। বল —তোমার মান রাখতেই মহীর আমার এই অবস্থা, তুমি তাকে আশীর্ব্বাদ কর, বাঁচাও।

সুনীতি বলিলেন, ডাকব, তাঁকে ডাকব বইকি।

* * *

সুনীতি নীচে আসিয়া দেখিলেন, মজুমদার তাঁহারই অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছে। সে মহীন্দ্রের খবর জানিবার জন্য থানায় গিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াই সুনীতির ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার চোখের সম্মুখে শৃঙ্খলবদ্ধ মহীর বিষণ্ণ মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। মুখে তিনি কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, কিন্তু মজুমদার দেখিল, উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

সে নিতান্ত মূর্খের মত খানিকটা হাসিয়া বলিল, দেখে এলাম মহীকে।

তবু সুনীতি নীরব প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। মজুমদার অকারণে কাসিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া আবার বলিল, এতটুকু ভেঙে পড়েন নি, দেখলাম। আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়াও সুনীতির নিকট হইতে সরব কোন প্রশ্ন আসিল না দেখিয়া বলিল, থানার দারোগাও কোন খারাপ ব্যবহার করে নি। আবার সে বলিল, আমি সব জেনে এলাম, থানায় কি এজাহার দিয়েছেন, তাও দেখলাম। একটা মিথ্যে বলেন নি।

সুনীতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, আর কোন জীবন-স্পন্দন স্ফুরিত হইল না।

মজুমদার বলিল, দারোগা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন বরং, লোকটা কি বলেছিল বলুন তো? মহীবাবু সে কথা বলেন নি। দারোগা কথাটা জানতে চেয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন, কথা আমি যদি উচ্চারণই করব, তবে তাকে গুলি করে মেরেছি কেন? আমি বললাম সব।

সুনীতি এতক্ষণে কথা কহিলেন, ছি!

মাথা হেঁট করিয়া মজুমদার বলিল, না বলে যে উপায় নেই বউ-ঠাকরুণ, মহীকে বাঁচানো চাই তো!

দরদর করিয়া এবার সুনীতির চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, মজুমদার প্রাণপণে আপনাকে উৎফুল্ল করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ভাবিবেন না আপনি, ও-মামলায় কিছু হবে না মহীর। দারোগাও আমাকে সেই কথা বললেন।

অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে সুনীতি প্রশ্ন করিলেন, মহী কিছু বলে নি?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মজুমদার বলিল, বললেন, মাকে বলবেন, তিনি যেন না কাঁদেন। আমি অন্যায় কিছু করি নি। বড়মাকে দেখি নি, মা বললেই মাকে মনে পড়ে। সে শয়তান যখন মায়ের নাম মুখে আনলে, তখন মাকেই আমার মনে প'ড়ে গেল, আমি তাকে গুলি করলাম। আমার তাতে একবিন্দু দুঃখ নেই, ভয়ও করি না আমি। তবে মা কাঁদলে আমি দুঃখ পাব।

সুনীতি বলিলেন, কাল যখন যাবে ঠাকুরপো, তখন তাকে ব'লো, যেন মনে মনে তার বড়মাকে ডাকে, প্রণাম করে। বলবে, তার বাপ এই কথা ব'লে দিয়েছেন, আমিও বলছি।

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া মজুমদার বলিল, অনেকগুলি কথা আছে আপনার সঙ্গে। স্থির হয়ে ধৈর্য্য ধ'রে আপনাকে শুনতে হবে।

সুনীতি বলিলেন, আমি কি ধৈর্য্য হারিয়েছি ঠাকুরপো?

অপ্রস্তুত হইয়া মজুমদার বলিল, না—মানে, মামলা-সংক্রান্ত পরামর্শ তো! মাথা ঠিক রেখে করতে হবে, এই আর কি!

আচ্ছা, তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ওঁকে দুধটা গরম ক'রে খাইয়ে আসি। যাইতে যাইতে সুনীতি দাঁড়াইলেন, ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে মানদাকে ডাকিলেন, মানদা, বামুন-ঠাকরুণকে বল্ তো মা, মজুমদার-ঠাকুরপোকে একটু জল খেতে দিক। আর তুই হাত-পা ধোবার জল দে।

মজুমদার বলিল, শুধু এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। তৃষ্ণায় তাহার ভিতরটা যে শুকাইয়া গিয়াছে।

স্বামীকে খাওয়াইয়া সুনীতি নীচে আসিয়া মজুমদারের অল্প দূরে বসিলেন। যোগেশ মাথায় হাত দিয়া গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল। সুনীতি বলিলেন, কি বলছিলে, বল ঠাকুরপো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মজুমদার বলিল, মামলার কথাই বলছিলাম। আমার খুব ভরসা বউঠাকরুণ, মহীর এতে কিছু হবে না। দারোগাও আমাকে ভরসা দিলেন।

সে তো তুমি বললে ঠাকুরপো।

হ্যাঁ। কিন্তু এখন দু'টি ভাবনার কথা, সে কথাই বলছিলাম।

কি কথা বল?

মামলায় টাকা খরচ করতে হবে, ভাল উকিল দিতে হবে। আর ধরুন, দারোগা-টারোগাকেও কিছু দিলে ভাল হয়।

সুনীতি প্রশ্ন করিলেন, ঘুষ?

হ্যাঁ, ঘুষই বৈকি। কাল যে কলি বউঠাকরুণ। তবে আমরা তো আর ঘুষ দিয়ে মিথ্যা করাতে চাই না।

কত টাকা চাই?

তা হাজার দু'য়েক তো বটেই, মামলা-খরচ নিয়ে।

আমার গহনা আমি দেব ঠাকুরপো, তাই দিয়ে এখন তুমি খরচ চালাও।

ইতস্তত করিয়া মজুমদার বলিল, আমি বলছিলাম চরটা বিক্রি ক'রে দিতে। অপয়া জিনিস, আর খদ্দেরও রয়েছে। আজই থানার ওখানে একজন মাড়োয়ারী মহাজন আমাকে বলছিল কথাটা।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুনীতি বলিলেন, ওটা এখন থাক ঠাকুরপো, এখন তুমি গহনা নিয়েই কাজ কর। পর যা হয় হবে। আর কি বলছিলে, বল?

আর একটা কথা বউঠাকরুণ, এইটেই হ'ল ভয়ের কথা। ছোট রায় মহাশয় যদি বেঁকে দাঁড়ান।

সুনীতি নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন, এ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না।

মজুমদার বলিল, আপনি একবার ওদের বাড়ী যান।

সুনীতি নীরব।

মজুমদার বলিল, মহীর বড়মা ধরুন মা-ই; কিন্তু তিনি তো রায় মশায়ের সহোদরা। ননী পাল তার আশ্রিত, কিন্তু সে কি তাঁর সহোদরার চেয়েও বড়?

সুনীতি ধীরে ধীরে বলিলেন, কিন্তু মহী তো তাঁর সহোদরার অপমানের শোধ নিতে এ কাজ করে নি ঠাকুরপো।

কিন্তু কথা তো সেই একই।

ম্লান হাসি হাসিয়া সুনীতি বলিলেন, একই যদি হয় তবে কৈফিয়ৎ দেবার জন্য কি আমার যাবার প্রয়োজন আছে ঠাকুরপো? তাঁর মত লোক এ কথা কি নিজেই বুঝতে পারবেন না?

মজুমদার চুপ করিয়া গেল, আর সে বলিবার কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুনীতি আবার বলিলেন, যে কাজ মহী করলে ঠাকুরপো, বিনা

কারণে সে কাজ করলে ভগবানও তাকে ক্ষমা করেন না। কিন্তু যে কারণে সে করেছে, সে কারণটাই আজ বড় হয়ে কর্ম্মের পাপ হাল্কা ক'রে দিয়েছে। এ কারণ যে না বুঝবে, তাকে কি ব'লে বোঝাতে যাব আমি? আবার কিছুক্ষণ পর বলিলেন, আর মহীর কাছে মহীর মা বড়। রায় মশায়ের কাছে তাঁর ভগ্নী বড়। মহী মায়ের অপমানে যা করবার করেছে; এখন রায় মশায় তাঁর ভগ্নীর জন্যে যা করা ভাল মনে করেন, করবেন। এতে আর আমি গিয়ে কি করব, বল?

* * *

গভীর রাত্রি; গ্রামখানা সুষুপ্ত। রামেশ্বর বিছানায় শুইয়া জাগিয়াই ছিলেন। অদূরে স্বতন্ত্র বিছানায় সুনীতি অসাড় হইয়া পড়িয়া আছেন, তিনিও জাগিয়া মহীন্দ্রের কথাই ভাবিতেছিলেন। মায়ের অপমানের শোধ লইতে মহী বীরের কাজ করিয়াছে, এ যুক্তিতে মনকে বাঁধিলেও প্রাণ সে বাঁধন ছিঁড়িয়া উন্মত্তের মত হাহাকার করিতে চাহিতেছে; বুকের মধ্যে অসহ্য বেদনার বিক্ষোভ চাপিয়া তিনি অসাড় হইয়া পড়িয়া ছিলেন। শয়নগৃহে স্বামীর বুকের কাছে থাকিয়াও প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া সে বিক্ষোভ লঘু করিবার উপায় নাই! রামেশ্বর জাগিয়া উঠিলে বিপদ হইবে, তিনি অধীর হইয়া পড়িবেন, বিপদের উপর বিপদ ঘটিয়া যাইবে।

পূর্ব্বাকাশের দিকচক্রবালে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিতেছিল। খোলা জানালা দিয়া আলোর আভাস আসিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। রামেশ্বর অতি সন্তর্পণে খাট হইতে নামিয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন, ঘুমন্ত সুনীতির বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটাইবার জন্যই তাঁহার এ সতর্কতা। জানালা দিয়া নীচে মাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কয়েক পা পিছাইয়া আসিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, উঃ, ভয়ানক উঁচু!

সুনীতি শিহরিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, বলিলেন, কি করছ?

রামেশ্বর ভীষণ আতঙ্কে চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কে?

সুনীতি তাড়াতাড়ি বলিলেন, আমি, আমি, ভয় নেই, আমি।

কে? রাধারাণী?

না, আমি সুনীতি।

আশ্বস্ত হইয়া রামেশ্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ও, এখনও ঘুমোও নি তুমি? রাত্রি যে অনেক হ'ল সুনীতি।

সুনীতি বিচিত্র হাসি হাসিলেন। বলিলেন, তুমি ঘুমোও নি যে? এস, শোবে এস।

আমার ঘুম আসছে না সুনীতি। শুয়ে হঠাৎ রামায়ণ মনে প'ড়ে গেল।

রামায়ণ আমি পড়ব, তুমি শুনবে?

না। মেঘনাদকে যখন অধর্ম্ম-যুদ্ধে লক্ষ্মণ বধ করলে, তখন রাবণের কথা মনে আছে তোমার? শক্তিশেল, শক্তিশেল! আমার মনে হচ্ছে—তেমনি শেল যদি পেতাম, তবে রায়-বংশ, রায়-হাট সব আজ ধ্বংস ক'রে দিতাম আমি। রামেশ্বর থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। সুনীতি বিব্রত হইয়া স্বামীকে মৃদু আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এস, বিছানায় বসবে এস, আমি বাতাস করি।

রামেশ্বর আপত্তি করিলেন না, আসিয়া বিছানায় বসিলেন। একদৃষ্টে জানালা দিয়া চন্দ্রালোকিত গ্রামখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুনীতি বলিলেন, তুমি ভেবো না, মহী আমার অন্যায় কিছু করে নি। ভগবান তাকে রক্ষা করবেন।

রামেশ্বর ও-কথার কোন জবাব দিলেন না। নীরবে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা পরম ঘৃণায় মুখ বিকৃত

করিয়া বলিয়া উঠিলেন, অ্যাঃ, বিষে একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছে।

সুনীতি কাতর স্বরে মিনতি করিয়া বলিলেন, ওগো, কি বলছ তুমি? আমার ভয় করছে যে!

ভয় হবারই কথা। দেখ, চেয়ে দেখ—গ্রামখানা বিষে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কতকাল ধ'রে মানুষের গায়ের বিষ জমা হয়ে আসছে, রোগশোক, কত কি! মনের বিষ, হিংাস-দ্বেষ মারামারি কাটাকাটি খুন! অ্যাঃ!

চন্দ্রালোকিত গ্রামখানার দিকে চাহিয়া সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; সত্যই গ্রামখানাকে অদ্ভুত মনে হইতেছিল। জমাট অন্ধকারের মত বড় বড় গাছ, বহুকালের জীর্ণ বাড়ীঘর,—ভাঙা দালান, ভগ্নচূড়া দেউলের সারি, এদিকে গ্রামের কোল ঘেঁষিয়া কালিন্দীর সুদীর্ঘ সুউচ্চ ভাঙন, সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, বিকৃতমস্তিষ্ক রামেশ্বরের মত বিষ-জর্জ্জরিত মনে না হইলেও, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা হয়।

সহসা রামেশ্বর আবার বলিলেন, দেখ।

কি?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রামেশ্বর বলিলেন, আমার আঙুল-গুলো বড় টাটাচ্ছে।

কেন? কোথাও আঘাত লাগল নাকি?

বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া রামেশ্বর বলিলেন, উহুঁ।

তবে? কই, দেখি!—বলিয়া অন্তরালে রক্ষিত প্রদীপটি উস্কাইয়া আনিয়া দেখিয়া বলিলেন, কই, কিছুই তো হয় নি।

তুমি বুঝতে পারছ না। হয়েছে—হয়েছে। দেখছ না, আঙুলগুলো ফুলো-ফুলো আর লাল টকটক করছে?

হাত তো তোমাদের বংশের এমনই লাল।

না, তোমায় এতদিন বলি নি আমি। ভেবেছিলাম, কিছু না, মনের ভ্রম। কিন্তু—। তিনি আর বলিলেন না, চুপ করিয়া গেলেন। সুনীতি বলিলেন, তুমি একটু শোও দেখি, মাথায় একটু জল দিয়ে তোমায় আমি বাতাস করি।

রামেশ্বর আপত্তি করিলেন না, সুনীতির নির্দ্দেশমত চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। সুনীতি শিয়রে বসিয়া বাতাস দিতে আরম্ভ করিলেন। চাঁদের আলোয় কালীর গর্ভের বালির রাশি দেখিয়া মনে কেমন একটা উদাস ভাব জাগিয়া উঠে। একপাশে কালীর ক্ষীণ কলস্রোতে চাঁদের প্রতিবিম্ব, সুনীতির মনে ওই উদাসীনতার মধ্যেও একটু রূপের আনন্দ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। তাহার ও-পারে সেই কাশে ও বেনাঘাসে ঢাকা চরটা, জ্যোৎস্নার আলোয় কোমল কালো রঙের সুবিস্তীর্ণ একখানি গালিচার মত বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বনাশা-চর! বাতাস করিতে করিতে সুনীতিও ধীরে ধীরে ঢলিয়া বিছানার উপর পড়িয়া গেলেন। পড়িয়াই আবার চেতনা আসিল, কিন্তু দারুণ শ্রান্তিতে উঠিতে আর মন চাহিল না, দেহ পারিল না। ঘুম যখন ভাঙিল, তখন প্রভাত হইয়াছে। রামেশ্বর উঠিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। সুনীতিকে উঠিতে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, কবরেজ মশায়কে একবার ডাকতে পাঠাও তো।

কেন? শরীর কি খারাপ করছে কিছু?

এই আঙ্‌লগুলো একবার দেখাব।

ও কিছু হয় নি, তবে বল তো ডাকতে পাঠাচ্ছি।

না, অনেক দিন উপেক্ষা করেছি, ভেবেছি, ও কিচ্ছু নয়। কিন্তু এইবার বেশ বুঝতে পারছি, হয়েছে—হয়েছে।

রাত্রেও ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন। এ আর সুনীতি কত সহ্য করিবেন? বিরক্ত হইতে পারেন না, দুর্ভাগ্যের জন্য কাঁদিবার পর্যন্ত

অবসর নাই, এ এক অদ্ভুত অবস্থা। তিনি বলিলেন, আঙুলে আবার কি হবে বল? আঙুল তো—

কুষ্ঠ—কুষ্ঠ।—সুনীতির কথার উপরেই চাপা গলায় রামেশ্বর বলিয়া উঠিলেন, অনেক দিন আগে থেকে সূত্রপাত, তোমায় বিয়ে করবার আগে থেকে। লুকিয়ে তোমায় বিয়ে করেছি।

সুনীতি বজ্রাহতার মত নিস্পন্দ নিথর হইয়া গেলেন।

৯

এক বৎসরের মধ্যেই চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অবস্থা হইয়া গেল বজ্রাহত তালগাছের মত। তালগাছের মাথায় বজ্রাঘাত হইলে সঙ্গে সঙ্গেই সে জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যায় না। দিন কয়েকের মধ্যেই পাতাগুলি শুকাইয়া যায়, তারপর শুষ্ক পাতাগুলি গোড়া হইতে ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়ে, ক্রমে সেগুলি খসিয়া যায়, অক্ষত-বহিরঙ্গসুদীর্ঘ কাণ্ডটা ছিন্নকণ্ঠ হইয়া পুরাকীর্ত্তির স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া থাকে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অবস্থাও হইল সেইরূপ। মহীন্দ্রের মামলাতেই চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বিষয়-সম্পত্তি প্রায় শেষ হইয়া গেল। থাকিবার মধ্যে থাকিল বজ্রাহত তালকাণ্ডের মত প্রকাণ্ড বাড়ীখানা, সেও সংস্কার-অভাবে জীর্ণ, শ্রীহীনতায় রুক্ষ কালো। ইহারই মধ্যে বাড়ীটার অনেক জায়গায় পলেস্তারা খসিয়া গিয়াছে, চুনকামের অভাবে শেওলায় ছাইয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে। মহীন্দ্রের মামলায় দুই হাজারের স্থলে খরচ হইয়া গেল পাঁচ হাজার টাকা। মজুমদারের বন্দোবস্তে টাকার অভাব হয় নাই, হাণ্ডনোটেই টাকা পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু টাকা থাকিতেও বাকি রাজস্বের দায়ে একদিন সম্পত্তিও নিলাম হইয়া গেল। ভাগ্যের এমনি

বন্দোবস্ত যে, মিলনটা হইল যেদিন মহীন্দ্রের মামলার রায় বাহির হইল সেই দিনই। মামলার এই চরম উত্তেজনাময় সঙ্কটের দিনেই ছিল নিলামের দিন, মজুমদারের মত লোকও একথা বিস্মৃত হইয়া গেল। যখন খেয়ালে আসিল, তখন যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। রায়-বাড়ীর অনেকে মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিলেও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে এজন্য আক্ষেপ উঠিল না। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের তো বজ্রনাদে শিহরিয়া উঠিবার অবকাশ হয় না। মামলায় মহীন্দ্রের দশ বৎসর দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়া গিয়াছে, সেই আঘাতে চক্রবর্ত্তী-বাড়ী তখন নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছে।

সকলেই আশা করিয়াছিল, মহীন্দ্রের গুরুতর শাস্তি কিছু হইবে না। সমাজের নিকট মহীন্দ্রের অপরাধ, ননী পালের অন্যায়ের হেতুতে, মার্জ্জনার অতীত বলিয়া বোধ হয় নাই; কিন্তু বিচারালয়ে সরকারী উকিলের নিপুণ পরিচালনায় সে অপরাধ অমার্জ্জনীয় বলিয়াই প্রমাণিত হইয়া গেল। মায়ের অপমানে সন্তানের আত্মহারা অবস্থার অন্তরালে তিনি বিচারক ও জুরীগণকে দেখাইয়া দিলেন, জমিদার ও প্রজার চিরকালের বিরোধ। সওয়ালের সময় তিনি ঈশপের নেকড়ে ও মেষশাবকের গল্পটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এ অপরাধ যদি ওই অপমানসূচক কয়টি কথার ভারে লঘু হইয়া যায়, তবে ঈশপের নেকড়েরও মেষশাবক-হত্যার জন্য বিন্দুমাত্র অপরাধ হয় নাই। নেকড়েরও অভিযোগ ছিল যে, মেষশাবক নেকড়ের বাপকে গালি-গালাজ করিয়াছিল। ওই অপমানের কথাটা ঈশপের গল্পের মত দুরাত্মার একটা ছল মাত্র; আসল সত্য হইল, উদ্ধত জমিদারপুত্র এই হতভাগ্য তেজস্বী প্রজাটিকে দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হিসাবে হত্যা করিয়াছে এবং সে-কথা আমি যথাযথরূপে প্রমাণ করিয়াছি বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর যে কথা কয়টিকে মর্ম্মান্তিক অপমানসূচক বলিয়া চরম

উত্তেজনার কারণস্বরূপ ধরা হইতেছে, সে-কথাও মিথ্যা কথা নয়, সে-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আসামীর—

কেন আপনি মিথ্যে বকছেন?—উকিলের সওয়ালে বাধা দিয়ে মহীন্দ্র বলিয়া উঠিল। সে কাঠগড়ায় রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। উকিলের বক্তব্যের প্রারম্ভ শুনিয়াই সে তৈলহীন রুক্ষ পিঙ্গল চোখে তীব্র দৃষ্টি লইয়া মুর্তিমান উগ্রতার মত বলিয়া উঠিল, কেন আপনি মিথ্যে বকছেন? হ্যাঁ, উদ্ধত প্রজা হিসাবেই তাকে আমি গুলি ক'রে মেরেছি!

সরকারী উকিল বলিলেন, দেখুন দেখুন, আসামীর মূর্তির দিকে চেয়ে দেখুন। প্রাচীন আমলের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের জলন্ত নিদর্শন।

ইহার পর চরম শাস্তি হওয়াই ছিল আইনসঙ্গত বিধান। কিন্তু বিচারক ওই অপমানের কথাটাকে আশ্রয় করিয়া এবং অল্প বয়সের কথাটা বিবেচনা করিয়া শাস্তিবিধানের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। ওদিকে সম্পত্তি তখন নিলামে বসিয়াছে আছে; ডাকিয়াছেন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর মহাজন—মজুমদার মশায়েরই শ্যালক। লোকে কিন্তু বলিল, শ্যালক মজুমদারের বেনামদার।

মহীন্দ্র অবিচলিতভাবেই দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিল। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল। রায় দিয়া এজলাস ভাঙিয়া বিচারক বলিলেন, I admire his boldness! সাহসের প্রশংসা করতে হয়।

সরকারী উকিল হাসিয়া বলিলেন, Yes sir। এর পিতামহ সাঁওতাল-হাঙ্গামার সময় সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়াই ক'রে মরেছিল। সামন্ত-বংশের খাঁটি রক্ত ওদের শরীরে—true blood।

মহীন্দ্র সম্পত্তি নিলামের কথা শোনে নাই। সে শুধু আপন দণ্ডাজ্ঞাটাকেই তাহাদের সংসারের একমাত্র দুর্ভাগ্য বিবেচনা করিয়া

মজুমদারকে ডাকিয়া বলিল, দুঃখ করবেন না। আপীল করবারও প্রয়োজন নেই। আমি নিজে যেখানে স্বীকার করেছি, তখন আপীলে ফল হবে না। আর সর্ব্বস্বান্ত হয়ে মুক্তি পেয়ে কি হবে? শেষে কি রায়-বাড়ীতে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে? কোর্টের জনতার মধ্যে একখানা চেয়ারে স্তম্ভিতের মত বসিয়া ছিলেন ইন্দ্র রায়। মহীন্দ্র শেষ কথাটা তাঁহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল। কথাটা রায়ের কানেও গেল, কিন্তু কোনমতেই মাথা তুলিয়া তিনি চাহিতে পারিলেন না।

মহীন্দ্র আবার বলিল, পারেন তো বাবার কাছে খবরটা চেপে রাখবেন। মাকে কাঁদতে বারণ করবেন। বাবার ভার এখন সম্পূর্ণ তাঁর ওপর। আর অহিকে যেন পড়ানো হয়, যতদূর সে পড়তে চাইবে।

মাথা উঁচু করিয়াই হাতকড়ি পরিয়া সে কন্‌স্টেব্‌লের সঙ্গে চলিয়া গেল। সকলের শেষে ইন্দ্র রায় মাথা হেঁট করিয়া কোর্ট হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। বাড়ী ফিরিয়া একেবারে অন্দরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া হেমাঙ্গিনী শিহরিয়া উঠিলেন, অত্যন্ত কুণ্ঠিত এবং শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিলেন কি হ'ল?

ইন্দ্র রায় কথার উত্তর দিলেন না।

* * *

সুনীতি সব সংবাদই শুনিলেন। মহীন্দ্রের সংবাদ শুনিলেন সেই দিনই, তবে এ-সংবাদটা শুনিলেন দিন দুই পর—অপরের নিকট; গ্রামে তখন গুজব রটিয়া গিয়াছিল। সুনীতি এই দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও উদাসীন হইয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি মজুমদারকে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, এ কি সত্যি?

মজুমদার নিরুত্তর হইয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

সুনীতি বলিলেন, বল ঠাকুরপো, বল। ভিক্ষে করতেই যদি হয় তবে বুক আগে থেকেই বেঁধে রাখি, আর গোপন ক'রে রেখো না, বল।

মজুমদার এবার বলিল, কি বলব বউঠাকরুণ, আমি তখন মহীর মামলার রায় শুনে—

সুনীতি অসহিষ্ণু হইয়া কথার মাঝখানেই প্রশ্ন করিলেন, সব গেছে?

চোখ মুছিয়া মজুমদার বলিল, আজ্ঞে না, দেবোত্তর সম্পত্তি, আমাদের লাখেরাজ, এই গ্রাম, তারপর চক আফজলপুর, তারপর জমিজেরাত—এসব রইল।

সুনীতি চুপ করিয়া রহিলেন, আর তাঁহার জানিবার কিছু ছিল না। মজুমদার একটু নীরব থাকিয়া বলিল, একটা কাজ করলে একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যায়। বিষয় হয়তো ফিরতেও পারে। ওই চরটার জন্যে অনেক দিন থেকে একজন ধরাধরি করছে, ওটা বিক্রি ক'রে মামলা ক'রে দেখতে হয়, বিষয়টা যদি ফেরে।

সুনীতি বলিলেন, না ঠাকুরপো, ও চরটা থাক। ওই চরের জন্যেই মহী আমার দ্বীপান্তরে গেল, ও চর মহী না-ফেরা পর্য্যন্ত প'ড়েই থাক।

মজুমদার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবে থাক। তা হ'লেও আমি ছাড়ব না, যাব একবার আমি রবি ঘোষালের কাছে। টাকা নিয়ে সে সম্পত্তি ফিরে দিক।

সুনীতি হাসিলেন, বলিলেন, তিনিও তো অনেক টাকা পাবেন; সে টাকাই বা কোথা থেকে দেব, বল? তুমি তো সবই জান।

মজুমদার আর কিছু বলিল না। যাইবার জন্যই উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সুনীতি বাধা দিয়া বলিলেন, আর একটু দাঁড়াও ঠাকুরপো। কথাটা কিছুদিন থেকেই বলব ভাবছি, কিন্তু পারছি না। বলছিলাম,

তুমি তো সবই বুঝছ ; যে অবস্থায় ভগবান ফেললেন, তাতে ঝি, চাকর, রাঁধুনী সবাইকে জবাব দিতে হবে। তোমার সম্মানই বা মাসে মাসে কি দিয়ে করব ঠাকুরপো ?

মজুমদার তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তা বেশ তো বউঠাকরুণ, আর কাজই বা এমন কি রইল এখন ? লোকের দরকারই বা কি ? তবে যখন যা দরকার পড়বে, আমি ক'রে দিয়ে যাব। যে আদায়টুকু আছে, সেও আমি না হয় গোমস্তা হিসেবে ক'রে দেব। সরঞ্জামি কেবল নগদীর মাইনেটাই দেবেন।

সুনীতি আর কোন কথাই বলিলেন না, মজুমদার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সেই দিনই সুনীতি মানদা, বামুনঠাকরুণ, এমন কি চাকরটিকে পর্য্যন্ত জবাব দিলেন। কিন্তু জবাব দেওয়া সত্ত্বেও গেল না শুধু মানদা। সে বলিল, আমি যাব না। আজ পঁচিশ বছর এখানে রয়েছি, চোখও বুজব এই বাড়ীতে। বাড়ী নাই, ঘর নাই, আমি কোথাব যাব ? তা ঝাঁটাই মার আর জুতোই মার ! হ্যাঁ !

ইন্দ্র রায় সেই যে কোর্ট হইতে আসিয়া বাড়ী ঢুকিয়াছিলেন, দুই তিন দিন ধরিয়া আর তিনি বাহির হন নাই। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ান, কাহাকেও কোন কথা বলেন না, এমন কি দিনের মধ্যে তামাক দিতেও কাহাকে ডাকেন না। তাঁহার সে মুখ দেখিয়া চাকরবাকর দূরের কথা আদরিণী মেয়ে উমা পর্য্যন্ত সম্মুখে আসে না। সেদিন হেমাঙ্গিনী আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইলেন। রায় তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া চিন্তাকুল গম্ভীর মুখেই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, অ্যাঁ ?

হেমাঙ্গিনী কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বলিলেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

রায়ের মাথাটা আরও একটু ঝুঁকিয়া পড়িল।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, শরীর কি তোমার—

কথার মাঝখানেই রায় মাথা তুলিয়া উদভ্রান্তস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, তারা—তারা মা!

হেমাঙ্গিনী দেখিলেন, রায়ের চোখ দুইটার জল টলমল করিতেছে। হেমাঙ্গিনী মাথা নীচু করিলেন। রায় বলিলেন, লজ্জার বোঝা—শুধু লজ্জার বোঝা নয় হেম, এ আমার অপরাধের বোঝা—মাথায় নিয়ে মাথা আমি তুলতে পারছি না। রামেশ্বরের বড়ছেলে আমার মাথাটা ধূলোয় নামিয়ে দিয়ে গেল। তারা—তারা মা! আবার বার কয়েক অস্থিরভাবে ঘুরিয়া রায় বলিলেন, হেমাঙ্গিনী আমি, নিযুক্ত করেছিলাম ননী পালকে। শুধু চর দখল করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ননীকে আমি বলেছিলাম, চক্রবর্ত্তীদের যদি প্রকাশ্যভাবে অপমান করতে পারিস, তবে আমি তোকে বকশিশ দেব। ননী অপমান করলে রাধারাণীর—আমার সহোদরার।

হেমাঙ্গিনীর চোখ দিয়া অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসিল।

রায় আবেগভরে বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিলেন, উঃ, আদালতে মহীন কি বললে জান? সরকারী উকিল বলিলেন, মৃত ননী পাল যার অপমান করেছিল, সে আসামীর সৎমা। মহীন তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ ক'রে উঠল, যার নয়—বলুন যাঁর,—সে নয় বলুন তিনি, সৎমা নয়—মা, আমার বড় মা।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হেমাঙ্গিনী উদাস কণ্ঠে বলিলেন, দ্বীপান্তর হয়ে গেল?

দশ বৎসর। বার কয়েক ঘুরিয়া রায় অকস্মাৎ হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিলেন, তুমি একবার মহীনের মায়ের কাছে যাবে হেম?

হেমাঙ্গিনী স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

রায় বলিলেন, আমার অনুরোধ! আমাকে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে হেম। রামেশ্বরের স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করতে হবে।

হেমাঙ্গিনী এবার কাতর স্বরে বলিলেন, ওগো, কোন্ মুখে আমি গিয়ে দাঁড়াব? কি বলব?

রায় আবার মাথা নীচু করিয়া পদচারণ আরম্ভ করিলেন। হেমাঙ্গিনীর কথার জবাব তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। কিছুক্ষণ পর হেমাঙ্গিনী আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, উমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই।

রায় বলিলেন, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি, হেমাঙ্গিনী, এ কথাটা গোপন ক'রো। তুমি যেন আপনি—আমাকে লুকিয়ে গেছ। মহীনের মা যদি ফিরিয়ে দেন। মাথা নত করিয়া আবার বলিলেন—বলবে, যোগেশ মজুমদারকে যেন জবাব দেন, আর চরের খাজনা আদায় ক'রে নিন ওঁরা।

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলেন। রায় এতক্ষণে অন্দর হইতে কাছারিতে আসিয়া একজন পাইককে বলিলেন, যোগেশ মজুমদারকে একবার ডাক্ দেখি। বলবি, জরুরী কাজ। সঙ্গে নিয়ে আসবি, বুঝলি?

মজুমদার তাঁহার কাছারির ফটকে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সাগ্রহে সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন, আরে, এস, এস, মজুমদার মশায়, এস!

মজুমদার প্রণাম করিয়া বলিল, আজ্ঞে বাবু, আশয়হীন লোককে মহাশয় বললে গাল দেওয়া হয়। আমি আপনাদের চাকর।

হাসিয়া রায় বলিলেন, বিষয় হ'লে আশয় হতে কতক্ষণ মজুমদার, এক দিনে এক মুহূর্ত্তে জন্মে যায়।

মজুমদার চুপ করিয়া রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রায় বলিলেন, জান মজুমদার, আজকাল বড় বড় লোকের মাথা বিক্রি হয়, মৃত্যুর পর তাদের মাথা নিয়ে দেখে, সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদে

মস্তিষ্কের কি তফাৎ। তা আমি তোমার খান-দুয়েক হাড় কিনে রাখতে চাই, পাশা তৈরি করাব।

মজুমদারের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিল না। রায় আবার বলিলেন, রহস্য করলাম, রাগ ক'রো না। এখন একটা কাজ আমার ক'রে দাও, চরটা আমাকে ব'লে ক'য়ে বিক্রি করিয়ে দাও। ওটার জন্যে আমার মাথা আজও হেঁট হয়ে রয়েছে গ্রামে।

মজুমদার এবার গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, চরটা ওঁরা বিক্রি করবেন না রায় মশায়।

ওঁরা? ওঁরা কে হে? তুমিই তো এখন মালিক।

আমার জবাব হয়ে গেছে।

জবাব হয়ে গেছে! কে জবাব দিলে? রামেশ্বরের এখনও এদিকে দৃষ্টি আছে নাকি?

আজ্ঞে না। তিনি একেবারেই কাজের বাইরে গিয়েছেন। জবাব দিলেন গিন্নীঠাকরুণ।

রায় অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, মেয়েটি শুনেছি বড় ভাল, সাবিত্রীর মত সেবা করেন রামেশ্বরের। এদিকে বুদ্ধিমতী ব'লেও তো বোধ হচ্ছে। না হ'লে তুমি তো বাকিটুকুও অবশিষ্ট রাখতে না। বাঘে খানিকটা খেয়ে ইচ্ছে না হ'লে ফেলে যায়, কিন্তু সাপের তো উপায় নেই, গিলতে আরম্ভ করলে শেষ তাকে করতেই হয়। কিন্তু কাজটা তুমি ভাল করলে না মজুমদার।

এইবার মজুমদার বলিল, আজ্ঞে বাবু, টাকাও তো আমি পাঁচ হাজার দিয়েছি।

তা দিয়েছ; কিন্তু মামলা-খরচের অজুহাতে তার অর্দ্ধেকই তো তোমার ঘরেই ঢুকেছে মজুমদার। আমি তো সবই জানি হে।

আমার দুঃখটা থেকে গেল, চক্রবর্ত্তীদের আমি ধ্বংস করতে পারলাম না।

মজুমদার জবাব দিল আজ্ঞে, পনর আনা তিন পয়সাই আপনার করা বাবু, ননী পালকে তো আপনিই খাড়া করেছিলেন।

রায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ও কাজটাতে আমি সুখী হতে পারিনি যোগেশ। এতখানি খাটো আমি জীবনে হই নি। রামেশ্বরের বড়ছেলে আমার গালে চুনকালি মাখিয়ে দিয়ে গেছে। সেই কালি আমাকে মুছতে হবে। সেই কথাটা তোমাকে বলবার জন্যেই আমি তোমায় ডেকেছিলাম। আর লোভ তুমি ক'রো না। ওই চরের দিকে হাত বাড়িও না, ওগুলো রামেশ্বরের ছেলেদের থাক। ওরা না জানুক, তুমি জেনে রাখ, রক্ষক হয়ে রইলাম আমি।

মজুমদারের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; সে আপনার করতলের রেখাগুলির দিকে চাহিয়া বোধ করি আপনার ভাবী ভাগ্যলিপি অনুধাবনের চেষ্টা করিতে লাগিল। রায় সহসা বলিলেন, সাইকেলে ওটি—রামেশ্বরের ছোট ছেলে নয়?

সম্মুখে পথে কে একজন অতি দ্রুত সাইকেল চালাইয়া চলিয়াছিল, গতির দ্রুততা হেতু মানুষটিকে সঠিক চিনিতে না পারিলেও এ ক্ষেত্রে ভুল হইবার উপায় ছিল না। আরোহীর উগ্র-গৌর দেহবর্ণ, তাহার মাথার উপর পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘ চুলগুলি বাতাসে চঞ্চল হইয়া নাচিতেছে চক্রবর্ত্তীদের বংশপতাকার মত। মজুমদার দেখিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদের অহীন্দ্রই বটে।

রায় বলিলেন, ডাক তো, ডাক তো ওকে। এত ব্যস্তভাবে কোথা থেকে আসছে ও?

মজুমদারও চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে বার বার ডাকিল, অহি! অহি! শোন, শোন।

গতিশীল গাড়ির উপর হইতেই সে মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া একটা হাত তুলিয়া বলিল, আসছি। পরমুহূর্তেই সে পথে মোড় ফিরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। মজুমদার ব্যস্ত হইয়া বলিল, আমি যাই তা হ'লে বাবু। দেখি, অহি অমন ক'রে কোথা থেকে এল, খবরটা কি আমি জেনে আসি।

রায় বলিলেন, আমায় খবরটা জানিও যেন মজুমদার।

* * *

দ্রুতবেগে গাড়িখানা চালাইয়া বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া অহীন্দ্র একরূপ লাফ দিয়া নামিয়া পড়িল। গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্যও সে ছুটিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু স্তব্ধ বাড়ীখানার ভিতর হইতে একটি অতি মৃদু ক্রন্দনের সুর তাহার কানে আসিতেই তাহার গতি মন্থর এবং সকল উত্তেজনা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সে ডাকিল, মা!

দ্বিপ্রহরের নির্জ্জন অবকাশে সুনীতি আপনার বেদনার লাঘব করিতেছিলেন, মৃদু মৃদু বিলাপ করিয়া কাঁদিতেছিলেন। অহির ডাক শুনিয়া তিনি চোখ মুছিয়া বাহিরে আসিলেন, বলিলেন, দেরী করলি যে অহি? কালই ফিরে আসবি ব'লে গেলি! কণ্ঠস্বরে তাঁহার শঙ্কার আভাস।

অহি বলিল, হেডমাষ্টার মশায় কাল ফিরে আসেন নি মা, আজ সকাল নটায় এলেন ফিরে।

পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে?

হ্যাঁ মা।

তোর খবর?

পাস হয়েছি মা।

তবে বলছিস না যে? সুনীতির ম্লান মুখ এবার ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বলতে ভাল লাগছে না মা। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অহি বলিল, দাদা আমায় বলেছিলেন, ভাল ক'রে পাস করলে একটা ঘড়ি কিনে দেবেন—একটা রিস্টওয়াচ।

সুনীতির চোখ দিয়া আবার জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

অহি বলিল, আমি বড় অকৃতজ্ঞ মা। মাস্টার মশায় বললেন, কম্পিট তুমি করতে পার নি, ডিভিশনাল স্কলার্‌শিপ তুমি পাবেই। যে কলেজেই যাবে, সুবিধে অনেক পাবে। কোথায় পড়বে ঠিক করে ফেল। আমি শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এলাম। সমস্ত পথটার মধ্যে দাদার কথা একবারও মনে পড়ে নি মা; বাড়ীতে এসে ঢুকতেই তোমার কান্নার আওয়াজে আমার স্মরণ হ'ল, দাদাকে মনে পড়ে গেল।

সুনীতি ছেলেকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, তুই ভাল করে প'ড়ে টপটপ করে পাস ক'রে নে। তারপর তুই জজ হবি অহি। দেখবি, এমন ধারার অবিচার যেন কারও ওপর না হয়। ততদিনে মহী ফিরে আসবে। সে বাড়ীতে বসে ঘর-সংসার দেখবে, তুই সেখান থেকে টাকা পাঠাবি।

অহি বলিল, একটা খবর নিলাম মা এবার। দশ বছর দাদাকে থাকতে হবে না। মাসে মাসে চার পাঁচ দিন ক'রে মাফ হয়। বছরে দু মাস তিন মাসও হয় ভাল ব্যবহার করলে। তা হ'লে তিন দশে তিরিশ মাস আড়াই বছর বাদ যাবে, দশ বছর থেকে। সাড়ে সাত বছর থাকতে হবে। আর দ্বীপান্তর লিখলেও আজকাল সকলকে আন্দামানে পাঠায় না। দেশেই জেলে রেখে দেয়।

উপরে রামেশ্বর গলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন। শব্দ

শুনিয়া সচকিত হইয়া সুনীতি বলিলেন, বাবুকে প্রণাম করবি আয় অহি। ওঁকে খবর দিয়ে আসি, ওঁর কথাই আমরা সবাই ভুলে যাই।

মাটির পুতুলের মত একই ভাবে রামেশ্বর সেই খাটেরউ পর বসিয়া ছিলেন। সুনীতি সত্য সত্যই একটু আনন্দের হাসি হাসিয়া বলিলেন, ওগো, অহি তোমার পাস করেছে, স্কলার্‌শিপ পেয়েছে।

অহি রামেশ্বরকে প্রণাম করিল। রামেশ্বর হাত বাড়াইয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, পাস করেছ, স্কলার্‌শিপ পেয়েছ?

হ্যাঁ, ওকে আশীর্ব্বাদ কর।

হ্যাঁ হ্যাঁ।

ও এবার কলেজে পড়তে যাবে। যে কলেজেই যাবে সেখানে ওকে অনেক সুবিধে দেবে।

বাঃ বাঃ, রাজা দিলীপের পুত্র রঘু—সমস্ত বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁরই নামে বংশের পর্য্যন্ত নাম হয়ে গেল রঘুবংশ। তুমি রঘুবংশ পড়েছ অহি, মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ? "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগার্থপ্রতিপত্তয়ে—জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ।"

অহি এবার বলিল, স্কুলে তো এ-সব মহাকাব্য পড়ানো হয় না, এইবার কলেজে পড়ব।

ইংরেজদের এক মহাকবি আছেন, তাঁর নাম সেক্ষপীর। সে-সবও প'ড়ো।

হ্যাঁ, শেক্সপীয়ার পড়তে হবে বি, এ, তে।

এ-কথার উত্তরে আর রামেশ্বর কথা বলিলেন না। সহসা তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, যাও, তুমি এখন বেড়িয়ে এস।

সুনীতি বলিলেন, না না, ও এখনও খায় নি। তুই এখানেই ব'স অহি, আমি খাবার এইখানেই নিয়ে আসি।

রামেশ্বর তিক্তস্বরে বলিলেন, না না। যাও অহি, ভাল ক'রে সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ফেল, স্নানই বরং কর। তারপর খাবে।

পিতার অনিচ্ছা অহীন্দ্র বুঝিল, সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুনীতি জলভরা চোখে বলিলেন, কেন তুমি ওকে এমন ক'রে তাড়িয়ে দিলে ? এর জন্যেই—

বাধা দিয়া রামেশ্বর আপনার দুই হাত মেলিয়া বলিলেন, ছোঁয়াচে ছোঁয়াচে, কুষ্ঠরোগ—

সুনীতি আজ তারস্বরে প্রতিবাদ করিলেন, না না। কবরেজ বলেছেন, ডাক্তার বলেছেন, রক্তপরীক্ষা করে দেখেছেন, ও-রোগ তোমার নয়।

জানে না, ওরা কিছুই জানে না। বাহিরের সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিয়া রামেশ্বর নীরব হইলেন। দরজায় মৃদু আঘাত করিয়া অহীন্দ্র ডাকিল, মা!

যাই আমি অহি।—সুনীতি অভিমানভরেই চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু অহীন্দ্রই দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে রায়গিন্নী হেমাঙ্গিনী—ইন্দ্র রায়ের স্ত্রী।

১০

দীর্ঘকাল পরে হেমাঙ্গিনী রামেশ্বরকে দেখিলেন। রামেশ্বরের কথা মনে হইলেই তাঁহার স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠিত রামেশ্বরের সেকালের ছবি। পিঙ্গল চোখ, পিঙ্গল চুল, তাম্রাভ গৌরবর্ণ, বিলাসী, কৌতুক-হাস্যে সমুজ্জ্বল একটি যুবকের মূর্তি। আর আজ এই রুদ্ধদ্বার অন্ধকার-প্রায় ঘরের মধ্যে বিষণ্ণ স্তব্ধ শঙ্কাতুর এক জীর্ণ প্রৌঢ়কে দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। চোখে তাঁহার জল আসিল। সুনীতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও পরস্পর পরস্পরকে সামাজিক ক্ষেত্রে দেখিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে চিনিতে সুনীতির বিলম্ব হইল না।

তিনি অতি ধীরভাবে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আসুন আসুন, দিদি আসুন। তাড়াতাড়ি তিনি একখানা আসন পাতিয়া দিলেন।

হেমাঙ্গিনী কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, এত খাতির করলে যে আমি লজ্জা পাব বোন, এ তো আমার খাতিরের বাড়ী নয়। তুমি তো আমার পর নও। তবে তুমি 'দিদি' ব'লে সম্মান ক'রে দিলে, আমি বসছি।—বলিয়া আসনে বসিয়া সর্ব্বাগ্রে তিনি চোখ মুছিলেন। তারপর মৃদুস্বরে সুনীতিকে প্রশ্ন করিলেন, পুরনো কথা বোধ হয় ওঁর ভুল হয়ে যায়, না?

না না। আপনি রায়-গিন্নী, রায়-গিন্নী।—মৃদুস্বরে বলিলেও কথাটা রামেশ্বরের কানে গিয়াছিল, তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অতি সকরুণ ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া কথা কয়টি বলিলেন।

হেমাঙ্গিনীর চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, না, চিনতে পারেন নি। কই, আমাকে আদর ক'রে সম্মান ক'রে যে নাম দিয়েছিলেন, সে নামে তো ডাকলেন না?

রামেশ্বর বলিলেন, ভুলে যান রায়-গিন্নী, ও কথা ভুলে যান। দুঃখই যেখানে প্রধান রায়-গিন্নী, সেখানে সুখের স্মৃতিতেই বা লাভ কি? ভগবান হলেন রসস্বরূপ, তিনি যাকে পরিত্যাগ করেছেন, সে ব্যক্তি পরিবেশন করবার মত রস পাবে কোথায় বলুন?

হেমাঙ্গিনী গভীর স্নেহ-অভিষিক্ত কণ্ঠস্বরে বলিলেন, না না, এ কি বলছেন আপনি? ভগবান পরিত্যাগ করলে কি সুনীতি আপনার ঘরে আসে? অহিকে দেখাইয়া বলিলেন, এমন চাঁদের মত ছেলে ঘর আলো করে?

রামেশ্বর হাসিলেন—অদ্ভুত হাসি। সে হাসি না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। বলিলেন, সূর্য্যে গ্রহণ লেগেছে রায়-গিন্নী, ভরসা এখন চাঁদেরই বটে। দেখি, আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

প্রসাধন যতই সযত্ন এবং সুনিপুণ হোক, দিনের আলোকে প্রসাধনের অন্তরালে স্বরূপ যেমন প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনই ভাবেই রামেশ্বরের রূপক-উক্তির ভিতর হইতে সদ্যসংঘটিত মর্ম্মান্তিক আঘাতের বেদনা আত্মপ্রকাশ করিল। একই সঙ্গে সুনীতি ও রায়-গিন্নীর চোখ হইতে টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, অহি আর সহ্য করিতে পারিল না, সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

রামেশ্বর সুনীতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'অহিকে খেতে দেবে না সুনীতি? ও তো এখনও খায় নি।'

হেমাঙ্গিনী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সে কি! আমি তোমাকে বসিয়ে রেখেছি বোন? আর এখনও পর্য্যন্ত খায় নি? ম'রে যাই!

এতক্ষণে সুনীতি প্রথম কথা বলিলেন, শহর থেকে এইমাত্র ফিরল। তাই দেরি হয়ে গেল। পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে, তাই এই দুপুরেই না খেয়ে ছুটে এসেছে।

সস্নেহ হাসি হাসিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বাছা আমার পাস হয়েছে নিশ্চয়? ও তো খুব ভাল ছেলে।

মুখ উজ্জ্বল করিয়া সুনীতি বলিলেন, হ্যাঁ দিদি, আপনার আশীর্ব্বাদে খুব ভাল ক'রে পাস করেছে অহি; ডিভিশনের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে, স্কলার্‌শিপ পাবে।

আকস্মিক প্রসঙ্গান্তরের মধ্য দিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে, পঙ্ক হইতে পঙ্কজের উদ্ভবের মত, দুঃখের স্তরকে নীচে রাখিয়া আনন্দের আবির্ভাবে সকলেই একটি স্নিগ্ধ দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, শিবের ললাটে চাঁদের ক্ষয় নেই চক্রবর্ত্তী মশায়, এ-চাঁদ আপনার অক্ষয় চাঁদ।

রামেশ্বর বলিলেন, মঙ্গল হোক আপনার, অমোঘ হোক আপনার আশীর্ব্বাদ।

সুনীতি হেমাঙ্গিনীর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন; হেমাঙ্গিনী বলিলেন, যাও ভাই, তুমি ছেলেকে খেতে দিয়ে এস। আমি বসছি চক্রবর্ত্তী মশায়ের কাছে।

সুনীতি চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় হেমাঙ্গিনীকে সাবধান করিয়া চুপি চুপি বলিয়া গেলেন, মাঝে মাঝে দু-একটা ভুল বলেন, দেখবেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, কত দিন ভেবেছি, আসব, আপনাকে দেখে যাব, কিন্তু পারি নি। আবার ভেবেছি, যাক, মুছেই যখন গেছে সব, তখন মুছেই যাক। কিন্তু সেও হ'ল না, মুছে গেল না। পাথরে দাগ ক্ষয় হয়ে মুছে যায় কিন্তু মনের দাগ কখনও মোছে না। আজ আর থাকতে পারলাম না। অপরাধ যে আমাদেরই। এর জন্যে দায়ী যে উনি।

কে? ইন্দ্র? না না রায়-গিন্নী, দায়ী আমি। হেতু ইন্দ্র। সব আমি খতিয়ে দেখেছি। চিত্রগুপ্তের হিসাবের খাতায় মাঝে মাঝে আমি উঁকি মেরে দেখি কিনা।

হেমাঙ্গিনী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, কিন্তু এমন ভাবে ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়লে তো চলবে না আপনার, চক্রবর্ত্তী মশায়। সুনীতির দিকে, ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন তো তাদের মুখ।

বুক ফেটে যায় রায়-গিন্নী, বুক ফেটে যায়। কিন্তু কি করব বলুন, আমার উপায় নেই।

উপায় আপনাকে করতে হবে, উঠে দাঁড়াতে হবে।

কি ক'রে উঠে দাঁড়াব? দিনের আলোতে আমার চোখে অসহ্য যন্ত্রণা, তার ওপর,—আপনার কাছে গোপন করব না, রায়-গিন্নী, হাতে আমার কুষ্ঠ হয়েছে।

হেমাঙ্গিনী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

রামেশ্বর বলিলেন, এরা কেউ বিশ্বাস করে না; কবরেজ বলেন, না; ডাক্তার বলেন, না; রক্তপরীক্ষা ক'রে তারা বলে, না; সুনীতি বলে, না। মূর্খ সব। রায়-গিন্নী, ভগবানের বিধানের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এরা বোঝে না। আয়ুর্ব্বেদে আছে কি জানেন? যেখানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, রোগ যেখানে কর্ম্মফল, সেখানে চিকিৎসকের ভুল হবে। একবার নয়, শতবার দেখলে শতবার ভুল হবে।

হেমাঙ্গিনী সতর্ক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে রামেশ্বরের সর্ব্বাঙ্গ দেখিতেছিলেন, কোথাও এক বিন্দু বিকৃতি তিনি দেখিতে পাইলেন না। তিনি শুনিয়াছিলেন, আজ প্রত্যক্ষ বুঝিলেন, রোগের ধারণাই মস্তিষ্কবিকৃতির উপসর্গ। বলিলেন, না চক্রবর্ত্তী মশায়, এ আপনার মনের ভুল। কই কোথাও তো এক বিন্দু কিছু নেই।

হাতের দশটা আঙুল প্রসারিত করিয়া দিয়া রামেশ্বর বলিলেন, এই আঙুলে—আঙুলে।

অহীন্দ্রের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সুনীতি একটা পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিলেন। হেমাঙ্গিনী উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। বলিলেন, আজ তা হ'লে আসি ভাই।

সুনীতি বলিলেন, সারাক্ষণ নন্দাইয়ের সঙ্গেই ব'সে গল্প করলেন, আমার কাছে একটু বসবেন না দিদি?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, তোমার সঙ্গে কত যে গল্প করতে সাধ, সে কথা আর একদিন বলব সুনীতি। চক্রবর্ত্তী মশায় যখন তোমায় বিয়ে ক'রে আনলেন, তখন তোমার ওপরই রাগ হয়েছিল। অকারণ রাগ। তারপর যত দেখলাম, ততই তোমার সঙ্গে কথা ব'লে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে সাধ হয়েছে। সে অনেক কথা, পরে একদিন বলব। আজ যাই, বুঝতেই তো পারছ, লুকিয়ে এসেছি। তবে একটা কথা

ব'লে যাই, যেটা বলতে আমার আসা। তুমি ভাই মজুমদারকে সরাও। ওঁর কাছে আমি শুনেছি, সম্পত্তি ওই নিজে বেনাম ক'রে ডেকেছে।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জানি দিদি। আমি ওঁকে জবাবও দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা কি জানেন, তবুও উনি আসছেন, না বললেও কাজকর্ম্ম ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, সেও বন্ধ করা দরকার বোন, যে এমন বিশ্বাসঘাতক হতে পারে, তাকে বিশ্বাস কি ?

এখন বার বার বলছেন, চরটা বেচে ফেলুন, অনেক টাকা হবে।

না না, এমন কাজও ক'রো না ভাই। আমি ওঁর কাছে শুনেছি, চরটায় তোমাদের অনেক লাভ হবে, আয় বাড়বে।

কিন্তু চর নিয়ে যে গ্রাম জুড়ে বিবাদ দিদি, আমি কেমন ক'রে, সে সব সামলাব ? আর বিবাদ না মিটলেই বা বন্দোবস্ত করব কি ক'রে বলুন ?

সাঁওতালদের ডেকে তোমরা খাজনা আদায় ক'রে নাও সুনীতি। আমি এইটুকু ব'লে গেলাম যে, তোমার দাদা আর কোন আপত্তি তুলবেন না। আর কেউ যদি তোলে, তবে তাতেও তিনি তোমাকেই সাহায্য করবেন।

সুনীতি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, তাঁকে আমার প্রণাম দেবেন দিদি, বলবেন—

বাধা দিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, পারব না ভাই। বললাম তো লুকিয়ে এসেছি।

* * * *

মানদা ঝি যায় নাই, বাড়ীঘর নাই বলিয়া এখানেই এখনও রহিয়াছে। আপনার কাজগুলি সে নিয়মিতই করে। সুনীতি আপত্তি করিলেও শোনে না। বরং কাজ তাহার এখন বাড়িয়া গিয়াছে,

বাড়াইয়াছে সে নিজেই। সদর কাছারি-বাড়ীর চাকর চলিয়া গিয়াছে, নায়েবও নাই, কিন্তু তবুও অনেক পরিষ্কারের প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন সে নিজেই আবিষ্কার করিয়া কাজটি আপনার ঘাড়ে লইয়াছে। তাহার উপর সকালে সন্ধ্যায় দুয়ারে জল, প্রদীপের আলো, ধূপের ধোঁয়া এগুলি তো না দিলেই নয়। হিন্দুর বাড়ী, মা-লক্ষ্মী রুষ্ট হইবেন যে!

সুনীতি আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু মানদা বলিয়াছিল, যদিন আছি আমি করি, তারপর আপনার যা খুশি হয় করবেন। আপনি যদি তখন নিজে হাতে গোবর মেখে ঘুঁটে দেন পয়সা বাঁচাবার জন্যে—দেবেন, আমি তো আর দেখতে আসব না।

কাছারি-বাড়ী সে পরিষ্কার করে দিনে দ্বিপ্রহরে; খাওয়া-দাওয়ার পর মানুষের একটা বিশ্রামের সময় আছে, এই সময়টা বাহিরটায় লোকজন থাকে না, সেই অবসরে নিত্য কাজটা সারিয়া লয়। লজ্জাটা তাহার নিজের জন্য নয়, চাকরের বদলে ঝি কাছারি সাফ করিলে অন্য কেহ কিছু না বলুক, ওই রায়-বাড়ীর ছেলেগুলি হয়তো ছড়া বাঁধিয়া বসিবে। সেদিন সে তক্তাপোশের উপর পাতা ফরাশ হইতে আরম্ভ করিয়া মেঝে পর্য্যন্ত সমস্ত পরিপাটি করিয়া ঝাঁট দিতেছিল, আর গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছিল। এত বড় নির্জ্জন ঘরগুলার মধ্যে একা কাজ করিতে করিতে কেমন গান পাইয়া বসে। দুই একবার বড় আয়নাটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিভ ও ঠোঁট বাহির করিয়া দেখে, পানের রসটা কেমন ঘোরালো হইয়াছে। স্নানের পর হইতেই চুল খোলা থাকে, খোলা চুলও এই সময়ে বাঁধিয়া লয়। আজ সহসা তাহার গান থামিয়া গেল, মনে হইল, অনেক লোক যেন কাছারির বাহিরের প্রাঙ্গণে কথা বলিতেছে, ঝাঁট দেওয়া বন্ধ রাখিয়া উঠিয়া খড়খড়ি-দেওয়া দরজাটার খড়খড়ি তুলিয়া সে দেখিল, সাঁওতালেরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

জনহীন রুদ্ধদ্বার কাছারির দিকে চাহিয়া তাহারা চিন্তিত হইয়া কি বলাবলি করিতেছে। মানদা ঘরের ভিতরে ভিতরেই অন্দরে চলিয়া গিয়া সুনীতিকে বলিল, সাঁওতালরা সব দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়ে আছে মা, কি সব বলাবলি করছে! আমি এই গলি গলি গিয়ে ডাকব নায়েববাবুকে?

সুনীতি বলিলেন, না। অহিকে ডাক্ তুই, ওপরে নিজের ঘরেই আছে সে।

অহীন্দ্র আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেই মাঝির দল কলরব করিয়া উঠিল, রাঙাবাবু! অহীন্দ্র সাধারণতঃ এখানে থাকে না, তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল মজুমদারকে। অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদের রাঙাবাবুকে পাইয়া তাহারা খুব খুশি হইয়া উঠিল। অহীন্দ্র বলিল, কি রে, তোরা সব কেমন আছিস?

ঠকাঠক তখন প্রণাম হইয়া গিয়াছে। কমল মাঝি জোড়হাত করিয়া বলিল, ভাল আছি আজ্ঞা। আপুনি কেমন কবে এলি বাবু। আমরা সব কত বুলি, কত খুঁজি তুকে! বুলি, আমাদের রাঙাবাবু আসে না কেন? মেয়েগুলো সব শুধায়।

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, আমি যে পড়তে গিয়েছিলাম মাঝি।

ক খ অ-আ সেই সব? রিংজী ফর্সী, না কি বাবু?

হ্যাঁ অনেক পড়তে হয়। তারপর, তোরা কোথায় এসেছিস?

আপনার কাছে তো এলম গো। বুলছি, আমাদের জমি কটির খাজনা তুরা লে, আমাদিকে চেক-রসিদ দে। তা নইলে কি ক'রে থাকবো গো?

খাজনা কে পাবেন, এখনও যে তার ঠিক হয় নি মাঝি। সে ঠিক—

বাধা দিয়া কমল বলিল, না গো, সে সব ঠিক হয়ে গেল। দিলে সব ঠিক ক'বে উই সেই রায়-হুজুর, আমাদিকে বুললে, চরটি তুদের

রাঙাবাবুদেরই ঠিক হ'ল মাঝি। খাজনা তুরা সেই কাছারিতে দিবি। তাথেই তো আজ ছুটে এলম গো।

দ্বিপ্রহরে হেমাঙ্গিনীর কথা অহীন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল। সে এবার দ্বিধা না করিয়া বলিল, দে, তবে দিয়ে যা।

কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া মাঝি বিনয় করিয়া হাসিয়া বলিল, হা বাবু, ইটি আপনি কি বুলছিস? জমি কটি মাপতে হবে, তার বাদে হিসাব করতে হবে, তুদের খাতিতে নাম লিখতে হবে, সি সব কর্ আগে। লইলে কি ক'রে দিব?

অহীন্দ্র বিব্রত হইয়া বলিল, সে তো আমি পারব না মাঝি, আমি তো জানি না ওসব। তবে আমি তার ব্যবস্থা করছি, বুঝলি?

মাঝি বিস্মিত হইয়া গেল, তবে আপুনি কি বিদ্যে শিখলি গো?

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, সে সব অনেক বই মাঝি, নানা দেশের কথা, কত বড় বড় বীরের কথা, কত যুদ্ধের কথা!

হঁ্যা, সি কোন্ গাঁয়ের কথা বটে গো?—বীর বুললি—কারা বটে সি সব?

সে সব পৃথিবী জুড়ে নানা দেশ আছে, সেই সব দেশ, আর সেই সব দেশের বড় বড় বীর—তাদেরই কথা মাঝি। আরও সব কত কথা—ওই আকাশে সুয্যি উঠেছে, চাঁদ উঠেছে, সেই সব কথা।

হাঁ! মাঝির মুখ-চোখ বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল, সে মুখ ফিরাইয়া দলের সকলকে আপন ভাষায় বলিল, রাঙাবাবু কত জানে দেখ্!

সঙ্গীর দল আপন ভাষায় রাঙাবাবুর তারিফ করিয়া মৃদু কলরব আরম্ভ করিয়া দিল, কমল বলিল, হাঁ বাবু, এই যি পিথিমীটি, এই যি ধরতি-মায়ী—ইহাকে কে গড়লে? কি লেখা আছে পুঁথিতে তুদের?

অহীন্দ্র বলিল, পৃথিবী হ'ল গ্রহ, বুঝলি? আকাশে রাত্রে সব তারা ওঠে না, এও ওই একটি তারা। আগে পৃথিবী দাউদাউ

ক'রে জ্বলত। যেমন কড়াইয়ে গুড় কি রস টগবগ ক'রে ফোটে, তেমনি ক'রে ফুটত।

মাঝি বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু, তুকে এখুনও অনেক পড়তে হবে। পিথিমীতে আগে ছিল জল। কিছুই ছিল না, শুধুই জল ছিল। তার পরে হ'ল কি জানিস? বলি শোন্। বলিয়া সে মোটা গলায় আরম্ভ করিল—

অথ জনম্ কু ধরতি লেণ্ডং
অথ জনম্ কু মানোয়া হড়
মান মান কু মানোয়া হড়
ধরতি কু ডাবাও আ-কাদা,
ধরতি সানাম্ কু ডাবাও কিদা।

গান শেষ করিয়া মাঝি বলিল, পেথমে ছিল জল—কেবল জল। তার পর হ'ল—'অথ জনম্ কু ধরতি লেণ্ডং'; বুলছে, লেণ্ডং গায়ে থেকে মাটি বার ক'রে ধরতিকে বানালে—মাটি করলে। লেণ্ডং হ'ল—ওই যে মাছ ধরিস তুরা, কেঁচো গো, কেঁচো। দেখিস কেনে—আজও উয়ার গায়ে থেকে মাঠি বার করে। তারপর হ'ল—'অথ জনম্ কু মানোয়া হড়'। বুলছে, মাটিতে হ'ল মানুষ, 'মান মান কু মানোয়া হড়', কিনা মানুষ মানুষ—কেবলই মানুষ। তখন তুর 'ধরতি কু ডাবাও আ-কাদা', কি না—মানুষ করলে ধরতি—মাটি খুঁড়ে চাষ; —ফসল হ'ল। 'ধরতি সানাম্ কু ডাবাও কিদা'—একেবারে তামাম ধরতিতে চাষ হয়ে অ্যানেক ফসল হ'ল।

অহীন্দ্র হাসিল, কিন্তু বড় ভাল লাগিল এই গান ও গল্প। মাঝি আবার বলিল, ধরতি-মাটি বানালে তুর 'নেণ্ডং'—কেঁচোতে, পোকাতে।

অহীন্দ্র তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিল, এ সব কথা তো আমি জানি না মাঝি।

উৎসাহ পাইয়া মাঝি জাঁকিয়া বসিয়া বলিল, তবে শুনো আপুনি, বুলি আপোনাকে। ঠাকুর বুঝ তো বাবু, ঠাকুর—ভগোমান? গি পেথমে জল করলে—সব জল হয়ে গেল। তখুন ঠাকুর দুটি "হাঁস-হাঁসিল" বানালে। হাঁস-হাঁসিল হ'ল পাখী, বুঝলিন বাবু? তা সি পাখী দুটি ঠাকুরকে বুললে, হা ঠাকুর, আমাদিকে তো বানালি তা আমরা থাকব কুথা, খাব কি? ঠাকুর বুললে, হেঁ, তো বেটে! তখন ঠাকুর ডাকলে তুর কুমীরকে। বুললে, তুমি মাটি তুলতে পারিস? কুমীর বুললে, হেঁ, আপুনি বুললে পারি। কুমীর মাটি তুললে, সি সব মাটি জলে গ'লে ফুরিয়ে গেল। তখুন ঠাকুর ডাকলে—ইচা হাকোকে—বোয়াল মাছকে, তা, উয়ার মাটিও গ'লে গেল। তার বাদে এল কাটকম। কি বুলিস তুরা উয়াকে? আ-হা! কাটকমের বাংলা ভাবিয়া না পাইয়া মাঝি চিন্তিত হইয়া পড়িল।

কাঠের পুতুলের ওস্তাদ কথাটা যোগাইয়া দিল, কাঁকুড়ি। কাঁকড়া বলে বাবুরা। সেই যি লম্বা পা—

হেঁ। কমল মাঝি বলিল, হেঁ। কাঁকুড়িকে ডাকলে তখুন ঠাকুর। বুললে মাটি তুলো তুমি। উ মাটি তুললে, তা, সিটোও গ'লে গেল। তখুন ঠাকুর ডাকলে লেণ্ডংকে—কেঁচোকে। শুধালে, তুমি মাটি তুলতে পারিস? উ বুললে, পারি; তা ঠাকুর, হারোকে সমেত ডাক আপুনি। হারো হ'ল তুমার 'কচ্ছপ' গো। কচ্ছপ এল। কেঁচো করলে কি—উয়াকে জলের উপরে দাঁড় করালে, লিয়ে উয়ার পা কটা সিকল দিয়ে বেঁধে দিলে। তা বাদে, কেঁচো আপন লেজটি রাখলে উয়ার পিঠের উপর, আর মুখটি ডুবায়ে দিলে জলের ভিতর। মুখে মাটি খেলে আর লেজ দিয়ে বার ক'রে কচ্ছপের পিঠের ওপর রাখলে। তখুন আর গ'লে গেল না। এমুনি ক'রে মাটি তুলতে তুলতে পিথিমী ভ'রে গেল।

সমস্ত কাহিনীটি বলিয়া কমল বিজ্ঞভাবে হাসিয়া বলিল, বুঝল্নি বাবু? ই সব তুকে শিখতে হবে।

সাঁওতালদের এই পুরাণকথা শুনিয়া অহীন্দ্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহাদের এমন পুরাণকথা আছে, সে তাহা জানিত না। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে নীরবে গল্পটি মনে মনে স্মরণ করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে আরম্ভ করিল।

কমল মাঝিও নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল তাহার তারিফ শুনিবার প্রত্যাশায়। পিছন হইতে কাঠের পুতুলের ওস্তাদ বলিল, বাঃ, তুমি যে গল্পে মজিয়া গেলে গো সর্দ্দার! জমির কথাটা বলিয়া কথাটা পাকা করিয়া লও। এই লোকটি জ্ঞানে গরিমায় কমলের প্রতিদ্বন্দ্বী। সর্দ্দারের এই 'বিদ্যা জাহির' করাটা তাহার সহ্য হয় না, তা ছাড়াও লোকটি খাঁটি সংসারী মানুষ, বিষয়বুদ্ধিতে পাকা। অন্য মাঝিরাও কাঠের পুতুলের ওস্তাদের কথায় সায় দিয়া উঠিল।

কমল একটু রুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সকলের সমর্থন দেখিয়া সে কোন প্রতিবাদ করিল না। অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাবুমশয়!

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল,—তোমার একথা খুব ভাল কথা মাঝি। ভারী সুন্দর।

হুঁ গো, খুব ভাল বটে। তা—হা বাবু, আমাদের তবে কি করবি?

বললাম তো লোক পাঠিয়ে দেব।

উঁ-হুঁ। তুকে নিজে যেতে হবে! উয়ারা সব চোর বটে।

কমলের চোখ দুইটি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, শুন রাঙাবাবু, ইয়ার লেগ্যে একবার আমরা খেপলাম। এই বড় বড় হাঁড়িতে ঘি নিয়ে যেতম, দোকানীরা ঘি লিখো, তা এক সেরের বেশী কখুনও হ'ত না। মহাজনেরা কাই হড় বটে, পাপী মানুষ, মাঝিদের হাড্ডি

চিবায়ে খেলে। গোমস্তাতে টাকা লিলে, রসিদে দিলে না। খাজনা লিলে আবার জমি লিলেম করালে। জমা বাড়ালে। বললম, জমি বাড়ুক, তবে জমা বাড়বে, লইলে কেনে বাড়বে? বাবা দাদা বন কেটে জমি করলে, আমরা খাজনা দিলম, তবে লিলেম হবে কেনে জমি? তা শুনলে না। তখন আমরা খেপলম। সিধু, কান্থ, সুভা-ঠাকুর (সুবাদার) হ'ল—এক রাতে হ'ল। জানিস বাবু রাতেই লোক বড় হয়, আবার রাতেই লোক ছোট হয়। সুভা, সিধু, কান্থ হুকুম দিলে, আমরা খেপব। তুর দাদা—বাবার বাবা—রাঙাঠাকুর বললে, খেপ তুরা, খেপ। এই টাঙ্গি লিয়ে রাঙাঠাকুর খেপল, আমাদের বাবাদের সাথে। তখুন ধরলম মহাজনদিকে, একটি ক'রে আঙুল কাটলম, আর বললম, বাজা, টাকা বাজা! দাড়িওলা মহাজনকে জমিদারকে ধরলম, ভাল পাঁঠা বলে, বোঙার কাছে কাটলম। একটো গোমস্তা জলে নামল, তীর দিয়ে তাকে বিঁধলম। তারপরে টেনে তুলে—পেরথম কাটলম পা। বললম, এই লে চার আনা সুদ। তারপর কাটলম কোমর থেকে, বললম, এই লে আট আনা, সুদ আর খাজনা। কাটলম হাত দুটা, বললম এই বারো আনা, সুদ, খাজনা, তোর তহুরী। তারপর কাটলম মাথা, বললম, এই লে ষোল আনা; লিব্যাধি! ফারখত।

কমল চুপ করিল। সমস্ত বাড়ীটা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল; সব যেন উদাস হইয়া গিয়াছে। অহীন্দ্র নীরব বিস্ময়ে চাহিয়া ছিল স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির মত ওই কমলের দিকে। সাঁওতালরাও নীরব। তাহাদের উপরেও যেন কেমন নীরব বিষণ্ণতা নামিয়া আসিয়াছে।

কমলই আবার বলিল—এবার তাহার মুখও বিষণ্ণ, কণ্ঠস্বরে মিনতির অনুনয়—বলিল, তাথেই বুলছি বাবু।

অহীন্দ্র এতক্ষণে বলিল, আবার তোমাদের ঠকালে তোমরা খেপবে?

খেপব? কমল বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

কেন?

রাঙাঠাকুর ম'ল, সিধু সুভাঠাকুর ম'ল, রাঁচীতে বিসরা মহারাজ ম'ল আর কে খেপাবে বল্? কে হুকুম দিবে? আর বাবু—

কমল আপনাদের সঙ্গীদের দেখাইয়া বলিল, ইয়ারা সব আর সি সাঁওতাল নাই। ইয়ারা মিছা কথা বলে, কাজ করতে গিয়ে গেরস্তকে ঠকায়, খাটে না, ইয়ারা লোভী হইছে। পাপ হইছে উয়াদের। উয়ারা খেপতে পারবে না। উয়ারা ধরম নষ্ট করলে।

শেষের দিকে কমলের কণ্ঠস্বর সকরুণ হইয়া উঠিল। কথা শেষ করিয়া সে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পিছনে মাঝির দল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের সর্দ্দারের অভিযোগ তাহাদের লজ্জা দিয়াছে।

কথা বলিল সেই চূড়া মাঝি—পুতুল নাচের ওস্তাদ, সে লোকটা অনেকটা বাস্তবপন্থী, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, টাকা লইলে কিছু হয় না বাবু, টাকা নাই, খেপে কি করব? আর বাবু, খেপে ম'রেই যদি যাব তো খেপলম কেনে বল্? বুদ্ধি করলম ইবার আমরা।

কমল তাহার দিকে একটা ঘৃণার দৃষ্টি হানিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, তারপর অহীন্দ্রকে বলিল, আজই চ কেনে বাবু।

এবার পিছন হইতে সঙ্গীরা কথা বলিয়া উঠিল। শুনিয়া কমল বলিল, আর উয়ারা খেপবে না বাবু। খেপলম, তারপরে হাজারে হাজারে সাঁওতাল ম'ল গুলিতে। যারা বাঁচল, তারা ভাত পেলে না। সাঁয়ো ঘাস খেলে। বাবু, আমি তখন গিধড়া—ছেলেমানুষ—তবু মনে লাগছে (পড়ছে), ইঁদুরের দড় (গর্ত্ত) থেকে ধান বার করলম—গুণে চারটি ধান, জলে সিজলম (সিদ্ধ করলাম), সেই জল খেলম, ফেন ব'লে। আর উয়ারা খেপবে না। তাথেই সাহস হছে

না। বুলছে, চেক রসিদেটি না হ'লে উয়াদের চাষে মন লাগছে না। তার বাদে আমাদের বিয়া আছে, ওই যে আমার লাতিনটি— সেই লম্বা পারা, তারই বিয়া হবে। তাথেই সব মাতন আছে আমাদের, হাঁড়িয়া খাবে সব, নাচবে, গান করবে। তাথেই সব তাড়াতাড়ি করছে।

অহীন্দ্র বলিল, বেশ, তাড়াতাড়িই ক'রে নেব—কাল কি পরশু। কিন্তু তোর নাতনীর বিয়েতে আমাদের নেমন্তন্ন করবি না?

মাঝি শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, বাবা রে, আমাদের রাজা তুমি, রাঙাঠাকুরের লাতি, তেমুনি আগুনের পারা রঙ, তেমুনি চোখ, তেমুনি চুল। আপোনাকে তাই বুলতে পারি? আমরা সব কত কি খাই—মুরগী শুয়োর—ছি!

সাঁওতালেরা চলিয়া গেল। অহীন্দ্র মুগ্ধ হইয়া তখনও ওই বুড়া মাঝির কাহিনীর কথা ভাবিতেছিল। সে নিজে বিজ্ঞান ভালবাসে। বুড়ার কাহিনীর মধ্যে আদিম বর্ব্বর জাতির আদিম বৈজ্ঞানিক মনকে সে আবিষ্কার করিল। সৃষ্টিরহস্যভেদে অনুসন্ধিৎসু মন কল্পনার সাহায্যে কাহিনী রচনা করিয়া রহস্যভেদ করিয়াছে।

তাহার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করিয়া দিয়া রংলাল ও নবীন আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।—দাদাবাবু!

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে অহীন্দ্র চাহিল, কোন কথা বলিল না।

একগাল হাসিয়া রংলাল বলিল, এই দেখেন, চর আপনাদেরই হ'ল তো? আমি মশায়, বলেছিলাম কি না? ছোট রায়-হুজুর সাঁওতালদের ব'লে দিয়েছেন তো, এই কাছারিতে খাজনা দিতে?

অহীন্দ্রের একটা কথা মনে হইল, সে নবীনকে বলিল, নবীন,

তুমি তো পুরনো লোক। সাঁওতালদের জমিটা মাপ ক'রে দিতে পারবে?

সবিনয়ে নবীন বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। মাপ-জোক সব ক'রে দেব আমি।

সোৎসাহে রংলাল বলিল, আপনি চলুন, গিয়ে দাঁড়াবেন শুধু, বাস্। আমরা সব ঠিক ক'রে দেব।

অহীন্দ্র বলিল, কাল ভোরে তা হ'লে এস তোমরা।

১১

ভোরবেলাতেই রংলাল সদলে আসিয়া ডাকাডাকি শুরু করিল। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া কাজ করার অভ্যাস মানদার চিরদিনের; সে কাজ করিতে করিতেই বিরক্ত হইয়া উত্তর দিল, কে গো তুমি? তুমি তো আচ্ছা নোক! এই ভোরবেলাতে কি ভদ্দরনোকে ওঠে নাকি? এ কি চাষার ঘর পেয়েছ নাকি?

রংলাল বিরক্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বরের মধ্যে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার করিয়া সে বলিল, ডেকে দাও, ছোটদাদাবাবুকে ডেকে দাও। জরুরী কাজ আছে।

কি, কাজ কি?

তুমি মেয়েছেলে নোক, তুমি সে বুঝবে না। জরুরী কাজ।

মানদার স্বর এবার রুক্ষ হইয়া উঠিল, সে বলিল, জরুরী কাজ আছে, তোমার আছে। আমার কি দায় পড়েছে যে, এই ভোরবেলাতে ঘুম ভাঙাতে গিয়ে বকুনি খাব? আর তুমি এমন ক'রে চেঁচিও না বলছি, ঘুম ভেঙে গেলে আমাকে বকুনি খেতে হবে।

রংলাল বুঝিল, মানদা মিথ্যা কথা বলিতেছে, একটু মাতব্বরি

করিবার চেষ্টা করিতেছে। অহীন্দ্রকে সে ভাল করিয়াই জানে, তিনি নিজেই তাহাকে ভোরবেলা ডাকিবার জন্য বলিয়া রাখিয়াছেন। মনে মনে একটু হাসিয়া সে কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া ডাকিল, ছোটদাদাবাবু! ছোটদাদাবাবু! ছোটবাবু!

দোতলার উপর হইতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং রুক্ষ স্বরে কে উত্তর দিল,— কে? কে তুমি?

সে কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য্যে রুক্ষতায় রংলাল চমকিয়া উঠিল, বুঝিল, কর্ত্তা রামেশ্বর অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়াছেন; ভয়ে সে শুকাইয়া গেল। তাহার সঙ্গে আরও যে কয়েকজন আসিয়াছিল, তাহারাও সভয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাড়ীর ভিতরে উঠান হইতে উত্তর দিল মানদা, বলিল, আমি বার বার বারণ করলাম দাদাবাবু, তা কিছুতেই শুনলে না। বলে, তুমি মেয়েছেলে লোক,— বুঝবে না, জরুরী কাজ।

এবার অহীন্দ্রের কণ্ঠস্বর বেশ বোঝা গেল, সে কণ্ঠস্বরে এখনও ঈষৎ অপ্রসন্নতার আভাস ছিল, অহীন্দ্র বলিল, ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। রংলাল বুঝি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই তো আসতে বলেছিলাম।

রংলাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, সে তখনও ভাবিতেছিল,— সে কণ্ঠস্বর ছোটদাদাবাবুর? অহীন্দ্রের এই পরিবর্ত্তিত স্বাভাবিক কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না।

অহীন্দ্র আবার বলিল, এই আমি এলাম ব'লে রংলাল। একটু অপেক্ষা কর।

কিছুক্ষণ পরই হাসিমুখে সে ভিতর হইতে কাছারির দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল। বারান্দায় একা রংলাল নয়, তাহাদের পুরনো নগ্দী নবীন লোহার এবং আরও দুই তিনজন রংলালের অন্তরঙ্গ চাষী অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। নবীনের হাতে হাত চারেক লম্বা থান

চারেক বাখারি, রংলালের হাতে এক আটি বাবুইদড়ি, অন্য একজনের হাতে গোটাচারেক লাল কাপড়ের পতাকা।

অহীন্দ্র দলটিকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, ওঃ, তোমরা তো খুব ভোরে এসেছ রংলাল ? আমি আবার ভোরে উঠতে পারি না। কিন্তু, ও লাল পতাকা কি হবে নবীন ?

রংলাল একটু আহত হইয়াছিল, সে কোন উত্তর দিল না। উত্তর দিল নবীন লোহার, তাহাদেব পুরনো নন্দী, আজ্ঞে, আজ আমাদের কায়েমী দখল হবে কিনা, তাই চার কোণে পুঁতে দিতে হবে।

কল্পনাটা অহীন্দ্রের খুব ভাল লাগিল, সে বলিল, বাঃ, সে বেশ হবে। চল এখন, বেলা হয়ে যাচ্ছে।

রংলাল ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, ঘুমটা আপনার এই সকালে ভাঙিয়ে দিলাম দাদাবাবু! ভারী ভুল হয়ে গেল মশাই, টুক্‌চে পরে ডাকলেই হ'ত।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, না না, সে ভালই হয়েছে রংলাল। হঠাৎ ঘুম ভাঙলেই আমার মেজাজ বড় খারাপ হয়ে যায়। তোমাদের কিছু বলি নি তো রংলাল ?

রংলাল এই টুকুতেই যেন জল হইয়া গেল, বলিল, আজ্ঞে না। সে আমরা কিছু মনে করি নাই। এখন চলুন, রোদ উঠলে তখন আবার ভারী কষ্ট হবে আপনার।

ক্ষুদ্র বাহিনীটি বাহির হইয়া পড়িল। রংলাল কিন্তু উসখুস করিতেছিল, তাহার কয়েকটা কথা এখনও বলা হয় নাই। কাল হইতেই কথাটা বলিবার সঙ্কল্প তাহার ছিল, কিন্তু অহীন্দ্রের কণ্ঠস্বর এবং রুক্ষতার আঘাতে সমস্তই কেমন উল্টাইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কথাটার ভূমিকারূপেই সে হাসিয়া বলিল, বুঝলে নবীন, এই যে কথায় বলে, বাঘের প্যাটে বাঘ হয়, সিংগী হয়, এ কিন্তু মিথ্যে লয়।

নবীন অর্থও বুঝিল না, উদ্দেশ্যও বুঝিল না, কিন্তু গম্ভীরভাবে কথাটাকে সমর্থন করিয়া বলিল, নিশ্চয়। অহীন্দ্র কৌতুকে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রংলাল বলিল, হাসবেন না দাদাবাবু, হাসির কথা লয়। আমার পিলুই ব'লে চমকে উঠেছিল! বুঝলে লবীন, দাদাবাবু হাঁকলেন, কে, কে তুমি? বললে না পেত্যয় যাবে ভাই, আমার ঠিক মনে হ'ল কর্ত্তাবাবু উঠে পড়েছেন—একবারে অবিকল।

নবীন বলিল, ইটি তুমি ঠিক বলেছ মোড়ল, অবিকল। আমিও ভেবেছিলাম ঠিক তাই।

রংলাল উৎসাহিত হইয়া বলিল, তাই তো বলছি হে, বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়। আমি এক-এক সময় ভাবতাম, আঃ দাদাবাবু কি ক'রে আমাদের জমিদার সেজে বসবে? তা সে ভাবনা আজ আমার গেল।

অহীন্দ্র গম্ভীরভাবে মাথাটি অল্প নীচু করিয়া নীরবে চলিতেছিল, মনে মনে লজ্জা অনুভব না করিয়া সে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল দেশ-বিদেশের কত মহাপুরুষের কথা। তাঁহাদের আদর্শের তুলনায় জমিদার! ছিঃ!

রংলাল আবার বলিল, সাঁওতালদের জমি আমি দেখেছি, মোটমাট তা তোমার বিঘে পঞ্চাশেক; তার বেশি হবে না। আর ধর আমাদের পাঁচজনের দশ বিঘে ক'রে পঞ্চাশ বিঘে, এই পঞ্চাশ বিঘে মাপতে আর কতক্ষণ লাগবে? পহরখানেক বেলা না হতেই হয়ে যাবে। অ্যাঁ, ও লবীন?

নবীন বলিল, তা বইকি। আমি তোমার চারখানা দাঁড়া নিয়ে এসেছি। চারজনাতে মাপলে কতক্ষণ?

রংলাল বলিল, বুঝলেন দাদাবাবু, আমরা পাঁচজনায় জমি নেবার

খবর একবার ছড়ালে হয় ; দেখবেন, গাঁয়ের যত চাষী সব একেবারে হুত্তো দিয়ে পড়বে।

অহীন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিল, তোমরাও জমি নেবে নাকি? কই, সে কথা তো বল নি?

রংলাল বলিল, এই দেখেন, ইয়ের মধ্যেই ভুলে গিয়েছেন দাদাবাবু? সেই দেখেন, পেথম দিনেই কাছারিতে আপনার সঙ্গে দেখা, আপুনি নিয়ে গেলেন বাড়ীতে, গিন্নীমায়ের কাছে। আমাদের চাষীরা সব রব তুলেছিল, জমি আমাদের, জমি আমাদের। আমিই তো আজ্ঞে ব'লে দিলাম, চক আফজলপুরের সঙ্গে লাগাড় হয়ে যখন চর উঠেছে, তখন আজ্ঞে, ও চর আপনাদের। ই আইন আমার বেশ ভাল ক'রে জানা আছে। তবে হ্যাঁ, ধর্ম্ম যদি ধরেন, ধরে না তো কেউ আজকাল, তা হ'লে অবশ্যি আমরাও পাই। গিন্নীমাও কথা দিয়েছিলেন, মনে ক'রে দেখেন।

অহীন্দ্র অনেক কিছু ভাবিতেছিল। ইহারা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য, এ সত্য সে অস্বীকার করিতেও চাহে নাই। সে বলিতে চাহিতেছিল, আজই যে সেই কথা অনুযায়ী বিলি-বন্দোবস্ত করা হইবে, এ কথা তো হয় নাই। ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে যে—সেলামি, খাজনা, পাট্টা, কবুলতি, অনেক কথা। সাঁওতালদের কথা স্বতন্ত্র। আজ তাহারা বসিয়াছে, দশ বৎসর, পনেরো বৎসর বা বিশ বৎসর পরে হয়তো তাহারা চলিয়া যাইবে। তাহাদের জমি জমিদারের খাসে আসিবে। আর ইহাদের স্বত্ব, বংশানুক্রমে দান বিক্রয় সকল রকমের অধিকার ইহারা কায়েমী করিয়া লইবে। তা ছাড়া, সাঁওতালেরাই ওই চরকে পরিষ্কার করিয়া ফলপ্রসবিনী করিয়াছে। তাহাদের দাবির সহিত কাহারও দাবি সমান হইতে পারে না।

রংলাল বলিল, জুতো খুলতে হবে না দাদাবাবু, আসুন, কাঁধে ক'রে আমি পার ক'রে দিই।

কালিন্দীর ঘাটে সকলে আসিয়া পড়িয়াছিল। অহীন্দ্র রংলালকে নিরস্ত করিয়া বলিল, থাক।—বলিয়া জুতা জোড়াটি খুলিয়া নিজেই তুলিয়া লইতেছিল।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রংলাল খপ করিয়া তুলিয়া লইয়া একরূপ মাথার উপর ধরিয়া বলিল, বাবা রে, আমরা থাকতে আপনি জুতো ব'য়ে নিয়ে যাবেন! সর্ব্বনাশ!

নদীর ওপারে চরের প্রবেশ-পথে সাঁওতালেরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহারাও সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিশোরবয়স্ক ছেলেগুলি পর্য্যন্ত আজ গরু-মহিষ ছাগল-ভেড়া চরাইতে যায় নাই।

রংলাল বলিল, ওঃ, ই যি ছা-ছামুড়ি পর্য্যন্ত হাজির রে সব! আজ তোদের ভারী ধূম, না কি রে মাঝি?

কমল মাঝি গম্ভীরভাবে বলিল, তা বেটে বৈকি গো। জমিগুলা আজ সব আমাদের হবে। রাজাকে সব খাজনা দিব, বোঙাকে পূজা দিব।

নবীন রংলালের দিকে চাহিয়া বলিল, দেখ, আমরা বলি সব বুনো বোঙার জাত। তা দেখ, বুদ্ধি দেখ। লক্ষণ-কল্যেণগুলি তো সব বোঝে ওরা!

মোড়ল মাঝি আবার বলিল, হুঁ, বুদ্ধি আছে বৈকি গো। লইলে ধরমটি আমাদের থাকবে কেনে? পাপ হবে যি।

নদীর জলে মুখ ধুইবার জন্য অহীন্দ্র একটু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, সে আসিয়া উপস্থিত হইতেই আলোচনাটা বন্ধ হইয়া গেল, অহীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল, তা হ'লে তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ কর, নইলে রোদ্দুর হবে।

মোড়ল মাঝি আপন ভাষায় কি বলিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই একটা ছেলে প্রকাণ্ড একটা ছাতা আনিয়া হাজির করিল। বাঁশের বাখারি ও শলা দিয়া তৈয়ারি কাঠামোর উপরে নিপুণ করিয়া গাঁথা শালপাতার ছাউনি; ছাউনির উপরে কোন্ গাছের বল্কলের সুতায় আলপনার মত কারুকার্য্য; অহীন্দ্র ছাতাটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল!

বলিল, বাঃ ভারী সুন্দর ছাতা তো মাঝি! তোমরা তৈরি করেছ?

হুঁ গো। আমরা সব করতে পারি গো বাবু। অনে—ক পারি। ই ছাতাটি তুর করলে যেঁয়ে আমার মাঝিন। আমি খুব বড়মানুষ কিনা, তাথেই ইটিও করলে এ—ত ব—ড়

* * *

প্রথমেই নবীন চরের চারিটি কোণ বাছিয়া চার কোণে লাল পতাকা চারিটা পুঁতিয়া দিয়া আসিল। তারপরেই আরম্ভ হইল জরিপ। দেশীয় মতে চার হাত লম্বা বাঁশের দাঁড়া দিয়া মাপ আরম্ভ হইল।

রংলাল বলিল, মাঝি, তু নাম বলে যা; দাদাবাবু আপুনি নিখে নিয়ে যান। শেষকালে যার যত হবে হিসাব ক'রে জমিজমা ঠিক করা যাবে।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সি কেনে গো, ইয়ার নাম উয়ার নাম, সি তুরা লিখে কি করবি? একেবারে লিখে লে কেনে

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, তা হ'লে কাকে কত খাজনা লাগবে, কার কত জমি, সে সব কেমন ক'রে ঠিক হবে মাঝি?

কমল বলিল, সি সব আবার আমরা ঠিক ক'রে লিব গো। আপন আপন মেপে ঠিক ক'রে লিব। তুদের হিসাবে আমরা সি বুঝতে লারব।

রংলাল, নবীন ও তাহাদের সঙ্গীরা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, কাজ

তাহাদের অনেক সহজ হইয়া যাইবে, টুকরা টুকরা জমি মাপিবার প্রয়োজন হইবে না, একেবারে সাঁওতালদের অধিকৃত জায়গাটা মাপিয়া লইলেই খালাস। সে মাপ শেষ হইলেই তখন তাহারা আপন আপন জমি মাপিয়া ঠিক করিয়া লইতে পারিবে। এইটুকুর জন্য অকারণে তাহাদের মনে যেন উদ্বেগ জমিয়া রহিয়াছে। রংলাল বলিল, সেই ভাল দাদাবাবু, ওদের ভাগ ওরা আপনারা আপনারা ক'রে লেবে। আপনার ইস্টেটে থাকুক এক নামে একটা জমা হয়ে। সি আপনার ভাল হবে।

কাঠের পুতুল-নাচের ওস্তাদ আসিয়া মোড়ল মাঝিকে কি বলিতেছিল। তাহার বক্তব্য শেষ হইতে না হইতেই কমল মাঝি যেন ফুলিয়া আয়তনে বড় হইয়া উঠিল, দেহচর্ম্মে বার্দ্ধক্যজনিত যে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা দিয়াছিল, দেহস্ফীতির আকর্ষণে সে কুঞ্চন যেন মিলাইয়া গেল। ওস্তাদের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কমল তাহার গালে প্রচণ্ড জোরে একটা চড় বসাইয়া দিল। মুখে বলিল, সামান্য দুইটি কথা, সে কথা দুইটার মধ্যেও দুর্দ্দান্ত ক্রোধের স্বর রনরন করিতেছিল। লোকটা চড় খাইয়া বসিয়া পড়িল, সমবেত সাঁওতালদের মুখ দেখিয়া মনে হইল, ভীষণ ভয়ে তাহারা সঙ্কুচিত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। কমল মাঝি তখনও ক্রোধে ফুলিতেছিল। আকস্মিক এমন পরিণতিতে স্তম্ভিত হইয়া অহীন্দ্র নীরবেই কারণ অনুসন্ধানের জন্য চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কমল মাঝির ভয়ঙ্কর রূপ আর চারিদিকে সকলের মুখে ভয়ের সুস্পষ্ট ছাপ ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাইল না। রংলাল, নবীন ও তাহাদের সঙ্গের লোকগুলি পর্য্যন্ত ভয় পাইয়াছে। অহীন্দ্র কমল মাঝির দিকেই চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কি কমল, হ'ল কি? ওকে মারলে কেন?

এই মূর্ত্তিতেও কমল যথাসাধ্য বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, আজ্ঞে

রাজাবাবু, মানুষটা দুষ্টু করছে। বুললে, আমি মোড়ল-টোড়ল মানি না।

সবিস্ময়ে অহীন্দ্র বলিল, কেন ?

এবার প্রহৃত ওস্তাদ হাতজোড় করিয়া করুণ কণ্ঠে সভয়ে বলিল, আজ্ঞে রাজাবাবু, দোষ আমার হইছে, দোষটি আমার হইছে। আমি বুললাম জমি সব আলাদা আলাদা ক'রে দিতে। আমরা সব চ্যাকলিব্ব্যাধি আলাদা আলাদা ক'রে লিব বুললাম। তাতেই আমি মোড়লের মানটি খারাপ করলাম। দোষটি আমার হ'ল।

কমল আপন ভাষায় গজগজ করিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল, সুরে বোঝা গেল সে ঐ ওস্তাদকে তিরস্কার করিতেছে। কিন্তু তবুও সে দুর্দান্ত কমল আর নাই! কমলের কথা শেষ হইতেই চারিপাশের মেয়ের দল কলকল করিয়া বকিতে আরম্ভ করিল, সেও ঐ লোকটিকে তিরস্কার করিয়া মোড়লকে সমর্থন করিয়া।

অহীন্দ্র বলিল, তা হ'লে তোমাদের সমস্ত জমি একসঙ্গে জরিপ হবে তো ?

হুঁ, আমার নামে লিখে লে কাগজে, টিপছাপ লিয়ে লে আগে। বুলে দে, খাজনা কত হবে, আমরা সব মিটায়ে দিব। তবে, ঐ যি আপনার কি বুলিস গো, সালামী না কি, উ আমরা লারব দিতে। আমি সব ইয়াদের কাছে আদায় ক'রে খাজনা আপোনার কাছারিতে দিয়ে আসব।

নবীন এতক্ষণে সাহস পাইয়া হাসিয়া বলিল, তু তা হ'লে এদের জমিদার হলি, তোর আবার জমিদার হ'ল আমাদের দাদাবাবু না কি ?

উঁ—হুঁ। আমি মোড়ল হলাম, রাজা বেটে—জমিদার বেটে আমাদের রাঙাবাবু।

মাপ আরম্ভ হইল, রাম দুই তিন চার···আড়ে হ'ল গা এক শ' চল্লিশ দাঁড়া।

নবীন ও রংলাল দুইজনে মিলিয়া জমিটার কালি করিয়া পরিমাণ খাড়া করিল, চল্লিশ বিঘা কয়েক কাঠা হইল। অহীন্দ্র বিশেষ মনোযোগ দিয়া হিসাবের পদ্ধতিটা দেখিতেছিল। ছেলেবেলায় পাঠশালায় পড়া বিঘাকালির আর্য্যার সুরটা যেন অস্পষ্টভাবে কানে বাজিয়া উঠিল, 'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্যে, কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্যে।'

রংলাল্ বলিল, তা হ'লে তোদের এখন এই জমি হ'ল মাঝি, চল্লিশ বিঘে, ক কাঠা না হয় ছেড়েই দিলাম। লে, এখন দাদাবাবুর সঙ্গে খাজনা ঠিক ক'রে লে।

কমল অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, হাঁ রাঙাবাবু, আপুনি এবার হিসাব জুড়ে দেখ্।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, ঠিক আছে মাঝি।

না, আপুনি একবার দেখ্।

দেখেছি।

না, আপুনি একবার লিজে দেখ্।

অগত্যা অহীন্দ্রকে কাগজ কলম লইয়া বসিতে হইল। তাহার চারিপাশে সাঁওতালরা গম্ভীর হইয়া বসিল, সকলের উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি অহীন্দ্রের উপর। ছেলেমেয়েরা কথা বলিতেছিল, মোড়ল মাঝি গম্ভীরভাবে আপন ভাষায় আদেশ করিল, চুপ, চুপ সব, চুপ। রাঙাবাবু হিসাব করিতেছেন, মাটির হিসাব, জরিপের হিসাব।

পাড়ার মধ্যে কয়েকটি তরুণী আঙিনায় বসিয়া মৃদুস্বরে গুনগুন করিয়া গান করিতেছিল—

চেতান দিশ্ মরেণ্ অ্যামিন্ বাবু,
লাতার দিশমরে আড়গুএনা,

জমি-কিন্ সংইদা—
জমা কিন্ চ্যাপাওইদা
গরিব হড় ও কারে অ্যাম—আঃ।

অর্থাৎ পাহাড়ের উপর হইতে আমিনবাবু আসিয়াছেন, জমি মাপ করিতেছেন, জমা বাড়াইয়া দিতেছেন, কিন্তু আমরা গরিব লোক, আমরা কোথায় পাইব ?

একটি মেয়ে বলিল, ই গান বুলতে হবে রাঙাবাবুকে।

কমলের নাতনী বলিল, হুঁ বুলব। বেশী ক'রে খাজনা লিবে কেনে রাঙাবাবু? যাব আমরা উয়ার কাছে।

এখুনি।

উঁ-হুঁ মোড়ল মাঝি ক্ষেপে যাবে। বাবা রে!

তবে ?

বিকালে আমরা ডাকব বাবুকে। হাঁড়িয়া জম করব, লাচব। উয়াকে ডেকে আনব।

নিতান্ত আকস্মিকভাবেই একটি মেয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, কেমন বরন বল্ দেখি রাঙাবাবুর? রাঙা লাল ঝক ঝক করছে!

কমলের নাতনী বলিল, আগুনে—র পারা! রাঙাঠাকুরের লাতি, উ ঠাকুর বেটে।

একটি মেয়ে কি উত্তর দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু আবার মোড়ল মাঝির ক্রুদ্ধ চীৎকারে তাহারা চমকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

এবার বচসা হইতেছিল কমল মাঝির সহিত রংলাল এবং নবীনের দলের। সাঁওতালদের জমির পরই পূর্ব্ব দিকে প্রায় বিঘা পঞ্চাশেক চর পড়িয়া আছে, সেই জমিটা পছন্দ করিয়া রংলাল এবং নবীন

মাপিতে উদ্যত হইল। কমল মাঝি বলিল, উ জমি তুরা লিবি না মোড়ল, উ আমি দিব না।

রংলাল বিরক্তির সহিত বলিল, দিবি না? কেন?

আমরা তবে আর জমি কুথাকে পাব? আমাদের ছেলেগুলো কি করবে?

তাদের আবার ছেলে হবে, তাদের ছেলে হবে, তাই ব'লে গোটা চরটাই তোরা আগলে থাকবি নাকি? মাপ হে, মাপ নবীন, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?

নবীন মাপিতে উদ্যত হইবামাত্র কমল তাহার হাতের দাঁড়া চাপিয়া ধরিয়া ক্রুদ্ধ উচ্চ চীৎকারে বলিয়া উঠিল, না, দিব না।

রংলালও এবার যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। এই পূর্ব্ব দিকের চরের মাটি সকল দিকের মাটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ভাঙিলে ভুরার মত গুঁড়া হইয়া যায়, ভিতরের বালির ভাগ ময়দার মত মিহি, আলু ও আখের উপযোগী এমন মাটি আর বুঝি হয় না। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, এই দেখ মাঝি, ফাটাফাটি হয়ে যাবে বলছি! খবরদার, তুই দাঁড়া ধরিস না বললাম।

একটা ভয়াল হিংস্র হাসি হাসিয়া কমল বলিল, তুকে ধ'রে আমি মাটিতে পুঁতে দিব।

বার বার এমন অবাঞ্ছনীয় ঘটনার উদ্ভব হওয়ার জন্য অহীন্দ্রের মনে আর বিরক্তির সীমা রহিল না। সে তাহার কিশোর কণ্ঠের তীক্ষ্ণ কঠিন স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, ছাড়, ছাড় বলছি, ছাড়।

কমল এবং রংলাল দুইজনেই এবার সরিয়া দাঁড়াইল।

অহীন্দ্র বলিল, অন্যদিকে জমি পছন্দ ক'রে মেপে নাও নবীন। এ জমি তোমরাও পাবে না, সাঁওতালরাও পাবে না। এদিকটা আমাদের খাসে থাকবে। খাসে চাষ হবে আমার!

জমির মাপ-জোক শেষ করিয়া অহীন্দ্র ফিরিবার সময় বলিল, দেখো, আর যেন ঝগড়া ক'রো না।

একজন মাঝি ছাতাটা লইয়া তাহার সঙ্গে গেল, জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে তখন আগুন ঝরিতে সুরু করিয়াছে। সেই রৌদ্রের মধ্যেই রংলাল, নবীন এবং তাহার সঙ্গী কয়েকজন আপন আপন সীমানা চিহ্নিত করিয়া চারি কোণে চারিটা মাটির ঢিপি বাঁধিতে সুরু করিয়া দিল। সাঁওতালেরা আবার দল বাঁধিয়া আপনাদের হিসাবমত জমি ভাগ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিয়া জলহীন কঠিন মাটিতে কোপ মারিতে মারিতে রংলাল বলিল, থাক শালারা, ক দিন তোরা এখানে থাকিস, সেও তো আমি দেখছি!

১২

সেই দিনই অপরাহ্ণে সাঁওতালেরা খাজনার টাকা পাই পয়সা হিসাব করিয়া মিটাইয়া দিল। কিন্তু গোল বাধাইল রংলাল-নবীনের দল। তাহারাও ধরিয়া বসিল, খাজনা ছাড়া সেলামি তাহারা দিতে পারিবে না। সাঁওতালেরা যখন সেলামি দিতে রেহাই পাইয়াছে, তখন তাহারাই বা পাইবে না কেন? সাঁওতালদের চেয়েও কি তাহারা চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পর? অহীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। রংলাল-নবীনের যুক্তি খণ্ডন করিবার মত বিপরীত যুক্তি খুঁজিয়া সে সারা হইয়া গেল। অনেকক্ষণ নীরবে উত্তরের অপেক্ষা করিয়া রংলাল বলিল, দাদাবাবু, তাহ'লে হুকুমটা ক'রে দেন আজ্ঞে।

অহীন্দ্র কিন্তু সে হুকুমও দিতে পারিল না। বিঘা পিছু পাঁচ টাকা সেলামি আদায় হইলেও পঞ্চাশ বিঘার আড়াই শত টাকা আদায়

হইবে। তাহাদের সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা সে শুধু চোখেই দেখিতেছে না, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। তাহার মা যখন রান্নাশালে বসিয়া আগুনের উত্তাপ ভোগ করেন, তখন সেও গিয়া উনানের কাছে বসিয়া উনানে কাঠ ঠেলিয়া দেয়। সে যে কি উত্তাপ, সে তো তাহার অজানা নয়। উত্তাপ ও কষ্টের কথা ছাড়িয়া দিয়াও তাহার মাকে নিজে হাতে রান্না করিতে হয়—ইহারই মধ্যে কোথায় আছে অসহনীয় অপরিসীম লজ্জা, যাহার ভারে তাহার মাথা হেঁট হইয়া পড়ে, তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসে। তাহার মা অবশ্য বলেন, যখন যেমন তখন তেমন। না পারলে হবে কেন? অম্লান হাসিমুখেই তিনি বলেন। কিন্তু তাহার মনে পড়ে কালিন্দী নদীর বানের জল আটক দিবার জন্য ঘাসের চাপড়া বাঁধা বাঁধটার কথা; বাঁধটার ও-পারে থাকে অথই জল, আর এ-পারে বাঁধের গায়ে সবুজ ঘাস যেমন হাসিতে থাকে, তেমনই তাহার মায়ের মুখের সুশ্যাম হাসির ও-পারে আছে অথই দুঃখের বন্যা; কালিন্দীর বন্যায় ভাটা পড়ে, বর্ষার শেষে সে শুকাইয়া যায়, কিন্তু মায়ের বুকের দুঃখের বন্যা শুকায় না, ও যেন শুকাইবার নয়। এ-ক্ষেত্রে কেমন করিয়া সে এতগুলি টাকা ছাড়িয়া দিবে?

নবীন বলিল, তা পাঁচ টাকা ক'রে জনাহি লজর কিন্তুক দিতে হবে মোড়ল। তা লইলে সেটা ধর আমাদেরও অপমান। সাঁওতালরা না হয় দেয় নাই, ওরা ছোট জাত। আমাদিগে তো রাজার সম্মান একটা করতে হয়।

রংলাল বার বার ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বলিল, এ তুমি একটা কথার মত কথা বলছ লবীন। লেন, লেন তাই হ'ল দাদাবাবু, পঞ্চাশ বিঘের খাজনা আপনার এক শ টাকা, আর পাঁচ টাকা ক'রে পাঁচজনের লজর পঁচিশ টাকা, এক শ পঁচিশই আমরা দিছি। সেও আপনার এক থাবল টাকা গো।

অহীন্দ্রের মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, ইহাদের কথার ভঙ্গীতে সে যেন একটি ধারাবাহিক গোপন ষড়যন্ত্রের সূত্র দেখিতে পাইল, ইহারা তাহাকে ঠকাইবার জন্যই আসিয়াছে। তাহার উপর শেষের কয়টি কথা—'একথাবল টাকা,' অর্থাৎ দুই হাতের মুঠিভরা টাকা—এই টাকা কযটির মধ্যে তাহাকে প্রলোভন দেখানোর সুর সুস্পষ্ট। তাহার ক্রোধ ও বিরক্তির আর সীমা রহিল না। সে দৃঢ় কঠোর স্বরে বলিল, জমি বন্দোবস্ত এখন হবে না, আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে কিছু করতে পারব না।

রংলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশ, তা হ'লে আমরা এখন ভেঙেচুরে জমি তৈরি করি, তারপর লেবেন খাজনা আপনারা।

তার মানে ?

কথাটার মানে অত্যন্ত স্পষ্ট, বন্দোবস্ত করা হউক বা না হউক, জমি তাহারা দখল করিবেই। অকারণে খানিকটা মাথা চুলকাইয়া লইয়া রংলাল বলিল, ওই যে বললাম গো, আমরা জমি-জেরাত হাসিল করি, তারপর লেবেন খাজনা। আর এখন যদি লেবেন তো তাও লেন, আমরা তো দিতেই রাজী হয়েছি।

অত্যন্ত ক্রোধে অহীন্দ্রের মাথাটা কেমন করিয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণে সে-ক্রোধ মনের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া নির্ব্বাক হইয়া সে বসিয়া রহিল।

রংলাল একটি প্রণাম করিয়া বলিল, তা হ'লে আমরা চল্‌লাম দাদা বাবু। যখুনি ডাকবেন, তখুনি আমরা খাজনার টাকা এনে হাজির করে দেব। চল হে, চল সব। সন্ধ্যে হয়ে এল, চল।

অহীন্দ্র কথা বলিল না, হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতেই জানাইয়া দিল, যাও, তোমরা চলিয়া যাও। ইহাদের উপস্থিতিও সে যেন আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। রংলাল ও নবীনের দল একে একে প্রণাম সারিয়া

চলিয়া গেল, অহীন্দ্র একাই নির্জ্জন স্তব্ধ কাছারি-বাড়ীর দাওয়ায় তক্তাপোশের উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিল। কার্নিশের মাথায় কড়িকাঠের উপরে বসিয়া সারি সারি পায়রার দল গুঞ্জন করিতেছে। সামনের খোলা মাঠটার উপর সারিবদ্ধ নারিকেলের গাছ, তাহারই কোন একটার মাথায় আত্মগোপন করিয়া একটা পেঁচা আসন্ন সন্ধ্যার আনন্দে কুক কুক করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘরের ভিতর হইতে অন্ধকার নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিতেছে শোকাচ্ছন্না বিধবার মত। এত বড় বাড়ীটার কোথাও এক কণা আলোকের চিহ্ন নাই, কোথাও একটা মানুষের সাড়া নাই, শুধু সিঁড়ির পাশেই দুই দিকে দুইটা সুদীর্ঘশীর্ষ ঝাউগাছ অবিরাম সন সন শব্দ করিতেছে, সে শব্দ শুনিয়া মনে হয়, যেন এই অনাথা বাড়ীটাই বুকফাটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে। অথচ একদিন নাকি হাসিতে কোলাহলে আলোকে গাম্ভীর্য্যে বাড়ীখানা অহরহ গমগম করিত। মাথা হেঁট করিয়া হাতজোড় করিয়া প্রজারা সভয়ে অপেক্ষা করিয়া থাকিত এ বাড়ীর মালিকের মুখের একটি কথার জন্য। আর আজ একজন চাষী প্রজা বলিয়া গেল, সম্মতি দেওয়া হউক বা না হউক, জোর করিয়া তাহারা জমি দখল করিবেই! অহীন্দ্র একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তারপর তক্তাপোশটার উপরে নিতান্ত অবসন্নের মত শুইয়া পড়িল। তাহার মাথা ধরিয়া উঠিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর মানদা এক হাতে ধূপদানি ও প্রদীপ, অন্য হাতে একটি জলের ঘটি লইয়া কাছারি-বাড়ীতে প্রবেশ করিল। দুয়ারে চৌকাঠে চৌকাঠে জল ছিটাইয়া দিয়া ধূপ ও প্রদীপের আলো দেখাইতে দেখাইতে সে দেখিল, অহীন্দ্র ছেঁড়া শতরঞ্জি-ঢাকা তক্তাপোশটার উপর চোখ বুজিয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এমন নির্জ্জন কাছারির বারান্দায়,

ওই ময়লা ছেঁড়া শতরঞ্জির উপর, এই অসময়ে ছোটদাদাবাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন! সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাও হইল, কোন অসুখ-বিসুখ করে নাই তো? গায়ে হাত দিয়া দেখিতে সাহস হইল না, কি জানি, যদি ঘুম ভাঙিয়া যায় অনর্থ হইবে, হয়ত চীৎকার করিয়া উঠিবেন। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে ত্রস্ত গতিতে বাড়ীতে গিয়া ডাকিল, মা!

সুনীতি কাপড় কাচিয়া রামেশ্বরের ঘরে আলো জ্বালিয়া দিবার জন্য উপরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। মানদার ডাকে বাধা পাইয়া বিরক্তির সহিতই বলিলেন, যখন-তখন কেন পেছন ডাকিস মানদা? জানিস, আমি এবার ওপরে আলো জ্বালতে যাব।

মানদা বলিল, ডাকি কি আর সাধ ক'রে মা? ছোটদাদাবাবু এই ভরসন্ধ্যেবেলা কাছারির বারান্দায় সেই ছেঁড়া শতরঞ্জির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে, অসুখ করেছে।

অসুখ করেছে?

করবে না? ওই দুধের ছেলে, এই জ্যৈষ্ঠ মাসের আগুনের হল্কা রোদ, এই রোদে চর মাপতে গেল। তার ওপর এই সাঁওতালরা আসছে, এই তোমার সদ্‌গোপরা আসছে, কিচির-মিচির চেঁচামেচি। যান বাপু, আপনি গিয়ে উঠিয়ে বাড়ী নিয়ে আসুন। আমি বাপু ডাকতে পারলাম না ভয়ে।

সুনীতি বলিলেন, তুই আমার সঙ্গে আয়। আমি একলা কেমন ক'রে কাছারি-বাড়ীতে যাব?

তুলসীর মন্দিরের উপর প্রদীপ ও ধূপদানি রাখিয়া দিয়া মানদা বলিল, ঘরের ভিতর দিয়ে চলুন, বাইরের রাস্তায় কি জানি যদি কেউ থাকে!

অহীন্দ্রের কপালে হাত দিয়া আশ্বস্ত হইয়া সুনীতি বলিলেন, কই,

না, জ্বর তো হয় নি। অহীন্দ্র স্পর্শেই বুঝিয়াছিল, এ তাহার মায়ের হাত। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, মা! কি মা?

কিছু নয় অহি। এই অসময়ে এখানে শুয়ে কেন বাবা?

এমনি মাথাটা একটু ধরেছে, কেমন মনটাও একটু খারাপ হয়ে গেল; তাই একটু শুয়েছিলাম।

সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে সুনীতি বলিলেন, মাথা কেন ধরল রে, মনই বা খারাপ কেন হ'ল?

সত্য গোপন করিয়া অহীন্দ্র বলিল, কি জানি! তারপর সে আবার বলিল, এই সন্ধ্যের অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই, এত বড় বাড়ী—মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল মা। অথচ, গল্প শুনেছি, রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত নাকি এখানে লোকে গিসগিস করত।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, নীরবে তিনিও একবার অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়ীখানার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। মানদা তাড়াতাড়ি বলিল, আমি আলো আনছি দাদাবাবু, আপনি আলো নিয়ে কাছারিতে বসুন কেনে। দু'চারজনা বন্ধু-টন্ধু নিয়ে দিব্যি গল্প-গুজব করুন। তাস-টাস খেলুন।

অহীন্দ্র হাসিল, কিন্তু কথার কোন উত্তর দিল না। সুনীতি বলিলেন, এই বাড়ীর মানমর্য্যাদা এখন সবই তোর ওপর নির্ভর করছে বাবা। ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখে তুই মানুষ হ'লে তবে এই দুঃখ ঘুচবে অহি।

মানদা সেই ভোরবেলা হইতেই আজ রংলাল-নবীনের দলের উপর বিরক্ত হইয়াছিল। সে বলিল, হ্যাঁ বাপু। তখন সেই ভোর-বেলাতে কই সব চাষার দল এসে ডাকুক দেখি, দেখব। গরম কত সব! ডাকছ কেনে গো, না, সে তুমি বুঝবে না। আমি আজ ব'লে বিশ বছর জমিদারের ঘরে চাকরি করছি, আমি বুঝব না?

ওই ভোরে উঠেই আপনার মাথা ধরেছে, তার ওপর এই রোদ আর ঝলা।

সুনীতি বলিলেন, একটুখানি নদীর ধারে বাতাসে বেড়িয়ে আয় বরং। আকাশে চাঁদ উঠেছে, মনটাও ভাল হবে, খোলা বাতাসে মাথাও অনেক হাল্কা হবে। আমি যাই, বাবুর ঘরে আলো দেওয়া হয় নি। মানদা, উনোনে আগুন দিয়ে দে মা।

অহীন্দ্রের মনের ভার অনেকটা হাল্কা হইয়াছিল, মায়ের ওই কথা কয়টিতে সে মনের মধ্যে একটা উৎসাহ অনুভব করিল, সে মানুষ হইলে তবে এই দুঃখ ঘুচিবে। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতেই সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার দাদার কথা মনে পড়িল, তাহাকে এম. এ. পর্য্যন্ত যেন পড়ানো হয়। যেমন-তেমন ভাবে এম. এ. পাস করিলে তো হইবে না, খুব ভালভাবে পাস করিতে হইবে। ফার্স্ট হইতে পারিলে কেমন হয়—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট!

নদীর ধারে আসিয়া মাদলের শব্দে ও সাঁওতাল-মেয়েদের গানের সুরে তাহার চিন্তার একটানা ধারাটা ভাঙিয়া গেল। ও-পারের চরে আজ প্রবল সমারোহে উৎসব চলিয়াছে। আজ তাহারা জমিদারকে খাজনা দিয়া রসিদ পাইয়াছে, জমি তাহাদের নিজের হইয়াছে, আজিকার দিন তাহাদের একটি পরমকাম্য শুভদিন, তাহাদের দেবতাকে তাহারা পূজা দিয়াছে। পাঁচটি লাল রঙের মুরগী, একটি লাল রঙের ছাগল বলি দিয়া নাকি পূজা হইয়াছে, তাহার পর আকণ্ঠ পচুই মদ খাইয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। অদ্ভুত জাত!

আকাশে শুক্লাসপ্তমীর আধখানা চাঁদ কালিন্দীর ক্ষীণ স্রোতের মধ্যে এক অপরূপ খেলা খেলিতেছে। রে দূকালিন্দীর ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায় চাঁদ যেন জলে গলিয়া গিয়াছে, ঝিকমিক করিয়া নাচিতেছে চাঁদ-গলানো জলের ঢেউ। দূরে এ-পাশে কালিন্দীর জল, যেন

একখানা অখণ্ড রূপার পাত। সম্মুখেই পায়ের কাছে চাঁদ কালিন্দীর স্রোতের তলে ছেঁড়া একগাছি চাঁদমালার মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া লম্বা হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। সাদা সাদা টিটিভ পাখীগুলি জলস্রোতের ও-পারে বালির উপর ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, কখনও কখনও একটা অন্যের তাড়ায় খানিকটা উড়িয়া আবার দূরে গিয়া বসিতেছে। দূর আকাশে একটা উড়িয়া চলিয়াছে আর ডাকিতেছে, হট্টি-টি—হট্টি-টি। নদীর বালুগর্ভের উপর অবাধ শূন্যতল স্বচ্ছ কুয়াসার ন্যায় জ্যোৎস্নায় মোহগ্রস্তের মত স্থির নিস্পন্দ! অহীন্দ্র নদীস্রোতের কিনারায় চুপ করিয়া বসিল। সহসা তাহার মনে হইল, কোথায় কাহারা যেন কথা কহিতেছে! স্বর ভাসিয়া আসিতেছে, ভাষার শব্দ ঠিক ধরা যায় না। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বেশ সাড়া দিয়াই প্রশ্ন করিল, কে? উত্তর কেহ দিল না, উপরন্তু কথার শব্দও নিস্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাহার নজরে পড়িল স্রোতের ও-পারে বালির উপর দুইটি সচল মূর্ত্তি। কিছুক্ষণ পরেই আবার কথার শব্দ আরম্ভ হইল।

অহীন্দ্র কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না, অগভীর জলস্রোত পার হইয়া এ-পারে বালির উপর আসিয়া উঠিল। বালিতে বালিতে খানিকটা আগাইয়া আসিয়া সে কথার ভাষা বুঝিতে পারিল, সাঁওতালদের ভাষা; এবং গলার স্বরে বুঝিল, তাহারা দুইজনেই স্ত্রীলোক; সুরে মনে হইল, কোন একটা বচসা চলিয়াছে। সে ডাকিল, কে?

যাহারা কহিতেছিল, তাহারা দুইজনেই ঈষৎ চকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। একজন সবিস্ময়ে আপনাদের ভাষায় কি বলিয়া উঠিল, তাহার মধ্যে একটি কথা অহীন্দ্র বুঝিতে পারিল, রাঙাবাবু! তাহাকে চিনিতেও অহীন্দ্রের বিলম্ব হইল না, তাহার দীর্ঘ দেহখানিই তাহাকে চিনাইয়া দিল। সে কমল মাঝির নাতনী। অপর জন তাহার দিকে

আগাইয়া আসিতেই তাহাকেও অহীন্দ্র চিনিল, সে বৃদ্ধা সর্দার কমল মাঝির স্ত্রী। বৃদ্ধা অহীন্দ্রকে দেখিয়া যেন কত আশ্বস্ত হইয়া ভাঙা বাংলায় একটানা স্বরে বলিল, দেখ্ রাঙাবাবু, দেখ্। মেয়েটা আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। আবার বলিতেছে, এ-ঠাঁই ছাড়িয়া ও চলিয়া যাইবে।

তরুণী নাতনী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কেনে, ঝগড়া করবে না কেনে? চ'লে যাবে না কে তু বাবু, বিচার ক'রে দে। বুড়া-বুড়ীর করণ দেখ্।

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, কি, হ'ল কি তোদের? ছি, মাঝিন, বুড়ী দিদিমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আছে?

বুড়ী খুব খুশি হইয়া উঠিল, দেখ্ বাবু, আপুনি দেখ্।

অহীন্দ্র বলিল, যা মাঝিন, বাড়ী যা; নাচ হচ্ছে, গান হচ্ছে পাড়াতে, যা, নাচ-গান করগে।

কেনে গান করবে? কেনে নাচ করবে? উয়ারা বুড়া-বুড়ীতে নাচ-গান করবে। উয়ারা জমি পেলে, উয়ারা নাচবে। আমাদিগে দিলে না কেনে?

অহীন্দ্র বৃদ্ধাকে প্রশ্ন করিল, কি, হ'ল কি মাঝিন, তুই বল্ তো শুনি?

বৃদ্ধা যাহা বলিল, তাহা এই।—মেয়েটির শীঘ্রই বিবাহ হইবে। সর্দ্দার বলিতেছে, তোমরা আমাদের কাছে থাক, খাট, খাও, আমি তোমাদের ভরণ-পোষণ করিব। কিন্তু মেয়েটি সে-কথা কোনমতেই শুনিবে না। সে স্বতন্ত্র ঘর বাঁধিতে চায়, নিজস্ব জমি চায়। সেই জমি না পাইয়া সে এমন করিয়া রাগ করিয়াছে। ঝগড়া করিতেছে।

তরুণী নাতনীটি এইবার দুই হাত ন্যাড়িয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল, তুরা জমি লিবি, তুদের ধান হবে, কোলাই হবে, ভুট্টা হবে, তুরা

সব ঘরে ভরবি। আমরা কি করব তবে? আমাদের ঘর হবে না, বেটা-বেটী হবে না? উয়ারা কি খাবে তবে? কেনে আমরা তুদের জমিতে খাটব?

অহীন্দ্রের হাসি পাইল, আবার বেশ ভাল লাগিল; এই তরুণী কিশোরী মেয়ে, এখনও বিবাহ হয় নাই, হইবে প্রত্যাশায় ঘর-দুয়ার সন্তান-সন্ততি সম্পত্তির আয়োজনে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! মৃদু হাসিয়া সে বলিল, ওঃ, মাঝিন আমাদের পাকা গিন্নী হবে দেখছি! এখন থেকেই ঘরকন্নার ভাবনায় পাগল হয়ে উঠেছিস্!

বৃদ্ধা অহীন্দ্রের সুরে সুর মিলাইয়া বলিল, হ্যাঁ, তাই দেখ্ কেনে আপুনি। উয়ার একেবারে শরম নাই।

তরুণীটি এবার আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তড়বড় করিয়া এক রাশ কথা বলিয়া গেল। অহীন্দ্র অনেক কষ্টে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিল সে বলিতেছিল, শরম তোদের নাই বুড়া-বুড়ী, তোরা সকলকে জমি না দিয়া নিজেরা অধিক অংশ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিস? অহীন্দ্র একটু বিস্ময় অনুভব করিল, কমল মাঝির নিজের নামে জমি লওয়ার মধ্যে এমন মতলবের কথা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে বৃদ্ধের স্ত্রীকে বলিল, না, না। ছি ছি, এমন কেন করলি তোরা মাঝিন?

বৃদ্ধা সবিনয়ে বলিল, জমি সকল বয়স্ক মাঝিকেই দেওয়া হইয়াছে, এই তরুণ-বয়স্কদের দেওয়া হয় নাই। উহারা এখন জমি লইয়া কি করিবে? উহাদের জোয়ান বয়স—এখন খাটিয়া পয়সা উপার্জ্জনের সময়। পরে উহারা সেই পয়সায় জমি কিনিবে, বুড়ারা মরিয়া গেলে পাইবে, এই তো নিয়ম। তাহারা বুড়া-বুড়ী কিছু জমি বেশি লইয়াছে, ইহাও সত্য। কিন্তু রাঙাবাবু, তাহারা যে মোড়ল—সর্দ্দার, সকলের অপেক্ষা বেশি না পাইলে চলিবে কেন তাহাদের? সম্মান

থাকিবে কেন? আর রাঙাবাবু যে অনেকটা জমি নিজের জন্য রাখিয়া দিলেন, নহিলে সকলকেই তাহারা দিত। এই সামান্য জমির ভাগ কেমন করিয়া এতগুলি লোককে দেওয়া যায়?

ওই মেয়েটির এই গিন্নীপনার আগ্রহ অহীন্দ্রের বড় ভাল লাগিয়াছিল, সে একটু চিন্তা করিয়া বলিল, এক কাজ কর্ মাঝিন। তোর হবু বরকে পাঠিয়ে দিস, আমি যে-জমিটা নিজের জন্যে রেখেছি, তারই খানিকটা তাকে ভাগে বিলি ক'রে দেব। আরও যে যে চায়, দেব। তারপর হাসিয়া বলিল, কেমন, এইবার তোদের ঝগড়া মিটল তো?

বৃদ্ধা বলিল, হুঁ বাবু, মিটল। সব মাঝি ভারি খুশি হবে। কাল সব যাবে আপোনার কাছে। উয়াদিগে অপুনি জমি ভাগে দিবি, নাম লিখে লিবি।

তরুণীটি বলিল, আমাদিগে ভাগীদারের সদ্দার ক'রে দিবি বাবু। উ মরদটা তুর সব দেখে দিবে, আমি তুদের ঘরে পাট-কাম ক'রে দিব। হোক!

মেয়েটির আনন্দের আগ্রহে অহীন্দ্র খুশি হইয়া উঠিল, বলিল, তাই ক'রে দেব।

আনন্দে কলরব করিয়া মেয়েটি এবার হাসিয়া উঠিল। অহীন্দ্র বলিল, যা, এইবার ঘরে যা, নাচ-গান কর্ গিয়ে।

আপুনি যাবিন না বাবু?

না, অনেকটা রাত্রি হয়ে গেল, আমি বাড়ী চললাম।

অহীন্দ্র জলের স্রোতটা পার হইয়া এ-পারে উঠিয়াছে, এমন সময় আবার পিছনে কে ডাকিল, বাবু! রাঙাবাবু! অহীন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইল, দেখিল একটি মূর্তি ছুটিয়া তাহার দিকেই আসিতেছে। সেই মেয়েটিই ছুটিয়া আসিতেছে।

ফুল লিয়ে যা বাবু, তুর লেগে ফুল আনলম। এক আঁচল কুরচির ফুল লইয়া মেয়েটি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

সরল অশিক্ষিত জাতির তরুণীটির কৃতজ্ঞতায় অহীন্দ্রের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল, সে দুই হাত পাতিয়া বলিল, দে। মেয়েটি আঁচল উজাড় করিয়া ফুল ঢালিয়া দিল, অহীন্দ্রের হাতের অঞ্জলিতে এত ফুল ধরিবার স্থান ছিল না, অঞ্জলি উপচিয়া ফুল বালির উপর পড়িয়া গেল।

মেয়েটি বলিল, ইগুলা পড়ে' গেল যি?

অহীন্দ্র বলিল, ওগুলা তুই নিয়ে যা। খোঁপায় পরবি!

মেয়েটি নিঃসঙ্কোচে মাথায় কয়েকটা গুচ্ছ গুঁজিয়া নাচিতে নাচিতে জ্যোৎস্নাস্নাত বালুচরের উপর দিয়া চলিয়া গেল। টিট্টিভ পাখীর দল মেয়েটির গতিচাঞ্চল্যের আভাস পাইয়া চীৎকার করিয়া উড়িয়া খানিকটা দূরে গিয়া বসিল।

অহীন্দ্র সস্নেহ মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকেই চাহিয়া রহিল। এতক্ষণ তাহার মনের সকল গ্লানি কাটিয়া গিয়াছে। অপরাহ্নে ক্ষোভের বিমর্ষতায় তাহার অন্তর-বাহির ভাটা-পড়া নদীর মত শীর্ণ নিস্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল, অকস্মাৎ যেন সেই শীর্ণতা ও নিস্তরঙ্গতাকে প্লাবনে আবৃত করিয়া একটা আনন্দের ভাল-লাগার জোয়ার আসিয়া গেল।

মেয়েটা অদ্ভুত! সাঁওতালদেরই তাঁতে বোনা মোটা দুধের মত সাদা কাপড়ে কি চমৎকারই না মানাইয়াছে! লাল কস্তায় রেলিঙের মত নকৃশা-কাটা পাড়টিও সুন্দরভাবে কাপড়খানাতে খাপ খাইয়াছে, বেণী রচনা না করিয়া সাদা-সাপটা এলো খোঁপাতেই উহাদের ভাল মানায়। সরল বর্ব্বর জাতি, স্বার্থকে গোপন করিতে জানে না, স্বার্থহানিতে পরম আপন জনের সঙ্গেও কলহ করিতে

দ্বিধা করে না। কুমারী মেয়েটির স্বামী-সন্তান-সম্পদের কামনা দ্বন্দ্ব করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে একটুকু কুণ্ঠা নাই। অদ্ভুত!

বালুচরের উপরে, দূরে, মেয়েটিকে ওই এখনও দেখা যাইতেছে: মানুষ বলিয়া চেনা যায় না, উহার দুধে-ধোয়া কাপড়খানা জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। শুধু অনাবৃত হাত, পিঠের খানিকটা, মাথার কালো চুল, পাতলা সাদা চাদরের মত জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়া খানিকটা কালো রঙের মত,—না, খানিকটা কালো রূপের মত ছুটিয়া চলিয়াছে।

১৩

জ্যৈষ্ঠের শেষে কয়েক পসলা বৃষ্টি হইয়া মাটি ভিজিয়া সরস হইয়া উঠিল। কয়েক দিনের মধ্যেই চরটা হইয়া উঠিল ঘন সবুজ।

চাষীর দল হাল-গরু লইয়া মাঠে গিয়া পড়িল। ধানচাষের সময় একেবারে মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কাজেই নবীন ও রংলাল ধানের জমি লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, চরটার দিকে আর মনোযোগ দিতে পারিল না। ধানের বীজ বুনিবার জন্য হাফরের জমিতে আগে হইতেই চাষ দেওয়া ছিল, এখন আবার তাহাতে দুই বার লাঙল দিয়া তাহার উপর মই চালাইয়া জমিগুলির মাটি ভূরার মত গুঁড়া করিয়া বীজ বুনিয়া দিল। অন্য জমি হইতে বীজের জমিগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করিয়া রাখিবার জন্য একখানা করিয়া তালপাতা কাটিয়া তাহাতে পুঁতিয়া রাখিল। ওই চিহ্ন দেখিয়াই রাখালেরা সাবধান হইবে, এই জমিগুলিতে গরু-বাছুর নামিতে দিবে না।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি আবার এক পসলা জোর বৃষ্টি নামিল; ফলে মাটি অতিরিক্ত নরম হওয়ায় চাষ বন্ধ হইয়া গেল। নবীন

আসিয়া বলিল, মোড়ল, এইবারে চরের ওপর একবার জোটপাট করে চল। এখন একবার চ'ষে-কুঁড়ে না রাখতে পারলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে কি আর ওখানে ঢোকা যাবে? একেই তো বেনার মুড়োতে আদাড় হয়ে আছে।

রংলাল বসিয়া তামাক খাইতেছিল, সে বলিল, এই ব'সে ব'সে আমিও ওই কথাই ভাবছিলাম লোহার। ওখানে তো একা একা কাজ সুবিধে হবে না, উ তোমার 'গাতো' ক'রে কাজ করতে হবে। একেবারে পাঁচজনার হাল—আমার দুখানা, তোমার দুখানা, আর উ তিনজনার তিনখানা—এই সাতখানা হাল নিয়ে একেবারে গিয়ে পড়তে হবে। ওদের জমিতে এক দিন ক'রে, আর আমাদের দুখানা ক'রে হাল আমরা দুদিন ক'রে লোব।—বলিয়া সে হুঁকা হইতে কল্কে খসাইয়া নবীনকে দিয়া বলিল, লাও, খাও।

কল্কেতে টান মারিয়াই নবীন কাসিয়া সারা হইয়া গেল, কাসিতে কাসিতে বলিল, বাবা রে, এ যে বিষ! বেজায় চড়া হয়ে গিয়েছে হে।

হাসিয়া রংলাল বলিল, হুঁ হুঁ, বর্ষার জন্মে তৈরি ক'রে রাখলাম। জলে ভিজে হালুনি যখন লাগবে, তখন তোমার একটান টানলেই গরম হয়ে যাবে শরীর।

তা বটে। এখন কিন্তু এ তোমার বিষ হয়ে উঠেছে।—বলিয়া সে কল্কেটি আবার রংলালকে ফিরাইয়া দিল।

রংলাল বলিল, তা হ'লে কালই চল সব জোটপাট ক'রে। মাঠানে তো এখন তোমার চার-পাঁচ দিন হাল লাগবে না।

তাতেই তো এলাম গো তোমার কাছে। বলি, মোড়লের ঘুম ভাঙিয়ে আসি একবার। এই নরম মাটিতে বেনা কাশ বেবাক উঠে যাবে তোমার। কিন্তু একটা কথা ভাবছি হে,—ভাবছি,

চক্রবর্ত্তি-বাড়ী থেকে যদি হাঙ্গাম-হুজ্জৎ করে তো কি হবে? জমি তো বন্দোবস্ত ক'রে দেয় নাই!

ক্ষেপেছ তুমি! হাঙ্গামা করবে কে হে বাপু? কত্তা তো ক্ষেপে গিয়েছে। আবার নাকি শুনছি, বড় রোগ হয়েছে হাতে। বড় ছেলে তো কালাপানি, ছোটজনা তো পড়তে গিয়েছে কদিন হ'ল। মজুমদারের জবাব হয়ে গিয়েছে। আর মজুমদারই তো তোমার হা ক'রে আছে, আবার একবার বাগে পেলে হয়। থাকবার মধ্যে গিন্নীমা আর মানদা ঝি। হুকুম দেবে গিন্নীমা আর লড়বে তোমার মানদা ঝি, না কি?—বলিয়া রংলাল হি-হি করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

নবীন আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উহুঁ। ছোটজনা ভারি হুঁশিয়ার ছেলে হে, সে ভারী এক চাল চেলে গিয়েছে। সেই যি পঞ্চাশ বিঘে জমি, আমাদিগেও দিলে না, সাঁওতালদিগেও দিলে না, সেই জমিটা ভাগে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছে যত ছোকরা মাঝিদিগে। এখন যা হয়েছে, তাতে গিন্নীঠাকরুণ হুকুম দিলে গোটা সাঁওতাল-পাড়া হয়তো ভেঙে আসবে।

এবার রংলাল বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল, নীরবে বসিয়া মাথার চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া মুঠায় ধরিয়া চুল টানিতে শুরু করিল। নবীন আপনার পায়ের বুড়া-আঙ্গুলের নখ টিপিতেছিল; কিছুক্ষণ পর সে ডাকিল, মোড়ল!

উঁ?

তা হলে?

সেই ভাবছি।

আমি বলছিলাম কি, গিন্নীঠাকরুণের কাছে গিয়ে বন্দোবস্তের হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেলাই ভাল; কাজ কি বাপু লোকের ন্যায্য পাওনা ফাঁকি দিয়ে? তার ওপর ধর, জমিদার—ব্রাহ্মণ।

উঁহু, সে হবে না। যখন বলেছি, সেলামি দেব না, তখন দেব না।

তা হ'লে?

তা হ'লে আর কি হবে; হাল-গরু নিয়ে চল তো কাল, তারপর যা হয় হবে।

উঠিয়ে দিলে তো মান থাকবে না, সে কথাটা ভাব।

রংলাল এবার খানিকটা মুচকি হাসিল, তারপর বলিল, তখন মেজেষ্টারিতে দরখাস্ত দেব যে, আমাদের জমি থেকে জোর ক'রে জমিদারে তুলে দিয়েছে।

নবীন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অনেক দিনের চাকর, উপস্থিত চাকরি না থাকিলেও এই পুরাতন মনিব-বাড়ীর জন্য সে খানিকটা মমতা অনুভব করে। সেই প্রভুবংশের সহিত এই ধারায় বিরোধ করিতে তাহার মন সায় দিল না। সে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

রংলাল বলিল, কি হ'ল, চুপ করে রইলে যে? চলই তো জোট-পাট ক'রে, দেখাই যাক না, কি হয়।

নবীন এবার বলিল, সে ভাই আমি পারব না। লোকে কি বলবে একবার ভাব দেখি।

রংলাল হাসিল, তারপর দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল দুইটি একত্র করিয়া নবীনের মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, কচু। লোকে বলবে কচু। তুমি ঘরে তুলবে আলু গম কলাই গুড়, আর লোকে বলবে কচু।

নবীন তবুও চুপ করিয়া রহিল। রংলাল এবার তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, চল, একবার ঘুরে ফিরে ভাবগতিটা বুঝে আসি। সাঁওতাল বেটাদের কি রকম হুকুম-টুকুম দেওয়া আছে, গেলেই জানা যাবে। আর ধর গা জমিটার অবস্থাও দেখা হবে। চল, চল।

নবীন ইহাতে আপত্তি করিল না, উঠিল।

কালী নদীতে ইহারই মধ্যে জল খানিকটা বাড়িয়াছে, এখন হাঁটু

পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। কয়েকদিন আগে জল অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছিল, উপরের বালুচর পর্য্যন্ত ছিলছিলে রাঙা জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। জল এখন নামিয়া গিয়াছে। বালির উপরে পাতলা এক স্তর লাল মাটি জমিয়া আছে। রৌদ্রের উত্তাপে এখন সে স্তরটি ফাটিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে, পা দিলেই মুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া বালির সহিত মিশিয়া যায়। তবুও এই লক্ষ টুকরায় বিভক্ত পাতলা মাটির স্তরের উপর এখনও কত বিচিত্র ছবি জাগিয়া আছে।—কাঁচা মাটির উপর পাখীর পায়ের দাগ রাখিয়া গিয়াছে, আঁকাবাঁকা সারিতে নকশাআঁকা কাপড়ের চেয়েও বিচিত্র ছক সাজাইয়া তুলিয়াছে যেন। তাহারই মধ্যে প্রকাণ্ড চওড়া মানুষের দুইটি পায়ের ছাপ চলিয়া গিয়াছে, এ বোধ করি ওই কমল মাঝির পায়ের দাগ। একটা প্রকাণ্ড সাপ চলিয়া যাওয়ায় মসৃণ বঙ্কিম রেখা একেবারে চরের কোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। ভিতরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, অতি সূক্ষ্ম বিচিত্র রেখায় লক্ষ লক্ষ পতঙ্গের পদচিহ্ন।

বেনা ও কাশের গুল্মে ইহারই মধ্যে সতেজ সবুজ পাতা বাহির হইয়া বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, বন্য লতাগুলিতে নূতন ডগা দেখা দিয়াছে, ভিতরে ভিতরে শিকড় হইতে কত নূতন গাছ গজাইয়া উঠিয়াছে, সাঁওতালদের পরিষ্কার করা পথের উপরেও ঘাস জন্মিয়াছে, কুশের অঙ্কুরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে।

তীক্ষ্ণাগ্র কুশের উপর চলিতে চলিতে বিব্রত হইয়া রংলাল বলিল, এ বেটারাও বাবু হয়ে গিয়েছে নবীন, রাস্তাটা কি ক'রে রেখেছে দেখ দেখি।

নবীন বলিল, ওদের পা আমাদের চেয়ে শক্ত হে।

পল্লীর প্রান্তে সাঁওতালদের জমির কাছে আসিয়া তাহারা কিন্তু অবাক হইয়া গেল। ইহারই মধ্যে প্রায় সমস্ত জমি সবুজ ফসলে ভরিয়া

উঠিয়াছে। চষিয়া খুঁড়িয়া নিড়ান দিয়া তাহারা ভুট্টা, শন, অড়হর বুনিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে; জমির ধারে সারিবন্দী চারা, তাহাতে শিম, বরবটি, খেঁড়ো, কাঁকুড়ের অঙ্কুর পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধানের জমিগুলি চাষ দিয়া সার ছড়াইয়া একেবারে প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে। বাড়ীঘরের চালে নূতন খড় চাপানো হইয়া গিয়াছে, কাঁচা সোনার রঙের নূতন খড়ের বিছানি অপরাহ্নের রৌদ্রে ঝকঝক করিতেছে। ইহাদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ সত্ত্বেও রংলাল এবং নবীন মুগ্ধ হইয়া গেল। রংলাল বলিল, বা বা বা! বেটারা এরই মধ্যে ক'রে ফেলেছে কি হে, অ্যাঁ! ঘাস-টাস ঘুচিয়ে বিশ বছরের চষা জমির মত সব তকতক করছে!

নবীন হেঁট হইয়া ফসলের অঙ্কুরগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। সে বলিল, অড়হরের কেমন জাত দেখ দেখি! একটি বীজও বাদ যায় নাই হে! তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর আমাদের জমিতে হয়তো ঢুকতেই পারা যাবে না। দেখলে তো, বেনা আর কাশ কি রকম বেড়ে উঠেছে।

আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া অহীন্দ্র যে জমিটা খাসে রাখিয়াছে, সেই অংশটার ভিতর তাহারা আসিয়া পড়িল। তখনও সেখানে কয়জন জোয়ান সাঁওতাল মাটি কোপাইয়া বেনা ও কাশের শিকড় তুলিয়া ফেলিতেছিল। এ অংশটারও অনেকটা তাহারা সাফ করিয়া ফেলিয়াছে, তবুও নূতন বলিয়া এখানে ওখানে দুই-চারিটা পরিত্যক্ত শিকড় হইতে ঘাস গজাইয়া উঠিতেছে, এখনও জমির আকারও ধরিয়া উঠে নাই, এখানে ওখানে উঁচু নীচু অসমতল ভাবও সমান হয় নাই। তবুও উহারই মধ্যে যে অংশটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইয়াছে, তাহারই উপর ভুট্টা বুনিয়া ফেলিয়াছে। সে-জমিটা অতিক্রম করিয়া আপনাদের জমির কাছে আসিয়া তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। সত্যই বেনা

ঘাসে কাশের গুল্মে নানা আগাছায় সে যেন দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে ; বেনা ও কাশ ইহার মধ্যে এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে, মানুষের বুক পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। এই জঙ্গলের মধ্যে লাঙল চষিবে কেমন করিয়া ?

নবীন বলিল, ঘাস কেটে না ফেললে আর উপায় নেই মোড়ল !

রংলাল চিন্তিত মুখেই বলিল, তাই দেখছি।

নবীন বলিল, এক কাজ করলে হয় না মোড়ল ? সাঁওতালদিগেরই এ বছরের মত ভাগে দিলে হয় না ? এবার ওরা কেটে কুটে সাফ করুক, চ'ষে খুঁড়ে ঠিক করুক, তারপর আসছে বছর থেকে আমরা নিজেরা লাগব।

যুক্তিটা রংলালের মন্দ লাগিল না। সে বলিল, তাই চল, দেখি বেটাদের ব'লে।

সেই পরামর্শ করিয়াই তাহারা আসিয়া সাঁওতালদের পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ঝক্‌ঝকে তকতকে পল্লী, পথে বা ঘরের আঙিনায় কোথাও এতটুকু আবর্জ্জনা নাই। পল্লীর আশেপাশে তখনও গরু মহিষ ছাগল চরিয়া বেড়াইতেছে। সারের গাদার উপর মুরগীর দল খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার সংগ্রহে ব্যস্ত। আঙিনার পাশে পাশে মাচার উপর কাঠশিম, লাউ, কুমড়ার লতা বাসুকির মত সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে যেন। বাড়ীগুলির বাহিরে চারিদিক ঘিরিয়া সরল-রেখার মত সোজা লম্বা বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছে, তাহারই উপর সারিবন্দী জাফরি বসানো। ভিতরে আম কাঁঠাল মহুয়ার গাছ পুঁতিয়া ফেলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে শজিনার ডাল এবং মূল সমেত বাঁশের কলম লাগাইয়া চারিপাশে কাঁটা দিয়া ঘিরিয়া দিয়াছে।

রংলাল বলিল, বাকি আর কিছু রাখে নাই বেটারা, ফল ফুল শজনে বাঁশ—একেবারে ইন্দ্রভুবন ক'রে ফেলেছে হে ! জাত বটে বাবা !

প্রথমেই সেই পুতুলনাচের ওস্তাদ চূড়া মাঝির ঘর ; মাঝি ছুতারের

যন্ত্রপাতি লইয়া উঠানে বসিয়া লাঙল তৈয়ারি করিতেছিল। একটি অল্পবয়সী ছেলে তাহার সাহায্য করিতেছে। একখানা প্রায়-সমাপ্ত লাঙলের উপর হাল্কাভাবে যন্ত্র চালাইতে চালাইতে মাঝি গুনগুন করিয়া গান করিতেছিল। নবীন লাঙলখানার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, দেখেছ কেমন পাতলা আর কতটা লম্বা ?

রংলাল দেখিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল, বাজে। এত সরুতে পাশের মাটি ধরবে কেন? ওর চেয়ে আমাদের ভাল। যাকগে। এখন ত আমাদের কাজের কথা। এই মাঝি, মোড়ল কোথা রে তোদের ?

ওস্তাদ কথার কোন উত্তর দিল না, আপন মনেই কাজ করিতে লাগিল। রংলাল বিরক্ত হইয়া বলিল এ-ই, শুনছিস ?

মুখ না তুলিয়াই এবার চূড়া বলিল, কি ?

তোদের মোড়ল কোথা ?

মোড়ল ?

হ্যাঁ।

মোড়ল ?

হ্যাঁ হ্যাঁ ?

চূড়া এবার হাতের যন্ত্রটা রাখিয়া দিয়া কোন কিছুর অন্ত আপনার ট্যাক হইতে কাপড়ের খুঁট পর্য্যন্ত খুঁজিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে বস্তুটা না পাইয়া অত্যন্ত হতাশভাবে বলিল, পেলম না গো।

রংলাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, ওই, বেটা বলছে কি হে !

চূড়া সকরুণ মুখে বলিল, রেখেছিলম তো বেঁধে। প'ড়ে গেঁইছে কোথা।

রংলাল অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া বলিল, দেখ দেখি বেটার আস্পর্দ্ধা, ঠাট্টা-মস্করা আরম্ভ করেছে !

চূড়া এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মানুষ আপনার ঘরকে থাকে। তুরা তার ঘরকে যা। আমাকে শুধালি কেনে?

রংলাল কোন কথা বলিল না, নবীনের হাত ধরিয়া টানিয়া ক্রুদ্ধ পদক্ষেপেই অগ্রসর হইল; চূড়া পেছন হইতে অতি মিষ্ট স্বরে ডাকিল, মোড়ল! ও মোড়ল!

রংলাল বুঝিল, লোকটা অনুতপ্ত হইয়াছে, সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, কি?

চূড়া কোন কথা বলিল না, তাহার সমস্ত শরীরের কোন একটি পেশী নড়িল না, শুধু বড় বড় কাঁচা-পাকা গোঁফ জোড়াটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচিয়া উঠিল। গোঁফের সে নৃত্যভঙ্গিমা যেমন হাস্যকর, তেমনই অদ্ভুত। তাহা দেখিয়া রংলালও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বেটা আমার রসিক রে!

চূড়া এবার বলিল, বুলছি, রাগ করিস না গো।

মোড়ল মাঝির উঠানে খাটিয়ার উপর একটি আধা ভদ্রলোক বসিয়া ছিল। কমল মাটির উপর উপু হইয়া বসিয়া কথা বলিতেছিল। লোকটির গায়ে একখানি চাদর, পায়ে একজোড়া চটিজুতা, হাতে মোটা একটা বাঁশের ছড়ি, চোখে পুরু একজোড়া চশমা—সুতা দিয়া মাথা বেড়িয়া বাঁধা। চশমাসুদ্ধ চোখ একরূপ আকাশে তুলিয়া রংলাল ও নবীনকে দেখিয়া লোকটি বলিল, ওই, পাল মশায় যে? লোহারও সঙ্গে? কি মনে ক'রে গো?

রংলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, বলি, আপুনি কি মনে ক'রে গো?

লোকটি বলিল, আর বল কেন ভাই, এরা ধরেছে বর্ষার সময় ধান দিতে হবে। তাই একবার দেখতে শুনতে এলাম। তা এরা করেছে বেশ, এরই মধ্যে গেরামখানিকে বে—শ ক'রে ফেলেছে হে! তারপর, শুনলাম, আপনারাও জমি নিয়েছেন? তা আমাদিগে বললে কি

আর আপনাদের জমি আমরা কেড়ে নিতাম? আমরাও খানিক আধেক নিতাম আর কি।

নবীন বলিল, বেশ, পাল মশায় বলেন ভাল! আমাদিগেই কি আর দেয় জমি। কোন রকম ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে তবে আমরা পেলাম। তার উপর কে চন্দ রাজা, কে চন্দ মন্ত্রী—কোন হদিসই নাই।

লোকটি হাসিয়া বলিল, তা দেখছি। চার কোণে চার কোপ দিয়ে গেলেই হ'ল। বাস্, জমি দখল হয়ে গেল। কই, এখনও তো কিছু করতে পারেন নাই দেখলাম। এবার আর ওতে হাত দিতেও পারবেন না। এদিকে আবার ধানচাষ এসে পড়ল হু-হু ক'রে।

রংলাল বলিল, এবার ভাবছি সাঁওতালদিগেই ভাগে দিয়ে দেব, ওরাই চাষ-খোড় করুক, যা পারে লাগাক, যা খুশি হয় আমাদের দেবে, তাই এলাম একবার মোড়লের কাছে। শুনছিস মোড়ল?

কমল মাঝি দুই হাতে মাথা ধরিয়া বসিয়া ছিল, সে বলিল, তা তো শুনলম গো।

তা কি বলছিস?

উ-হুঁ, সে আমরা লারব। তুরা তো আবার কেড়ে লিবি। আমরা তবে কেনে তুদের জমি ঠিক ক'রে দিব? আমাদিগে পয়সা দিয়ে খাটায়ে লে কেনে!

কেন, গরজ বুঝছিস নাকি?

তুরাই তো দেখাইছিস গো সিটি। আমরা খাটব, জমি করব, আর তুরা তখন জমিটি কেড়ে লিবি।

নূতন লোকটি এবার বলিল, আমি উঠছি মাঝি। তা হ'লে ওই কথাই ঠিক রইল।

মাঝি বলিল, হুঁ, সেই হ'ল। আপুনি আসবি তো ঠিক?

ঠিক আসব আমি। তারপর রংলাল ও নবীনকে বলিল, বেশ, তা হ'লে কথাবার্ত্তা বলুন আপনারা, আমি চললাম।

লোকটি চলিয়া গেলে রংলাল বলিল, হ্যাঁ মাঝি, তোরা ওর কাছে ধান লিবি? তোদের গলা কেটে ফেলাবে। খবরদার খবরদার। এক মণ ধানে শ্রীবাস আধমণ সুদ লেয়, খবরদার।

মাঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উহুঁ উ সুদ লিব না বুললে। উ আমাদের পাড়াতে দুকান করছে। একটি খামার করছে। আমাদিগে জমি দিলে ভাগে। আমরা উয়ার জমি কেটে চ'ষে ঠিক ক'রে দিব।

রংলাল বিস্মিত হইয়া বলিল, পাল এখানে জমি নিয়েছে নাকি?

হুঁ গো। ওই তো, তুদের জমিটোই উ লিলে। বাবুদিগে টাকা দিলে, দলিল ক'রে লিলে, চেক লিলে। কাল সব আমরা পাড়াসুদ্ধ ওই জমিতে লাগব। উনি আসবে লোকজন লিয়ে।

রংলাল নবীন উভয়েই বিস্ময়ের আঘাতে স্তম্ভিত হইয়া মাটির পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কমল পাড়ার এক প্রান্তে প্রকাণ্ড একটা খড়ের চাল দেখাইয়া বলিল, উই দেখ্‌ কেনে—উ দুকান করেছে উইখানে। উয়ার কাছে যা কেনে তুরা।

রংলাল নবীন উভয়েই হতাশায় ক্রোধে অস্থির চিত্তে দোকানের দিকে অগ্রসর হইল। লোকটি সোজা লোক নয়। এখানে সদগোপদের মধ্যে শ্রীবাস পাল বর্দ্ধিষ্ণু লোক। বিস্তৃত চাষ তো আছেই, তাহার উপর নগদ টাকা এবং ধানের মহাজনিও করিয়া থাকে। বড় ছেলে একটা মনিহারীর দোকান খুলিয়াছে।

সাঁওতাল-পল্লীর এক প্রান্তে বেশ বড় একখানি চালা তুলিয়া তাহার চারিপাশ ঘিরিয়া ছিটা-বেড়ার দেওয়াল দিয়া কয় দিনের মধ্যেই শ্রীবাস দোকান খুলিয়া ফেলিয়াছে। এক পাশে নটকোনার দোকান, মধ্যে

একটা তক্তাপোশের উপর দস্তার গহনা, কার, পুঁতিরমালা, রঙিন নকল রেশমের গুছি, কাঠের চিরুনি, আয়না—এই সব লইয়া কিছু মনিহারীও সাজানো রহিয়াছে, এ-দিকের এক কোণে তেলে-ভাজা খাবার বিক্রয় হইতেছে। পল্লীর মেয়েরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া জিনিষ কিনিতেছিল।

রংলাল আসিয়া ডাকিল, পাল মশায়!

পালের ছোট ছেলে মুখ তুলিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া বলিল, বাবা তো বাড়ী চ'লে গিয়েছেন।

রংলাল সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, পথ বাছিল না, জঙ্গল ভাঙিয়াই গ্রামের মুখে ফিরিল। পালের ছেলে বলিল, এই রাস্তায় রাস্তায় যান গো, বরাবর নদীর ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তা প'ড়ে গিয়েছে।

সত্যই সবুজ ঘাসের উপর একটি গাড়ির চাকার দাগ-চিহ্নিত পথের রেশ বেশ পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহারই মধ্যে, কিছু জঙ্গল কাটিয়াও ফেলা হইয়াছে। পথ বাছিয়া চলিবার মত মনের অবস্থা তখন রংলালের নয়, সে জঙ্গল ভাঙিয়াই গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল।

১৪

রংলাল মনের ক্ষোভে রক্তচক্ষু হইয়াই শ্রীবাসের বাড়ীতে হাজির হইল। শ্রীবাস তখন পাশের গ্রামের জন কয়েক মুসলমানের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। ইহারা এ অঞ্চলের দুর্দ্দান্ত লোক, কিন্তু শ্রীবাসের খাতক। বর্ষায় ধান, হঠাৎ প্রয়োজনে দুই-চারিটা টাকা শ্রীবাস ইহাদের ধার দেয়; সুদ অবশ্য লয় না, কারণ মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সুদ লওয়া মহাপাতক।

কেহ কেহ হাসিয়া শ্রীবাসকে বলে, ঘরে তো টিন দিয়েছেন পাল মশায়, আর ও বেটাদের সুদ ছাড়েন কেন?

শ্রীবাস উত্তর দেয়, কিন্তু দরজা যে কাঠের রে ভাই, রাত্রে ভেঙে

ঢুকলে রক্ষা করবে কে? তা ছাড়া ও-রকম দু-দশটা লোক অনুগত থাকা ভাল। ডাকতে-হাঁকতে অনেক উপকার মেলে হে।

রংলালের মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীবাস হাসিল, কিন্তু এতটুকু অবজ্ঞা বা বিরক্তি প্রকাশ করিল না। মিষ্ট হাসিমুখে আহ্বান জানাইয়া বলিল, আসুন আসুন। কই, দরকার ছিল তো ওখানে কই কোন কথা বললেন না? ওরে তামাক সাজ্, তামাক সাজ্ দেখি।

বিনা ভণিতায় রংলাল কথাটা প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিল, এর মানে কি পাল মশায়?

শ্রীবাস একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, সে কি, ওই জমিটাই আপনারা নেবার জন্যে কোপ মেরে রেখেছেন নাকি? কিন্তু আমার বন্দোবস্ত যে আপনাদের অনেক আগে পাল মশায়। আপনারাই তা হ'লে আমার জমি নিতে গিয়েছিলেন বলুন?

রংলাল সবিস্ময়ে বলিল, তার মানে? আমরা ছোট দাদাবাবুর সামনে সেদিন—

বাধা দিয়া শ্রীবাস বলিল, আমার বন্দোবস্ত বড় দাদাবাবুর কাছে পাল মশায়। ননী যেদিন বিকেলে খুন হ'ল, সেই দিন সকালে আমি বন্দোবস্ত নিয়েছি। কেবল, বুঝলেন কিনা—এই ঝগড়া-মারামারির জন্যেই ওতে আমি হাত দিই নাই।

রংলাল উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এ কি ছেলে ভোলাচ্ছেন পাল, না পাগল বোঝাচ্ছেন? আমি ছেলেমানুষ, না পাগল? বড় দাদাবাবু আপনাকে জমি বন্দোবস্ত ক'রে গিয়েছেন?

শ্রীবাস শান্তভাবে বলিল, বসুন। বলি, পড়তে শুনতে তো জানেন আপনি। কই, দেখুন দেখি এই চেকরাসিদখানা। তারিখ দেখুন, সন সাল দেখুন, তার উল্টো পিঠে জমীর চৌহদ্দি দেখুন; সে সময়ের নায়েব আমাদের মজুমদার মশায়ের সই দেখুন। তারপরে, তিনিও

আপনার বেঁচে রয়েছেন, তাঁর কাছে চলুন। তিনি কি বলেন, শুনুন। —বলিয়া শ্রীবাস একখানি জমিদারী সেরেস্তার রসিদ বাহির করিয়া রংলালের সম্মুখে ধরিল।

শ্রীবাসের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, অন্তত রসিদখানা সেই প্রমাণই দিল। কিন্তু রংলাল বলিল, আমরাও ধানচালের ভাত খাই পাল, এ আপনি মজুমদারের সঙ্গে যড় ক'রে করেছেন। এ আপনার জাল রসিদ। আমরা ও-জমি ছাড়ব না, এ আমি আপনাকে ব'লে দিলাম!

শ্রীবাস হাসিয়া বলিল, ব'লে না দিলেও সে আমি জানি পাল মশায়। বেশ, তা হ'লে কালই যাবেন চরের ওপর, কাল ঘাস কেটে জমি সাফ করতে আমার লোক লাগবে, পারেন উঠিয়ে দেবেন। তারপর তাহার অনুগত মুসলমান কয়জনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, এই শুনলে তো মাসুদ, তা হ'লে খুব ভোরেই কিন্তু তোমরা এস। বুঝছ তো, তোমরাই আমার ভরসা।

মাসুদ শ্রীবাসকে কোন উত্তর না দিয়া রংলালকে বলিল, তা হ'লে তাই আসব পাল। ভয় নাই, পুরু ঘাসের ওপর পড়লে পরে দরদ লাগবে না গায়ে। —বলিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রংলাল নির্ব্বাক হইয়া রহিল, কিন্তু নবীন এবার হাসিল।

* * *

নবীন সমস্ত ক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রংলালের অনুসরণ করিতেছিল। শ্রীবাসের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে বলিল, পাল, আমি তোমার এই সবের মধ্যে নাই কিন্তু।

রংলালের বুকের ভিতরে অবরুদ্ধ ক্রোধ হুহু করিতেছিল, শ্রীবাস ও মজুমদারের প্রবঞ্চনার ক্ষোভ, সঙ্গে সঙ্গে চরের উর্ব্বর মৃত্তিকার প্রতি অপরিমেয় লোভ, এই দুইয়ের তাড়নায় সে যেন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে মুখ বিকৃত করিয়া ভেঙাইয়া বলিয়া উঠিল,

হ্যাঁ হ্যাঁ, সে জানি। যা যা, বেটা বাগদী, ঘরে পরিবারের আঁচল ধ'রে ব'সে থাকগে যা।

নবীন জাতে বাগদী, আজ তিন পুরুষ তাহারা জমিদারের নগদীগিরিতে লাঠি হাতেই কাল কাটাইয়া আসিয়াছে, কথাটা তাহার গায়ে যেন তীরের মত গিয়া বিঁধিল। সে রূঢ় দৃষ্টিতে রংলালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি পরিবারের আঁচল ধ'রে ব'সে থাকি আর যাই করি, তুমি যেন যেও। চরের ওপরেই আমার সঙ্গে দেখা হবে, বুঝলে? শুধু আমি নয়, গোটা বাগদীপাড়াকেই ওই চরের ওপর পাবে।—বলিয়া সে হনহন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কথাটা রংলাল রাগের মুখে বলিয়া ফেলিয়াই নিজেই অন্যায়টা বুঝিয়াছিল। এ-ক্ষেত্রে বাহুবলের একমাত্র ভরসাস্থল ওই নবীন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে বাগ্দীদের দলে না হইলে উপায়ান্তর নাই। নবীন সমস্ত বাগদীপাড়াটার মাথা। তাহার কথায় তাহারা সব করিতে পারে। মুহূর্তে রংলাল আপনা হইতেই যেন পাল্টাইয়া গেল, একেবারে সুর পাল্টাইয়া সে ডাকিল, নবীন! নবীন! ও নবীন! শোন হে, শোন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নবীন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বল।

রসিকতা করিয়া অবস্থাটাকে সহজ স্বচ্ছন্দ করিয়া লইবার অভিপ্রায়েই রংলাল বলিল, ওই, রাগের চোটে যে পথই ভুলে গেলে হে! ও-দিকে কোথা যাবে?

যাব আমার মনিব-বাড়ী। অনেক নুন আমি খেয়েছি, তাদের অপমান লোকসান আমি দেখতে পারব না। আমি হুকুম আনতে চললুম, তোমাদিগেও জমি চষতে দোব না, ও শ্রীবাসকেও না, গোটা বাগদীপাড়া আমরা কাল মনিবের হয়ে যাব। এ তোমরা জেনে রাখ।

রংলাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল, চল, আমিও যাব। টাকা দিয়েই বন্দোবস্ত আমরা ক'রে নেব। তা হ'লে তো হবে?

নবীন খুশি হইয়া বলিল, সে আমি কতদিন থেকে বলছি বল, দেখি?

নবীন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পুরনো চাকর। শুধু সে নিজেই নয়, তাহার ঠাকুরদাদা হইতে তিন পুরুষ চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কাজ করিয়া আসিয়াছে। এই জমি-বন্দোবস্তের গোড়া হইতেই মনে মনে সে একটা দ্বিধা অনুভব করিয়া আসিতেছিল। সেলামি না দিয়া জমি বন্দোবস্ত পাইবার আবেদনের মধ্যে তাহার একটা দাবি ছিল, কিন্তু অহীন্দ্র তাহাতে অসম্মতি জানাইলে রংলাল যখন আইনের ফাঁকে ফাঁকি দিবার সঙ্কল্প করিল, তখন মনে মনে একটা অপরাধবোধ সে অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু সে-কথাটা জোর করিয়া সে প্রকাশ করিতে পারে নাই দলের ভয়ে। রংলাল এবং অন্য চাষী কয়জন যখনই এই সঙ্কল্পই করিয়া বসিল, তখন সে একা অন্য অভিমত প্রকাশ করিতে কেমন সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিল। তখন সঙ্গে সঙ্গে ছিল খানিকটা লোভ। অন্যকে ফাঁকি দেওয়ার আনন্দ না হইলেও, তাহাদিগকে খাতির বা স্নেহ করিয়া এমনি দিয়াছেন, ইহার মধ্যে যে একটা আত্মপ্রসাদ আছে, তাহার প্রতি একটা আসক্তি তাহার অপরাধবোধকে আরও খানিকটা সঙ্কুচিত করিয়া দিয়াছিল। সর্ব্বশেষ রংলাল যখন বলিল, ওই সাঁওতালদের চেয়েওকি আমরা চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পর?—তখন মনে মনে সে একটা ক্রুদ্ধ অভিমান অনুভব করিল, যাহার চাপে ওই সঙ্কোচ বা দ্বিধাবোধ একেবারেই যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল। যাহার জন্য অসঙ্কোচে রংলালদের দলে মিশিয়া সে, উচ্চকণ্ঠে না হইলেও প্রকাশ্যভাবেই, বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া উঠিয়া আসিল। কিন্তু ধীরে ধীরে আবার সেই দ্বিধা তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই মামলা-মোকদ্দমায় সম্মতি সে দিতে পারে নাই। তারপর শ্রীবাসের এই ষড়যন্ত্রের কথা অকস্মাৎ প্রকাশ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, চারিদিক হইতে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীকেই ফাঁকি দিবার আয়োজন চলিতেছে। তাহারা, শ্রীবাস, মজুমদার, সকলেই ফাঁকি দিতে চায় ঐ সহায়হীন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীকে, তাহারই পুরানো মনিবকে। এক মুহূর্ত্তে তাহার মনের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া গেল, তিন পুরুষের মনিবের পক্ষ হইয়া সমগ্র বাগ্দীবাহিনী লইয়া লড়াই দিবার জন্য তাহার লাঠিয়াল-জীবন মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পুরাতন চাকর হিসাবে অন্দরে যাতায়াতের বাধা তাহার ছিল না, সে একেবারে সুনীতির কাছে আসিয়া অকপটেই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে তাহার ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। রংলাল দাঁড়াইয়া ছিল দরজার বাহিরে রাস্তাঘরে।

সমস্ত শুনিয়া সুনীতি কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। কথা বলিল মানদা, সে তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, ছি লগ্দী, ছি! গলায় একগাছা দড়ি দাও গিয়ে।

সুনীতি এবার বলিল, মানদা, না না, দোষ একা নবীনের নয়, দোষ অহিরও। সাঁওতালদের যখন সে বিনা-সেলামিতে জমি দিয়েছে, তখন নবীনকেও দেওয়া উচিত ছিল। সত্যিই তো, নবীন কি আমাদের কাছে সাঁওতালদের চেয়েও পর ?

নবীন এবার ছোট ছেলের মত কাঁদিয়া ফেলিল। দুয়ারের ওপাশ হইতে রংলাল বেশ আবেগভরেই বলিল, বলুন মা, আপুনিই বলুন। আমাদের অভিমান হয় কি না হয়, আপুনিই বলুন। মনে ক'রে দেখুন, আমিই বলেছিলাম সর্ব্বপ্রথম যে, এ-চর আপনাদের ষোল-আনা! তবে ধর্ম্মের কথা যদি ধরেন, তবে আমরা পেতে পারি। আপুনি বলেছিলেন, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে কি কিছু করা যায়

বাবা, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। তাতেই মা, সেই দাবিতে আমরা আবদার ক'রে বলেছিলাম, আমরা দিতে পারব না সেলামি।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সবই বুঝলাম বাবা, কিন্তু এখন আমি কি করব, বল?

নবীন বলিল, আমাকে হুকুম দেন মা, আমি কাউকেই জমি চষতে দেব না। গোটা বাগ্দীপাড়া লাঠি হাতে গিয়ে দাঁড়াব। থাকুক জমি এখন খাসদখলে।

রংলাল বাহির হইতে গভীর ব্যগ্রতা-ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল, এখুনি আমি আড়াই শ টাকা এনে হাজির করছি নবীন, জমি আমাদিগে বন্দোবস্ত ক'রে দেন রাণীমা।

নবীন বলিল, সেই ভাল মা, ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় আমরাই পোয়াব, আপনাদের কিছু ভাবতে হবে না।

সুনীতি অনেক কিছু ভাবিতেছিলেন। তাহার মধ্যে যে কথাটা তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা পীড়িত করিতেছিল, সেটা নবীন ও রংলালের কথা। নিজের স্বার্থের জন্য কেমন করিয়া এই গরীব চাষীদের এমন রক্তাক্ত বিরোধের মুখে ঠেলিয়া দিবেন? তাঁহার মনের বিচারে—স্বার্থটা ষোল-আনা যে একা তাঁহারই।

মানদা কিন্তু হাসিয়া বলিল, সস্তায় কিস্তি মেলে ঝঞ্ঝাট পোয়াতে গায়ে লাগে না, না কি গো লগ্দী? আমিও কিন্তু বিঘে পাঁচেক জমি নেব মা। আমারও তো শেষকাল আছে। আমিও টাকা দেব। লগ্দী যা দেবে তাই দেব। লগ্দীর চেয়ে তো আমি পর নই মা।

মানদার কথার ধরণটা শুধু ধারালোই নয়, বাঁকাও খানিকটা বটে। নবীন অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল, দুয়ারের ও-পাশে রংলাল দাঁতে দাঁত টিপিয়া নিরালা অন্ধকারের মধ্যেই নীরব ভঙ্গিতে তাহাকে শাসাইয়া উঠিল। সুনীতি কি বলিতে গেলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই বাহির-

দরজার ও-পাশে কে গলার সাড়া দিয়া আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিল। গলার সাড়া সকলেরই অত্যন্ত পরিচিত। সুনীতি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, মানদা সবিস্ময়ে বলিল, ওমা লায়েববাবু যে।

পরমুহূর্ত্তেই শান্তবিনীত কণ্ঠস্বরে মজুমদার বাহির হইতে ডাকিলেন, বউঠাকরুণ আছেন নাকি?

নবীন খানিকটা দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িল, দরজার আড়ালে রংলালের মুখ শুকাইয়া গেল। মানদা মৃদুস্বরে সুনীতিকে প্রশ্ন করিল, মা?

সুনীতি মৃদুস্বরেই বলিলেন, আসতে বল।

মানদা ডাকিল, আসুন, ভেতরে আসুন।

সুনীতি বলিলেন, একখানা আসন পেতে দে মানদা।

প্রশান্ত হাসিমুখে যোগেশ মজুমদার ভিতরে আসিয়া সবিনয়ে বলিল, ভাল আছেন বউঠাকরুণ? কর্ত্তা ভাল আছেন?

অবগুণ্ঠন অল্প বাড়াইয়া দিয়া সুনীতি বলিলেন, উনি আছেন সেই রকমই। মাথার গোলমাল দিন দিন যেন বাড়ছে ঠাকুরপো।

মজুমদার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আহা-হা! কণ্ঠস্বরে, ভঙ্গিতে যতখানি সমবেদনার আভাস প্রকাশ পাইতে পারে, ততখানিই প্রকাশ পাইল। তারপর মজুমদার আবার বলিল, একবার বৈদ্যপারুলিয়ার কবিরাজদের দেখালে হ'ত না? চর্ম্মরোগে, বিশেষত কুষ্ঠ ইত্যাদিতে ওরা ধন্বন্তরি।

সুনীতির মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত শরীর যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল, মজুমদারের কথায় তিনি মর্ম্মান্তিক আঘাত অনুভব করিলেন। তিনি কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, না না ঠাকুরপো, সে তো সত্যি নয়। সে কেবল ওঁর মাথার ভুল।

উত্তরে মজুমদার কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মানদা ঠিক করিয়া একটা

প্রণাম করিয়া বলিল, তবু ভাল, নায়েববাবুকে, দেখতে পেলাম। আমি বলি—মথুরাতে রাজা হয়ে নন্দের বাদার কথা বুঝি ভুলেই গেলেন। তা নয় বাপু, পুরনো মনিবের ওপর টান খুব।

মজুমদারের মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিল, সে বার দুই অস্বাভাবিক গম্ভীরভাবে গলা ঝাড়িয়া লইল, মানদা বলিয়াই গেল, নায়েববাবু আমাদের ভোলেন নি বাপু। কত্তাবাবুর খবর-টবর রাখেন।

সুনীতি লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন, মুখরা মানদা এ বলিতেছে কি? কিন্তু তাহাকেই বা কেমন করিয়া তিনি নিরস্ত করিবেন? মুখের দিকেও একবার চাহে না যে, ইঙ্গিত করিয়া বারণ করেন। মজুমদার নিজেই ব্যাপারটাকে ঘুরাইয়া লইল, আরও একবার গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, বিশেষ একটা জরুরী কথা বলতে এসেছিলাম বউঠাকরুণ।

সুনীতি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হাসিমুখে বলিলেন, বলুন।

বলছিলাম ওই চরটার কথা। ওই চরের ওপর এক শ বিঘে জায়গা মহীবাবু শ্রীবাস পালকে বন্দোবস্ত করেছেন। আমিই চেক কেটে দিয়েছি মহীবাবুর হুকুমমত। টাকা অবিশ্যি তিনিই নিয়েছিলেন। ছ শ টাকা। পাঁচ শ টাকা সেলামি, এক শ টাকা খাজনা।

সুনীতি মৃদুস্বরে কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, আমি তো সে কথা জানি নে ঠাকুরপো।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মজুমদার বলিল, জানবেন কি ক'রে বলুন, এ কি আপনার জানবার কথা? তা ছাড়া, সেই দিনই বেলা তিনটের সময় ননী পাল খুন হয়ে গেল। বলবার আর অবসর হ'ল কই, বলুন? এখন শ্রীবাসের সেই জমি থেকে পঞ্চাশ বিঘে জমি রংলাল নবীন—এরা দখল করতে চাচ্ছে। ওদের অবিশ্যি জবরদস্তি। সেলামির টাকা পর্য্যন্ত দেয় নি।

সুনীতি বলিলেন, না না ঠাকুরপো, ওদের আমি জমি দেব বলেছিলাম।

বেশ তো। চরে তো আরও জমি রয়েছে, তার থেকে ওরা নিতে পারে।

অকস্মাৎ মানদা আক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, আঃ হায় হায় গো! ছ-চ শ টাকা চিলে ছোঁ দিয়ে নিয়ে গেল গো! আমার মনে পড়ছে নায়েববাবু, দাদাবাবুর হাতটা পর্য্যন্ত ছ'ড়ে গিয়েছিল নখে। সেই টাকাই তো?

মুহূর্ত্তের জন্য মজুমদার স্তব্ধ হইয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে হাসিয়া বলিল, টাকাটা আমাকেই দিয়েছিলেন মহী; সেটা মামলাতেই খরচ হয়েছে। বুঝলেন বউঠাকরুণ, জমাখরচের খাতায়—খসড়া রোকড় খতিয়ান তিন জায়গাতেই তার জমা আছে। দেখলেই দেখতে পাবেন। তা ছাড়া চেক-রসিদও তাকে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজে হাতে লিখে দিয়েছি। শ্রীবাস এসেছে, সেই চেক নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ-বছরের খাজনাও সে দিতে চায়।

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইতে শ্রীবাসের সাড়া পাওয়া গেল, খাজনার টাকা আমি নিয়ে এসেছি মজুমদার মশায়, এক শ টাকা আমি এক্ষুনি দিয়ে যাব।—বলিয়া সে ভিতর-দরজা পার হইয়া একেবারে অন্দরে আসিয়া দেখা দিয়া দাঁড়াইল।

মাথার ঘোমটা আরও খানিকটা বাড়াইয়া দিয়াও সুনীতি নিজেকে বিব্রত বোধ করিলেন; শুধু তাই নয়, হঠাৎ তাঁহার চোখে জল আসিয়া গেল। এমন ভাবে কেহ যে স্বেচ্ছায় আসিয়া এই অন্দরে প্রবেশ করিতেও পারে, এ-ধারণা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও তিনি কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই। শ্রীবাসের অন্দর-প্রবেশ যেমন অতর্কিত, তেমনি ওই এক শ টাকার উষ্ণতায় উত্তপ্ত। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন

না, একমাত্র আশ্রয়স্থলের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, অতি দ্রুতপদে উপরে স্বামীর ঘরের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই ঘটনাবর্ত্তে এমন আকস্মিক জটিলতায় হতবাক্ হইয়া গেল। মানদা ফুলিয়া উঠিল ক্রুদ্ধ ক্রূর সাপিনীর মত। তাহার পূর্ব্বেই মজুমদার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, বউঠাকরুণ চ'লে গেলেন যে!

মানদা দংশনের সুযোগ পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল, বলিল, আমি তো রয়েছি, বলুন না কি বলছেন?

হাসিয়া মজুমদার বলিল, তুমি আর শুনে কি করবে, বল?

কেন যা হুকুম দেবার আমিই দেব। অন্দরই যখন কাছারি হয়ে উঠল, তখন আর আমার নায়েব ম্যানেজার হতে ক্ষেতিটা কি বলুন?

মজুমদারের মুখের হাসি তবু মিলাইয়া গেল না, সে বলিল, মানদার দাঁতগুলি যেমন চকচকে, তেমনি কি পাতলা ধারালো! তুমি শিলে শান দিয়ে দাঁত পরিষ্কার কর বুঝি?

মানদা হাসিয়া বলিল, এই দেখুন নায়েববাবু কি বলছেন দেখুন! বেজির দাঁতের কি শিল লাগে না শান লাগে? সাপ কাটবার মত ধার ভগবানই যে তার বজায় রাখেন গো। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু ঠিক এই সময়েই উপরের বারান্দা হইতে সুনীতি ডাকিলেন, মানদা!

মানদার রূপ পাল্টাইয়া গেল, সম্ভ্রমভরা মমতাসিক্ত স্বরে বলিল কি মা?

সুনীতি বলিলেন, মজুমদার-ঠাকুরপোকে কালকের দিনটা অপেক্ষা করতে বল। কাল ছোটবাড়ীর দাদার কাছে এর বিচার হবে: যা হয় তিনিই ক'রে দেবেন।

মজুমদার উঠিয়া পড়িল। মানদা বলিল, শুনলেন তো? এখন কি বলছেন, বলুন?

মজুমদার বলিল তোমাদের প্রজা শ্রীবাসকে বল মানদা। যা হয় সে-ই উত্তর দেবে।

মানদা বলিল, উকিলের বুদ্ধি নিয়েই তো মক্কেলে উত্তর দেবে নায়েববাবু। তাতেই একেবারে খোদ উকিলকেই জিজ্ঞেসা করছি।

শ্রীবাস কিন্তু বিনা পরামর্শেই উত্তর দিল, বলিল, অপেক্ষা আমি করতে পারব না, সে তুমি গিন্নীমাকে বল। তাতে খুনখারাপি হয়, হবে।

বারান্দায় রেলিঙে মাথা রাখিয়া সুনীতি দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটা গভীর অবসন্নতা তিনি অনুভব করিতেছিলেন, আর যেন সহ্য করিতে পারিতেছেন না। আগামী প্রভাতের চরের ছবি তাঁহার চোখের উপরে যেন নাচিতেছে। চরটা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহারই উপর পড়িয়া আছে রংলাল, নবীন, শ্রীবাস, আরও কত মানুষ। ঝরঝর করিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন; তাঁহার মনে হইল, সমস্ত কিছুর জন্য অদৃশ্য লোকের হিসাব-নিকাশ দায়িত্ব পড়িতেছে তাঁহারই স্বামীর উপর, সন্তানদের উপর। অস্থির হইয়া তিনি স্বামীর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

স্তব্ধ রামেশ্বর খাটের উপর বসিয়া আছেন পাথরের মূর্ত্তির মত, খোলা জানালার মধ্য দিয়া রাত্রির আকাশের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সুনীতি কঠিন চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিয়া নিরুচ্ছ্বসিতভাবেই বলিলেন, দেখ, একটা কথা বলছিলাম, না ব'লে যে আমি আর পারছি না।

রামেশ্বর ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া সুনীতির মুখের দিকে চাহিলেন, যেন কোন অজ্ঞাতলোক হইতে তিনি এই বাস্তব পরিবেষ্টনীর মধ্যে

ফিরিয়া আসিলেন। তারপর অতি মিষ্ট স্বরে বলিলেন, বল, কি বলছ, বল ?

খুব ভাল করিয়া গুছাইয়া, একটি একটি করিয়া সমস্ত কথা বলিয়া সুনীতি বলিলেন, তুমি একবার মজুমদারকে ডেকে একটু বল। তোমার অনুরোধ তিনি কখনই ঠেলতে পারবেন না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া রামেশ্বর ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিলেন, না।

সুনীতি আর অনুরোধ করিতে পারিলেন না, শুধু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। রামেশ্বর অভ্যাসমত মৃদুস্বরে বলিলেন, 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধি গুণে,—নাধমে লব্ধকামা'। সুনীতি, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা যদি ব্যর্থ হয় সেও ভাল, তবু অধমের কাছে ভিক্ষা ক'রে লব্ধকাম হওয়া উচিত নয়। তিনি নীরব হইলেন ; প্রদীপের আলোকে মৃদু আলোকিত ঘরখানা অস্বাভাবিকরূপে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহারই মধ্যে স্বামী ও স্ত্রী—মাটির পুতুলের মত একজন বসিয়া, অপর জন দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে রামেশ্বর বলিলেন, সুনীতি, আমার মাথায় একটু বাতাস করবে ? আর একটু জল।

সুনীতি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি জল আনিয়া গ্লাসটি রামেশ্বরের হাতে দিয়া বলিলেন, শরীর কি কিছু খারাপ বোধ হচ্ছে ?

চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িয়া রামেশ্বর বলিলেন, মাথায় যেন আগুন জ্বলছে সুনীতি।

জল দিয়ে মাথা ধুয়ে দেব ?

দাও।

সুনীতি সযত্নে মাথায় জল দিয়া ধুইয়া আপনার আঁচল দিয়া মুছিয়া দিলেন, তারপর জোরে জোরে বাতাস দিতে আরম্ভ করিলেন।

উৎকণ্ঠার আর তাঁহার সীমা ছিল না। উন্মাদ পাগল হইয়া গেলে তিনি করিবেন কি ?

সহসা রামেশ্বর বলিলেন, শ্রীবাস পাল অন্দরের মধ্যে চ'লে এল সুনীতি ! তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন ।

না না, দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল ।

দরজার মুখে ?

আবার কিছুক্ষণ পর তিনি বলিলেন, সন্ধ্যের পর আমি একটু ক'রে বাইরে বেরুব। দিনে পারব না। আলো চোখে সহ্য করতে পারি না। তা ছাড়া হাতে এই কদর্য্য ব্যাধি, লোক দেখবে। সন্ধ্যার পর আমি বরং একটু ক'রে কাজকর্ম্ম দেখব—হ্যাঁ, দেখব।

সুনীতির চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, অতি সন্তর্পণে বাঁ হাতে আঁচল তুলিয়া সে জল তিনি মুছিয়া ফেলিলেন ।

* * *

সমস্ত রাত্রি কিন্তু সুনীতির ঘুম হইল না। তাঁহার চিত্তলোকের কোমলতা অথবা দুর্ব্বলতা এতই ব্যাপক এবং সূক্ষ্ম যে, নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয় দূরান্তরের বহু মানুষের দুঃখের তরঙ্গ আসিয়া তাহাতে কম্পন তোলে, তাহাদের জন্য উদ্বেগে তিনি আকুল হইয়া উঠেন। আপনার দুঃখে তিনি পাথরের মত নিস্পন্দ, কিন্তু পরের জন্য না কাঁদিয়া তিনি পারেন না। আজ আগামী কালের ভয়াবহ দাঙ্গার কথা ভাবিয়া তাঁহার উদ্বেগের আর অবধি ছিল না। ভোর হইতেই তিনি ছাদে গিয়া উঠিলেন। ছাদ হইতে চরটা বেশ দেখা যায়। তিনি চাহিয়া দেখিলেন ; কিন্তু ঘন ঘাসের জঙ্গলের একটানা গাঢ় সবুজ বেশ, আর তাহারই মধ্যে সাঁওতাল-পল্লীর ঘরের ছাউনির নূতন খড়ের হলুদ রঙের চালাগুলি ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তিনি দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। পূর্ব্বদিগন্ত

হইতে সোনালী আলো ছড়াইয়া পড়িয়া চরখানাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অপরূপ করিয়া তুলিতেছে। মৃদু বাতাসে ঘাসের মাথা নাচিয়া নাচিয়া দুলিতেছে।

সহসা মনে হইল, একটা ক্রুদ্ধ বাদানুবাদের উচ্চধ্বনি তিনি শুনিতে পাইতেছেন। সামান্য ক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড একটা কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, চোখে জল আসিল। চোখের জল মুছিয়া আবার তিনি চাহিলেন, এবার দেখিলেন, কাশের বন যেন একটা দুরন্ত ঘূর্ণিতে আলোড়িত হইতেছে। চরের ভিতর হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ত্রস্ত কলরব করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। কতকগুলি চতুষ্পদ—কয়েকটা শিয়াল, আরও কতকগুলা অজানা জানোয়ার ঘাসের বন হইতে বাহির হইয়া নদীর বালিতে বালিতে ছুটিয়া পলাইতেছে। সুনীতি বাড়ীর ভিতর দিকের আলিসার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মানদাকে ডাকিয়া বলিলেন, খবর নে মা মানদা, চরের ওপর বোধ হয় ভীষণ দাঙ্গা বেধেছে।

মানদাও ছুটিয়া বাহির হইল। কিন্তু সংবাদ কিছু পাইল না, লোকে ছুটিয়া চলিয়াছে নদীর দিকে, চরে দাঙ্গা বাধিয়াছে। তাহার অধিক কেহ কিছু জানে না। দুয়ারের উপর মানদা উৎকণ্ঠিত ঔৎসুক্য লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আরও কিছুক্ষণ পর একটি শীর্ণকায় মানুষকে তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মানদা আরও একটু আগাইয়া পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

লোকটি অচিন্ত্যবাবু। প্রাণপণে দ্রুত বেগে পলাইয়া বাড়ী চলিয়াছেন, শ্বাস-প্রশ্বাসে ভদ্রলোক ভীষণভাবেই হাঁপাইতেছেন, আর মুখে বলিতেছেন, উঃ! বাপ রে! বাপ রে! ভীষণ কাণ্ড!

মানদাকে দেখিয়া তাঁহার কথার মাত্রা বাড়িয়া গেল; তিনি এবার বলিলেন, ভীষণ কাণ্ড! ভয়ঙ্কর দাঙ্গা! রক্তাক্ত ব্যাপার! খুন, খুন!

একজন মুসলমান খুন হয়ে গেল। নবীন লোহার দুর্দ্দান্ত লাঠিয়াল, মাথাটা দু টুকরো ক'রে দিয়েছে। তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই তিনি মানদাকে পিছনে ফেলিয়া অনেকটা চলিয়া গেলেন।

উপর হইতে সুনীতি নিজেই সব শুনিলেন, হু হু করিয়া চোখের জল ঝরিয়া তাঁহার মুখ-বুক ভাসিয়া গেল। ওই অজানা হতভাগ্যের জন্য তাঁহার বেদনার আর সীমা ছিল না।

১৫

সর্ব্বনাশা চর।

উহার বুকের মধ্যে কোথায় যেন লুকাইয়া আছে রক্তবিপ্লবের বীজ। দাঙ্গায় খুন হইয়া গেল একটা; তাহার উপর জখমের সংখ্যাও অনেক। চরের ঘাস বাহিয়া রক্তের ধারা মাটির বুকে গড়াইয়া পড়িল।

সুনীতি যেন দিশাহারার মত ভাঙিয়া পড়িলেন। রক্তাক্ত চরের কথা ভাবিতে গেলেই আরও খানিকটা রক্তাক্ত ভূমির কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কাছারির রক্তাক্ত প্রাঙ্গণ। হতভাগ্য ননী পাল! উঃ সে কি রক্ত! সেই রক্তের ধারা কি ও-পারের চরের দিকে গড়াইয়া চলিয়াছে? চরের রক্তের স্রোতের সঙ্গে কি ননীর রক্তের ধারা মিশিয়া গেল? নিরাশ্রয় দৃষ্টি মেলিয়া তিনি শূন্যলোকের নীলাভ মায়ার পরপারে আশ্রয় খুঁজিয়া ফেরেন।

ও-দিকে ইহার পরে মামলা-মকদ্দমা আরম্ভ হইয়া গেল।

প্রথমে অবশ্য চালান গেল উভয় পক্ষই; শ্রীবাস ও তার পক্ষীয় কয়েকজন লাঠিয়াল এবং এ-পক্ষের রংলাল, নবীন ও আরও চার-পাঁচজন। কিন্তু মজুমদারের তদ্বিরে, শ্রীবাসের অর্থের প্রাচুর্য্যে, শ্রীবাসের পক্ষই আইনের চক্ষে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। শ্রীবাসের ন্যায্য অধিকারের উপর চড়াও হইয়া নবীনের দল দাঙ্গা

করিয়াছে, যাহার ফলে নরহত্যা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে—এই অপরাধে তাহা দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়া গেল। রংলাল অনেক দিন পর্য্যন্ত দৃঢ় ছিল, কিন্তু শেষের দিকে সে ভাঙিয়া পড়িল। রাজসাক্ষীরূপে শ্রীবাসের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিয়া সে নবীনের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। তবু ঘরে মুখ লুকাইয়া সে কাঁদিত, বার বার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিত, ভগবান নবীনকে বাঁচাইয়া দাও। শ্রীবাসের অন্যায় তুমি প্রকাশ করিয়া দাও। কিন্তু ভগবান হয় বধির, নয় মূক।

সংবাদ শুনিয়া সুনীতি কাঁদিলেন। নবীনের জন্য তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল। এই বাড়ীর তিন পুরুষের চাকর এই নবীনের বংশ তাঁহাদের ছাড়ে নাই। নবীনই ছিল এ-বাড়ীর শেষ বাহুবল। সেও চলিয়া যাইবে। নবীনকে যে যাইতে হইবে, তাহাতে তাঁহার সংশয় নাই। তাঁহার মন বার বার সেই কথা বলিতেছে। সর্ব্বনাশা চর!

চরটার কথা ভাবিতে বসিয়া সুনীতি এক-এক সময় শিহরিয়া উঠেন। মনশ্চক্ষে তিনি যেন একটা নিষ্ঠুর চক্রান্তের ক্রূর চক্রবেগ চরখানাকে এই বাড়ীটিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্ত্তিত হইতে দেখিতে পান। এ আবর্ত্ত হইতে সরিয়া যাইবার যেন পথ নাই। মহীকে বলি দিয়াও সরিয়া যাওয়া গেল না। প্রাণপণ শক্তিতে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেও সরিয়া যাওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে যেন চক্রান্তের চক্র-পরিধি বিস্তৃত হইয়া যায়, বাড়ীর সংশ্লিষ্ট জনকে আবর্ত্তে ফেলিয়া সেই নিমজ্জমান জনের সহিত বন্ধনসূত্রের আকর্ষণে আবার টানিয়া এ-বাড়ীকে আবর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। নবীনের মামলায় সেটা সুনীতি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। দায়রার মামলায় তাঁহাকে পর্য্যন্ত টানিয়া প্রকাশ্য আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইবে। অহীন্দ্রকেও সাক্ষ্য দিতে হইয়াছে। রামেশ্বরের অবস্থা সেই দিন হইতে অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, এখন তিনি প্রায় বদ্ধ পাগল। ভাবিতে ভাবিতে

সুনীতি আর কূল-কিনারা দেখিতে পান না, তাঁহার অন্তরাত্মা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। ভবিষ্যতের একটা করাল ছায়া যেন ওই কল্পিত আবর্ত্তের ভিতর হইতে সমুদ্রমন্থনের শেষ ফল গরলবাষ্পের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে থাকে। সে বিষবাষ্পের উগ্র তিক্ত গন্ধের আভাস যেন তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছেন।

জীবনে তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডার, অক্ষয় ভাণ্ডার, কোনটি ভুলিবার উপায় নাই।

আদালতের পিয়ন একেবারে অন্দরের দরজার মুখে আসিয়া সমন জারি করিয়া গেল। মানদা দারুন ক্রোধে অগ্রসর হইয়া গিয়া সরকারী চাপরাসযুক্ত লোক দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এত বড় মুখরার মুখেও কথা সরিল না। পিয়নটাই বলিল, দায়রা-মামলার সাক্ষী মানা হয়েছে সুনীতি দেবীকে। সাত দিন পরে আঠারই আষাঢ় দিন আছে। হাজির না হ'লে ওয়ারেণ্ট হবে।

লোকটা চলিয়া গেল। মানদা কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আত্মসম্বরণ করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। তাহার অনুমান সত্য। বাড়ীর ফটকের বাহিরে তখন লোকটি আরও দুইটি লোকের সহিত মিলিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের একজন যোগেশ মজুমদার, অপর জন শ্রীবাস। সে প্রতিহিংসাপরায়ণা সাপিনার মতই প্রতিপক্ষকে দংশন করিবার জন্য অন্ধকার রাত্রের মত একটি সুযোগ কামনা করিতে করিতে ফিরিল।

সাক্ষীর সমন পাইয়া সুনীতি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা হইল দুর্য্যোগভরা অন্ধকার রাত্রে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত। এ কি করিবেন তিনি? কেমন করিয়া প্রকাশ্য আদালতে শত চক্ষুর সম্মুখে তিনি দাঁড়াইবেন? আপন অদৃষ্টের উপরে তাঁহার ধিক্কার জন্মিয়া গেল। এ যে লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। দায়রা-আদালতের সমন

অগ্রাহ্য করিলে ওয়ারেণ্ট হইবে; গ্রেপ্তার করিয়া হাজির করাই যে বিধি। আদালতের পিয়নের কথা তাঁহার কানে যেন এখনও বাজিতেছে।

ছি ছি ছি! আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া তিনি ছি-ছি করিয়া সারা হইয়া গেলেন। ছিল, পথ ছিল—একমাত্র পথ। কিন্তু সেও তাঁহার পক্ষে রুদ্ধ। মরিয়া নিষ্কৃতি পাইবারও যে উপায় তাঁহার নাই। অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ অসহায় স্বামীর কথা মনে করিয়া প্রতিদিন দেবতার সম্মুখে তাঁহাকে যে কামনা করিতে হয়, ঠাকুর, এ পোড়া অদৃষ্টে যেন বৈধব্যের বিধানই তুমি ক'রো। সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে কঙ্কণ নিয়ে মৃত্যুভাগ্য আমি চাই না, চাই না, চাই না। সে দুর্ভাগ্যের ভাগ্যই তাঁহার জীবনের যে একমাত্র কামনা।

মানদা ক্রোধে ক্রুর হইয়া ফিরিয়া আসিতেই তিনি দিশাহারার মত বলিলেন, আমি কি করব মানদা?

মানদা উত্তর দিতে পারিল না। মর্ম্মান্তিক দুঃখে, অসহ্য রাগে সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে সে চোখের জল মুছিয়া উপর দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, মাথার ওপরে তুমি বজ্রাঘাত কর। নির্ব্বংশ কর। তবেই বুঝবে তোমার বিচার; নইলে তুমি কানা—কানা—কানা।

সুনীতি এত দুঃখের মধ্যেও শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ছি মা, আমার অদৃষ্ট। কেন পরকে মিথ্যে শাপ-শাপান্ত করছিস?

মিথ্যে? আমি তো আমার চোখের মাথা খাই নাই মা, মুখপোড়া ভগমানের মত। আমি যে নিজের চোখে দেখে এলাম!

কি! কার কথা বলছিস?

মজুমদার আর শ্রীবাস চাষা। দুজনে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল গো। এ যে তাদের কীর্ত্তি গো।

মজুমদার ঠাকুরপো! না না, এতখানি ছোট কি মানুষ হতে পারে?

মানদা ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল, সে দুই হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, নাও, দু হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর মজুমদারকে—কর। সে আবার অকস্মাৎ ফু পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুনীতি উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে মূর্ত্তিমতী হতাশার মত চাহিয়া রহিলেন; সর্ব্বনাশা চর! অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, ওদিকে ঠাকুর-বাড়ীর দরজায় কে যেন আঘাত করিয়া ইঙ্গিতে আগমনের সাড়া জানাইতেছে। কোন মেয়েছেলে নিশ্চয়। এদিকের দুয়ার দিয়া যাওয়া-আসার অধিকার কেবল মহিলাদেরই। তিনি বলিলেন, দেখ্ তো মা মানদা, কে ডাকছেন।

মানদা শুনিয়াছিল, সে কিন্তু বেশ বুঝিয়াছিল, আসিয়াছেন রায়-বাড়ীর কোন বধূ বা কন্যা। আজিকার এই ঘটনা লইয়া লজ্জা দিতে আসিয়াছেন। বলিল, ডাকবে আবার কে? রায়গুষ্টির কেউ এসেছে। তোমাকে বলতে এসেছে, ছি ছি ছি! তোমাকে আদালতে সাক্ষী মেনেছে! কি ঘেন্নার কথা! খুলব না আমি দরজা, চুপ ক'রে থাক তুমি।

উত্তেজনায় মানদা এমন জ্ঞান হারাইয়াছিল যে, সুনীতিকে সে বার কয়েক 'তুমি' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া ফেলিল।

সুনীতি বলিলেন, মা, দরজা খুলে দেখ্, কে এসেছেন। খবরদার, কোন কড়া কথা বলিস নে যেন। গজগজ করিতে করিতে গিয়া দরজা খুলিয়াই মানদা বিস্ময়ে সম্ভ্রমে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে তাহাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছোট রায়-বাড়ীর গিন্নী হেমাঙ্গিনী, সঙ্গে তাঁহার বারো-তেরো বৎসরের মেয়ে উমা।

মানদা প্রসন্ন হইতে পারিল না। সুনীতি কিন্তু পরম আশ্বাসে

আশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, দিদি! মনে মনে যেন আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম দিদি।

হেমাঙ্গিনী সুন্দর হাসি হাসিয়া বলিলেন, আমি কিন্তু কিছু জান্‌তে পারি নি ভাই। দেবতা-টেবতা ব'লো না যেন। আজ আমি তোমার দাদার দূত হয়ে এসেছি। তিনিই পাঠালেন আমাকে।

সুনীতি ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিলেন, কেন দিদি?

বলছি। আরে উমা গেল কোথায়? উমা! উমা!

উমা ততক্ষণে বাড়ীর এদিক ওদিক সব দেখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কোথায় এক কোণ হইতে সে উত্তর দিল, কি?

হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, করছিস কি? এখানে এসে ব'স।

উত্তর আসিল, আমি সব দেখছি।

সুনীতি হাসিয়া বলিলেন, অ উমা-মা, এখানে এস না, তোমায় একবার দেখি।

উমা আসিয়া দরজায় দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমাকে ডাকছেন?

সুনীতি বলিলেন, বাঃ, উমা যে বড় চমৎকার দেখতে হয়েছে, অনেকটা বড় হয়ে গেছে এর মধ্যে! ওকে কলকাতায় আপনার বাপের বাড়ীতে রেখেছেন, নয় দিদি?

হ্যাঁ ভাই, এখানকার শিক্ষা-দীক্ষার ওপর আমার মোটেই শ্রদ্ধা নেই। ছেলেকে অনেক দিন থেকেই সেখানে রেখেছি, মেয়েকেও পাঠিয়ে দিয়েছি এক বছরের ওপর। তারপর মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, উনি কিন্তু ভারী চঞ্চল আর ভারী আদুরে। সেখানে গিয়ে কেবল বাড়ী আসবার জন্যে ঝোঁক ধরেন। অমল কিন্তু আমার খুব ভাল ছেলে, সে এখানে আসতেই চায় না। বলে, ভাল লাগে না এখানে।

উমা ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তা লাগবে কেন তার? দিনরাত্রি সে কলকাতায় ঘুরছেই—ঘুরছেই। বন্ধু কত তার সেখানে। আর আমাকে একা মুখটি বন্ধ ক'রে থাকতে হয়। সে বুঝি কারও ভাল লাগে?

সুনীতি হাসিলেন, বলিলেন, আপনি ভারী কঠিন দিদি, এই সব ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন কেমন ক'রে? ছেলেকে অবশ্য পাঠাতেই হয়, কিন্তু এই দুধের মেয়ে, একেও পাঠিয়ে দিয়েছেন?

হেমাঙ্গিনী কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মেয়েকে বলিলেন যা তুই, দেখে আয়, এদের বাড়ীটা ভারী সুন্দর, কিন্তু কাল দুপুরের মত বাইরে গিয়ে পড়িস নে যেন।

উমা চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী এতক্ষণে সুনীতিকে বলিলেন, জান সুনীতি, এই বাড়ীর কথাই আমার মনে অহরহ জাগে। আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না, ঠাকুরজামাইয়ের এই অবস্থার কারণ, এ-বাড়ীর এই দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ হ'ল রাধারাণী—ছোট রায়-বংশের মেয়ে। এত বড় দাম্ভিক মুখরার বংশ আর আমি দেখি নি ভাই। আমার ছেলেমেয়ে, বিশেষ ক'রে মেয়েকে আমি এর হাত থেকে বাঁচাতে চাই। রাধারাণীর অদৃষ্টের কথা ভাবি আর আমি শিউরে উঠি।

সুনীতি চুপ করিয়া রহিলেন, হেমাঙ্গিনী একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, তোমার দাদাই আমাকে পাঠালেন, তোমার কাছেই পাঠালেন।

সুনীতি ইন্দ্র রায়ের বক্তব্য শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, হেমাঙ্গিনী বলিলেন, দায়রা-মামলায় মজুমদারের চক্রান্তে যে তোমাকে সাক্ষী মানা হয়েছে, সে তিনি শুনেছেন।

মুহূর্ত্তে সুনীতি কাঁদিয়া ফেলিলেন, সে কান্নায় কোন আক্ষেপ ছিল

না, শুধু দুইটি চোখের কোণ বাহিয়া দুইটি অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। হেমাঙ্গিনী সস্নেহে আপনার অঞ্চল দিয়া সুনীতির মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, কাঁদছ কেন? সেই কথাই তো তোমার দাদা ব'লে পাঠালেন তোমাকে, সুনীতি যেন ভয় না পায়, কোন লজ্জা-সঙ্কোচ না করে। রাজার দরবারে ডাক পড়েছে, যেতে হবে, কিসের লজ্জা এতে?

আবার সুনীতির চোখের জলে মুখ ভাসিয়া গেল, তিনি নিজেই এবার আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, কিন্তু ওঁকে কার কাছে রেখে যাব দিদি? সেই যে আমার সকলের চেয়ে বড় ভাবনা। তারপর আমিই বা কার সঙ্গে সদরে যাব?

হেমাঙ্গিনী চিন্তাকুল মুখে বলিলেন, প্রথম কথাটাই আমরা ভাবি নি সুনীতি। শেষটার জন্যে তো আটকাচ্ছে না। সে তোমার ছেলেকে আসতে লিখলেই হবে, অহিনই তোমার সঙ্গে যাবে। কিন্তু—

সুনীতি বলিলেন, আরও ভাবছি কি জানেন? ওঁর এই মাথার গোলমালের ওপর এই খবরটা কানে গেলে যে কি হবে, সেই আমার সকলের চেয়ে বড় ভাবনা। এই দাঙ্গার আগের দিন, মজুমদার-ঠাকুরপো ওই শ্রীবাস পালকে সঙ্গে ক'রে একেবারে বাড়ীর মধ্যে চ'লে এলেন। আমি কি করব ভেবে না পেয়ে ছুটে গেলাম ওঁর কাছে। কথাটা ব'লেও ফেলেছিলাম। সেই শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন, বললেন, আমায় একটু জল দিতে পার সুনীতি? আমি বুঝলাম, বুঝে মাথা ধুয়ে দিলাম, বাতাস করলাম; কিন্তু তবু সমস্ত রাত্রি ঘুমোলেন না। তাই ভাবছি, এই কথা কানে গেলে উনি কি তা সহ্য করতে পারবেন?

হেমাঙ্গিনী চুপ করিয়া রহিলেন, তিনি উপায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, তুমি ব'লে রাখ এখন থেকে, তুমি ব্রত

করেছ, তোমায় গঙ্গাস্নানে যেতে হবে। ঠাকুরজামাইয়ের সেবাযত্নের ভার আমার ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে দিতে পারবে তো তুমি?

সুনীতি বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক হইয়া হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আবার অজস্র ধারায় তাঁহার চোখ বাহিয়া জল ঝরিতে আরম্ভ করিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, অহিনকে আসিতে চিঠি লেখ। রাত্রে সে ওঁর কাছে থাকবে; আমি তা হ'লে এ-বাড়ী ও-বাড়ী দু বাড়ীই দেখতে পারব। আর তোমার সঙ্গে আমার অমলকে পাঠিয়ে দেব। কেমন?

সুনীতির চোখে আর অশ্রুধারা-প্রবাহের বিরাম ছিল না। হেমাঙ্গিনী আবার তাঁহার চোখ-মুখ সযত্নে মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, কেঁদো না সুনীতি। আমিও যে আর চোখের জল ধ'রে রাখতে পারছি না। আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন, উমা! উমা!

উমার সাড়া কিন্তু কোথাও মিলিল না। হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বংশের স্বভাব কখনও যায় না। মুখপুড়ী কলকাতা থেকে এসে এমন বেড়াতে ধরেছে! বলে, দেখব না, কলকাতায় এমন মাঠ আছে? আকাশে মেঘ উঠেছে, এখুনি বৃষ্টি নামবে—মেয়ের সে খেয়াল নেই।

সুনীতি ডাকিলেন, মানদা! উমা-মা কোথায় গেল রে? দেখ্ তো। মানদারও সাড়া পাওয়া গেল না, সুনীতি ঘর হইতে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন দিবানিদ্রায় পরম আরামে মানদার নাক ডাকিতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, উপরে কোথায় যেন কলকণ্ঠে কেহ গান বা আবৃত্তি করিতেছে। হেমাঙ্গিনীও বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহারও কানে সুরটা প্রবেশ করিল, তিনি বলিলেন, ওই তো।

সুনীতি বলিলেন, ওঁর ঘরে।

সন্তর্পণে উভয়ে রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, উমা গভীর একাগ্রতার সহিত ছন্দলীলায়িত ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া সুমধুর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করিতেছে—

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে।
নবতৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে॥

সম্মুখে রামেশ্বর বিস্ফারিত বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে আবৃত্তিরতা স্বচ্ছন্দভঙ্গি উমার দিকে চাহিয়া আছেন। হেমাঙ্গিনী ও সুনীতি ঘরে প্রবেশ করিলেন; তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। বালিকার কলকণ্ঠের ঝঙ্কারে, নিপুণ আবৃত্তির শব্দার্থে সৃজিত রূপস্বপ্নে, কবিতার ছন্দের অন্তর্নিহিত সঙ্গীত-মাধুর্য্যে, একটি অপূর্ব্ব আনন্দময় ভাবাবেশে ঘরখানি বর্ষার সজল মেঘময় আকাশতলের শ্যামলস্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন কৃষিক্ষেত্রের মত পরিপূর্ণ হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারাও নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্লোকে শ্লোকে আবৃত্তি করিয়া উমা শেষ শ্লোক আবৃত্তি করিল—

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।

ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর রবে,
তীর ছাপি' নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মত নাচে রে
হৃদয় নাচে রে॥

আবৃত্তি শেষ হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে সেই আনন্দময় আবেশ তখনও যেন নীরবতার মধ্যে ছন্দে ছন্দে অনুভূত হইতেছিল। রামেশ্বর আপন মনেই বলিলেন, নাচে—নাচে—হৃদয় সত্যিই ময়ূরের মত নাচে।

হেমাঙ্গিনী এবার প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, ভাল আছেন চক্রবর্ত্তী মশায় ?

কে ?—স্বপ্নোত্থিতের মত রামেশ্বর বলিলেন, কে? তারপর ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন, রায়-গিন্নী! আসুন আসুন, কি ভাগ্য আমার !

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ও রকম ক'রে বললে যে লজ্জা পাই চক্রবর্ত্তী মশায়। আমি আপনাকে দেখতে এসেছি। তারপর কন্যাকে বলিলেন, তুমি প্রণাম করেছ উমা ? নিশ্চয় করনি। তোমার পিসেমশায়।

সবিস্ময়ে রামেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, আপনার মেয়ে ?

হ্যাঁ।

সাক্ষাৎ সরস্বতী। আহা, 'ময়ূরের মত নাচে রে হৃদয় নাচে রে'! কি মধুর !

উমা এই ফাঁকে টুপ করিয়া রামেশ্বরের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া লইল। পায়ে স্পর্শ অনুভব করিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া উমাকে প্রণাম

করিতে দেখিয়া রামেশ্বর চমকিয়া উঠিলেন, আর্ত্তস্বরে বলিলেন, না না, আমাকে প্রণাম করতে নেই। আমার হাতে—

হেমাঙ্গিনী বাধা দিয়া সকরুণ মিনতিতে বলিয়া উঠিলেন, চক্রবর্ত্তী মশায়, না না।

রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, জানালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, আকাশে মেঘ করেছে—দিক্‌হস্তীর মত কালো বিক্রমশালী জলভরা মেঘ। মহাকবি কালিদাসকে মনে প'ড়ে গেল। আপনার মনেই শ্লোক আবৃত্তি করছিলাম মেঘদূতের। এমন সময় আপনার মেয়ে এসে ঘরে ঢুকল। আমার মনে হ'ল কি জানেন? মনে হ'ল চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর লক্ষ্মী বুঝি চিরদিনের মত পরিত্যাগ করে যাবার আগে আমাকে একবার দেখা দিতে এসেছেন। আমি আবৃত্তি বন্ধ করলাম। আপনার মেয়ে—কি নাম বললেন?

হেমাঙ্গিনী উত্তর দিবার পূর্ব্বে উমাই উত্তর দিল, উমা দেবী।

উমা দেবী! হ্যাঁ, তুমি উমাও বটে, দেবীও বটে। উমা আমায় বললে, কিসের মন্ত্র বলছিলেন আপনি? আর একবার বলুন না। আমি বল্‌লাম, মন্ত্র নয়, শ্লোক, সংস্কৃত কবিতা। কবি কালিদাস মেঘদূতে বর্ষার বর্ণনা করেছেন, তাই আবৃত্তি করছিলাম। উমা আমায় বললে, আপনি বাংলা কবিতা জানেন না? কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি কি পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর খুব ভাল কবিতা আছে। আমি বললাম, তুমি জান? ও আমায় কবিতা শোনালে। বড় সুন্দর কবিতা, বড় সুন্দর কবিতা, বড় সুন্দর! বাংলায় এমন কাব্য রচিত হয়েছে! ভাগ্য, আমার ভাগ্য—পৃথিবীতে বঞ্চনাই আমার ভাগ্য। বাঃ, 'নীল অঞ্জন লেগেছে নয়নে লেগেছে'!

সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। উমা কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল,

কয়েক মুহূর্ত্ত কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল, আপনি কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক আমায় শোনাবেন বলেছেন।

রামেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, তোমার মত সুন্দর করে কি বলতে আমি পারব মা ?

উমা হাসিয়া বলিল, ওটা আমি আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার জন্যে শিখেছিলাম কিনা। কিন্তু আপনিও তো খুব ভাল বলছিলেন, বলুন আপনি।

রামেশ্বর কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া লইয়া বলিলেন, বলি শোন—

তাং পার্ব্বতীত্যাভিজনেন নাম্না, বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব ।
উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম ॥
মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্ ।
অনন্ত পুষ্পস্য মধোর্হি চুতে, দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা ॥

এর মানে জান মা ? পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের এক কন্যা হ'ল, গোত্র ও উপাধি অনুসারে আত্মীয়বর্গ, বন্ধুজনপ্রিয় সেই কন্যার নাম রেখেছিল পার্ব্বতী। পরে হিমাদ্রি-গৃহিণী সেই কন্যাকে তপস্যাপরায়ণা দেখে বলিলেন, উ মা! অর্থাৎ—বৎসে, ক'রো না, তপস্যা ক'রো না। সেই থেকে সুমুখী কন্যার নাম হ'ল উমা। তারপর কবি বলছেন, পর্ব্বতরাজের পুত্র-কন্যা আরও অনেকেই ছিল, কিন্তু বসন্তকালে অসংখ্যবিধ পুষ্পের মধ্যে ভ্রমর যেমন সহকারপুষ্পেই অনুরক্ত হয়, তেমনি পর্ব্বতরাজের চোখ দুটি উমার মুখের পরেই আকৃষ্ট হ'ত বেশি, সেইখানেই ছিল যেন পূর্ণ পরিতৃপ্তি। তুমি আমাদের সেই উমা। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তুমি প্রচুর বিদ্যাবতী হবে। আজ যা তুমি শোনালে—আহা! সেই উমারই মত বিদ্যা তোমার আপনি আয়ত্ত হবে।

তাং হংসমালাঃ শারদীব গঙ্গাং, মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে, প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ ॥

হেমাঙ্গিনী ও সুনীতির চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই এক মানুষ, আবার এই মানুষই ক্ষণপরে এমন অসহায় আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িবেন,, নিজের প্রতি নিজেরই অহেতুক ঘৃণায় এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করিবেন যে, অন্যের ইচ্ছা হইবে আত্মহত্যা করিতে।

উমা বলিল, আমায় সংস্কৃত কবিতা শেখাবেন আপনি? এখানে যে কদিন আছি আমি রোজ আপনার কাছে আসব।

আসবে? তুমি আসবে মা?

হ্যাঁ। কিন্তু এমন ক'রে ঘরের মধ্যে দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে থাকেন কেন আপনি? ওগুলো খুলে দিতে হবে কিন্তু।

মুহূর্তে রামেশ্বরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন, বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, রায়-গিন্নী, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

১৬

সেই বন্দোবস্তই হইল।

অহীন্দ্র কলেজ কামাই করিয়াই আসিল, সুনীতি অহীন্দ্রকে লইয়া একটু শঙ্কিত ছিলেন। রামেশ্বরের সন্তান, মহীর ভাই সে। অহীন্দ্র কিন্তু হাসিয়া বলিল, এর জন্যে তুমি এমন লজ্জা পাচ্ছ কেন মা? এ-সংসারে সত্যকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করা প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্ম, এতে রাজা-প্রজা নেই, ধনী-দরিদ্র নেই। বিচারক মানুষ হ'লেও তিনি তখন বিধাতার আসনে ব'সে থাকেন।

সুনীতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, শুধু তাই নয়, বুকে যেন তিনি বল পাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে বুকখানি পুত্রগৌরবেও ভরিয়া উঠিল। তিনি ছেলের মাথায় চুলগুলির ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে

বলিলেন, মুখহাত ধুয়ে ফেল্ বাবা, আমি দুখানা গরম নিমকি ভেজে দিই। ময়দা আমার মাখাই আছে।

মানদা নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল, সে এবার বলিয়া উঠিল, আপনি ভালই বললেন দাদাবাবু; কিন্তু আমার মন ঠাণ্ডা হ'ল না। বড় দাদাবাবু হ'লে—। অকস্মাৎ ক্রোধে সে দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিয়া উঠিল, বড়দাদাবাবু হ'লে ওই মজুমদার আর শ্রীবাসের মুণ্ড দুটো নখে ক'রে ছিঁড়ে নিয়ে আসতেন।

সুনীতি শঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া গেলেন; অহীন্দ্র কিন্তু মৃদু হাসিল, বলিল, আমিও নিয়ে আসতাম রে মানদা, যদি মুণ্ডু দুটো আবার জোড়া দিয়ে দিতে পারতাম। না হ'লে ওরা বুঝবে কি ক'রে যে, আমাদের মুণ্ডু ছিঁড়ে নিয়েছিল, আর এমন কাজ করব না।

সুনীতির চোখে এবার জল আসিল, অহীন্দ্র তাঁহার মর্ম্মকে বুঝিয়াছে, সংসারের দুঃখ কি কাহাকেও দিতে আছে? আহা, মানুষের মুখ দেখিয়া মায়া হয় না?

মানদা কি উত্তর দিতে গেল, কিন্তু রান্নাঘরে কাহার জুতার দ্রুত শব্দে সে নিরস্ত হইয়া দুয়ারের দিকে চাহিয়া রহিল। একলা মানদাই নয়, সুনীতি অহীন্দ্র সকলেই। পরমুহূর্ত্তেই ষোল-সতেরো বৎসরের কিশোর একটি ছেলে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। স্নিগ্ধ গৌর দেহবর্ণ, পেশীসবল দেহ—সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বপরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন তারুণ্যের একটি উজ্জ্বল লাবণ্য যেন ঝলমল করিতেছে।

সুনীতির সাগ্রহে আহ্বান করিয়া বলিলেন, অমল, এস।

সুনীতির কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অমল অহীন্দ্রকে হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, অহিন?

অহীন্দ্র স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, অহিন। তুমি অমল?

অমল বলিল, উঃ, কত দিন পরে দেখা বল তো? সেই

ছেলেবেলায় পাঠশালায়। কতদিন যে আমি তোমাকে চিঠি লিখব ভেবেছি! কিন্তু ইংলণ্ডের রাজা আর ফ্রান্সের রাজায় যুদ্ধ হ'ল, ফলে দুটো দেশের দেশবাসীরা অকারণে পরস্পরের শত্রু হতে বাধ্য হ'ল।— বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

অহীন্দ্রও হাসিয়া বলিল, ইউ টক ভেরী নাইস।

অমল বলিল, ইউ লুক ভেরী নাইস। ব্রাইট ব্লেড অব এ শার্প সোর্ড—কাব্যের ভাষায়, খাপখোলা সোজা তলোয়ার।

সুনীতি বিমুগ্ধদৃষ্টিতে দুইটি কিশোরের মিতালির লীলা দেখিতেছিলেন। তিনি এইবার মানদাকে বলিলেন, মানদা, দে তো মা, একখানা ছোট সতরঞ্চি পেতে। ব'স বাবা তোমরা, আমি নিমকি ভাজব, খাবে দুজনে তোমরা। উমাকে আনলে না কেন বাবা অমল।

অমল বলিল, তার কথা আর বলবেন না পিসিমা। অকস্মাৎ সে কাব্য নিয়ে, যাকে বলে ভয়ানক মেতে ওঠে, সেই ভয়ানক মেতে উঠেছে। অনবরত রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করছে, আবৃত্তি করছে। আমায় তো জ্বালাতন ক'রে খেলে।

সুনীতির সেই দিনের ছবি মনে প'ড়য়া গেল। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, আহা, তাঁহার যদি এমনি একটা কন্যা থাকিত, তবে এমনি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিত।

অমল বলিল, এই দেখুন পিসীমা, কাল তো আপনাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি সদরে, কিন্তু ফিরে এলেই যে অহিন পালাবে, সে হবে না।

অহিন হাসিয়া বলিল, আমার প্রাক্‌টিক্যাল ক্লাশ কামাই হবে ব'লে ভাবনা কিনা—

অমল ব'লিল, তুমি বুঝি সায়েন্স স্টুডেণ্ট? আই সী।

সুনীতি কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া কাঁপিয়া উঠিলেন। আদালতটা

লোকে গিসগিস করিতেছিল। অমল তাঁহার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, ভয় কি পিসীমা, কোন ভয় করবেন না। পরমুহূর্ত্তে সে আত্মগতভাবেই বলিয়া উঠিল, এ কি, বাবা এসে গেছেন দেখছি।

সুনীতি দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন, ঘর্ম্মাক্ত-পরিচ্ছদ, রুক্ষচুল, শুষ্কমুখ, অস্নাত, অভুক্ত ইন্দ্র রায় আদালতে প্রবেশ করিতেছেন, সঙ্গে একজন উকিল। উকিলটি আসিয়াই জজের কাছে প্রার্থনা করিল, মহামান্য বিচারকের দৃষ্টি আমি একটি বিশেষ বিষয়ে আকৃষ্ট করতে চাই। আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়ায় এই যে সাক্ষি—ইনি এই জেলার একটি সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বংশের বধূ। উভয় পক্ষের উকিলবৃন্দ যেন তাঁর মর্য্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও জেরা করেন। মহামান্য বিচারক সে ইঙ্গিত তাঁদের দিলে সাক্ষী এবং আমরা—শুধু আমরা কেন, সর্ব্বসাধারণই চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ইন্দ্র রায় সুনীতির কাঠগড়ার নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই বোন, আমি এই দাঁড়িয়ে রইলাম তোমার পেছনে।

সাক্ষ্য অল্পেই শেষ হইয়া গেল; বিচারক সুনীতির মুখের দিকে চাহিয়াই উকিলের আবেদনের সত্যতা বুঝিয়াছিলেন, তিনি অতি প্রয়োজনীয় দুই-চারিটা প্রশ্ন ব্যতীত সকল প্রশ্নই অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন। কাঠগড়া হইতে নামিয়া সুনীতি সেই প্রকাশ্য বিচারালয়ের সহস্র চক্ষুর সম্মুখে পায়ে হাত দিয়া ধূলা লইয়া ইন্দ্র রায়কে প্রণাম করিলেন। রায় রুদ্ধস্বরে বলিলেন, ওঠ বোন, ওঠ। তারপর অমলকে বলিলেন, অমল, নিয়ে এস পিসীমাকে। একটা গাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে রেখেছি, দেখি আমি সেটা।

দেখিবার কিন্তু প্রয়োজন ছিল না। রায়ের কর্ম্মচারী মিত্তির গাড়ী লইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। সুনীতি ও অমলকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া রায় অমলকে বলিলেন, তুমি পিসীমাকে নিয়ে

বাড়ী চ'লে যাও। আমার কাজ রয়েছে সদরে, সেটা সেরে কাল আমি ফিরব।

সুনীতি লজ্জা করিলেন না, তিনি অসঙ্কোচে রায়ের সম্মুখে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিত মুখে বলিলেন, আমার অপরাধ কি ক্ষমা করা যায় না দাদা ?

রায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, পৃথিবীতে সকল অপরাধই ক্ষমা করা যায় বোন, কিন্তু লজ্জা কোন রকমেই ভোলা যায় না।

* * *

পরামর্শ-অনুযায়ী অতি যত্নে সংবাদটি রামেশ্বরের নিকটে গোপনে রাখা হইয়াছিল। রচিত মিথ্যা কথাটি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন হেমাঙ্গিনী। তিনি বলিয়াছিলেন, সুনীতি একটা ব্রত করছে, একবার গঙ্গাস্নানে যেতে হয়, কিন্তু আপনাকে রেখে কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। আমি বলছি যে, আমি আপনার সেবাযত্নের ভার নেব ; ব্রত কি কখনও নষ্ট করে! আপনি ওকে বলুন চক্রবর্ত্তী মশায়।

রামেশ্বর উত্তর দিয়াছিলেন, না না না। রায়-গিন্নী ঠিক বলেছেন সুনীতি, ব্রত কি কখনও পণ্ড করে! আমি বেশ থাকব।

সন্ধ্যায় সুনীতি অমলের সঙ্গে রওনা হইয়া গেলেন। রাত্রির খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সুনীতি নিজেই করিয়া গিয়াছিলেন। অহীন্দ্র রামেশ্বরের কাছে রহিল। পরদিন হেমাঙ্গিনী সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন; দ্বিপ্রহরে খাবারের থালাখানি আনিয়া আসনের সম্মুখে নামাইয়া দিতেই রামেশ্বর স্মিতমুখে বলিলেন, সুনীতির ব্রত সার্থক হোক রায়-গিন্নী, তার গঙ্গাস্নানের পুণ্যেই বোধ করি আপনার হাতের অমৃত আজ আমার ভাগ্যে জুটল।

হেমাঙ্গিনী সকরুণ হাসি হাসিলেন। সত্যই সেকালে রামেশ্বর হেমাঙ্গিনীর হাতের রান্নার বড় তারিফ করিতেন। আজ রাধারাণী

গিয়াছে বাইশ-তেইশ বৎসর—এই বাইশ-তেইশ বৎসর পরে আজ আবার তিনি রামেশ্বরকে রাঁধিয়া খাওয়াইলেন। খাওয়া হইয়া গেলে হেমাঙ্গিনী বাসন কয়খানি উঠাইয়া লইবার উপক্রম করিতেই রামেশ্বর হাতজোড় করিয়া বলিলেন, না না রায়গিন্নী, না।

অহীন্দ্র বলিল, আমি মানদাকে ডেকে দিচ্ছি।

মানদা উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি লইয়া গেলে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, তা হ'লে এইবার আমি যাই চক্রবর্ত্তী মশায়।

রামেশ্বর সকরুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন চ'লেই তো গিয়েছিলেন রায়গিন্নী, এ বাড়ীতে আর যে কখনও পায়ের ধুলো দেবেন, এ স্বপ্নেও ভাবি নি। আবার যখন দয়া ক'রে এসেছেনই, তবে 'যাই' ব'লে যাচ্ছেন কেন, বলুন 'আসি'। যদি আর নাও আসেন, তবু আশা করতে পারব, আসবেন রায়গিন্নী একদিন না একদিন আসবেন।

কথাটা নিছক কৌতুক বলিয়া লঘু করিয়া লইবার অভিপ্রায়েই রায়গিন্নী বলিলেন, আপনার সঙ্গে মেয়েলী কথাতেও কেউ পারবে না চক্রবর্ত্তী মশায়। আচ্ছা তাই-ই বলছি, আসি। কেমন, হ'ল তো? তারপর তিনি অহীন্দ্রকে বলিলেন, তুমি এইবার আমার সঙ্গে এস বাবা অহিন, খেয়ে আসবে।

উভয়ে নীচে আসিয়া দেখিলেন, উমা মানদার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, চিনিস অহিনদাকে?

উমা বলিল, হ্যাঁ। অহিনদা যে ম্যাট্রিকে স্কলার্‌শিপ পেয়েছেন।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, সেইজন্যে চেন আমাকে? কিন্তু সে তো কপালে লেখা থাকে না।

মৃদু হাসিয়া উমা বলিল, থাকে।

বল কি?

হ্যাঁ। সায়েবদের মত যে ফরসা রং আপনার; দেখলেই ঠিক

চেনা যাবে যে, এই স্কলার্শিপ পেয়েছে। সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অহীন্দ্র এই প্রগল্ভা বালিকাটির কথায় লজ্জিত না হইয়া পারিল না। হেমাঙ্গিনী খাবারের থালা নামাইয়া দিয়া বলিলেন, ওর সঙ্গে কথায় তুমি পারবে না বাবা, তুমি খেতে ব'স। ও ওদের বংশের—। কথাটা বলিতে গিয়া তিনি নীরব হইয়া গেলেন।

উমা বসিয়া থাকিতে থাকিতে স্নুট করিয়া উঠিয়া একেবারে রামেশ্বরের দরজাটি খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক আবির্ভাবে রামেশ্বর পুলকিত হইয়া উঠিলেন, আপনার বিকৃতমস্তিষ্ক-প্রসূত রোগকল্পনার কথাও সে আকস্মিকতায় তিনি ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন উমা ? এস এস মা, এস।

উমা আসিয়া পরমাত্মীয়ের মত কাছে বসিয়া বলিল, বলুন, সংস্কৃত কবিতা বলুন।

রামেশ্বর অল্প হাসিয়া বলিলেন, তুমি বল মা বাংলা কবিতা, আমি শুনি। সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটি বল তো। তোমার মুখে, আহা, বড় সুন্দর লাগে! জান মা, মধুরভাষিণী গিরিরাজতনয়া যখন অমৃতস্রাবী কণ্ঠে কথা বলিতেন, তখন কোকিলদের কণ্ঠস্বরও বিষমবিদ্ধা বীণার কর্কশধ্বনি ব'লেই মনে হ'ত।

> স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব, প্রজাল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
> অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা, শ্রোতুর্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা।

তার চেয়ে তুমি বল, আমি শুনি।

উমাকে আর অনুরোধ করিতে হইল না, সে আজ কয়েক দিন ধরিয়া এই কারণেই শেখা কবিতাগুলি নূতন করিয়া অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছে।

রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া ;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎ-বাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।

* * *

ভৈরব তুমি কি বেশে এসেছ,
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী ;
রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল
সু-প্রভাতের রাগিণী ?
মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে,
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে ?
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল কাটিয়া
তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া।

রামেশ্বর বিস্ফারিত নেত্রে উমার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিতেছিলেন। আবৃত্তি শেষ করিয়া উমা বলিল, কেমন লাগল, বলুন ?

রামেশ্বর আবেশে তখন যেন আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, তবু অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব! বাঃ! 'তোমার খড়্গ আঁধার-মহিষে দুখানা করিল কাটিয়া'!—তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

উমা বলিল, আমি তবু বেশি জানি না, দু চারটে শিখেছি কেবল। আমার দাদা খুব জানেন। রবীন্দ্রনাথ একেবারে কণ্ঠস্থ। আর ভারী সুন্দর আবৃত্তি করেন। আপনি তাঁকে দেখেন নি, না ?

না, সে তো আসে নি, কেমন ক'রে দেখব, বল ?

দাঁড়ান, আসুন ফিরে পিসীমাকে নিয়ে। আমার পিসীমা কে, জানেন তো?

তোমার পিসীমা! তুমি তো ইন্দ্রের মেয়ে। তোমার পিসীমা!

হ্যাঁ। অহিদার মা-ই যে আমার পিসীমা। নন তো পিসীমা, আমরা বলি।

ও। ঠিক ঠিক, আমার মনে ছিল না।

আমার দাদাই তো তাঁকে নিয়ে সদরে গেছেন। আচ্ছা, পিসীমাকে কেন সাক্ষী মানলে, বলুন তো? কে কোথায় চরের ওপর দাঙ্গা করলে, উনি তার কি করবেন? ওই যে কে মজুমদার আছে, সে-ই খুব শয়তান লোক—ও-ই এ-সব করছে। এ কি, আপনি এমন করছেন কেন? পিসেমশায়! পিসেমশায়!

রামেশ্বরের দৃষ্টি তখন বিস্ফারিত, সমস্ত শরীর থরথর করিয়া কম্পমান, দুই হাতের মুঠি দিয়া খাটের মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, একটু জল দিতে পার মা—একটু জল?

পরক্ষণেই তিনি দারুণ ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন। উমা ব্যস্ত বিব্রত হইয়া বারান্দায় ছুটিয়া গিয়া ডাকিল, মা। ও মা! পিসেমশায় যে পড়ে গেলেন মেঝের ওপর। অহিদা!

জ্ঞান হইলে রামেশ্বর হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে তিরস্কার-ভরা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আপনি আমায় মিথ্যে কথা বললেন রায়-গিন্নী?

হেমাঙ্গিনী কথাটা বুঝিতে পারিলেন না, রামেশ্বর নিজেই বলিলেন, মজুমদার সুনীতিকে দায়রা-আদালতের কাঠগড়াতে দাঁড় করালে শেষ পর্যন্ত।

হেমাঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন। তবু তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, না, কে বললে আপনাকে?

রামেশ্বর উমার দিকে চাহিলেন, উমার মুখ বিবর্ণ, পাংশু। তিনি চোখ দুইটি বন্ধ করিয়া যেন ভাবিয়া লইয়াই বলিলেন, এই দিকে নীচে কাছারির বারান্দায় কে বলছিল, আমি শুনলাম।

হেমাঙ্গিনী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অহীন্দ্র পাখা দিয়া বাপের মাথায় বাতাস দিতেছিল, রামেশ্বর অকস্মাৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেখ তো অহি. আমার বন্দুকটা ঠিক আছে কিনা, দেখ তো।

অহীন্দ্র নীরবে বাতাস করিয়াই চলিল। রামেশ্বর আবার বলিলেন, দেখ অহি, দেখ।

অহীন্দ্র মৃদুস্বরে বলিল, বন্দুক তো নেই।

কি হ'ল? অকস্মাৎ যেন তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, মহী, মহী—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। জান তুমি অহি; মহী দ্বীপান্তর থেকে কবে ফিরবে, জান?

হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে জোর করিয়া শোয়াইয়া দিয়া বলিলেন, একটু ঘুমোন দেখি আপনি। যা তো উমা, বাক্স থেকে ওডিকলোনের শিশিটা নিয়ে আয় তো।

শুশ্রূষায় রামেশ্বর শান্ত হইয়া ঘুমাইলেন। যখন উঠিলেন, তখন সুনীতি ফিরিয়াছেন।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রামেশ্বর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুনীতির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, তুমি রাধারাণী না সুনীতি?

ঝরঝর-ধারায় চোখের জলে সুনীতির মুখ ভাসিয়া গেল। রামেশ্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তুমি সুনীতি, তুমি সুনীতি। সে এমন কাঁদত না, কাঁদতে সে জানত না।

অকস্মাৎ আবার বলিলেন, শোন, শোন—খুব চুপি চুপি। জজ সাহেব কি আমার খোঁজ করছিলেন? আমাকে কি ধ'রে নিয়ে যাবেন?

সুনীতি কোন সান্ত্বনা দিলেন না, কথার কোন প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিলেন না, নীরবে জানালাটা খুলিয়া দিলেন।

আবছা অন্ধকারের মধ্যেও চরটা দেখা যায়। যাইবেই তো, চক্রান্তের চক্রবেগে সেটা এই বাড়ীকেই বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে।

১৭

মামলার রায় বাহির হইল আরও আট মাস পর। দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া মকদ্দমা। দায়রা-আদালতের বিচারে দাঙ্গা ও নরহত্যার অপরাধে নবীন বাগ্দী ও তাহার সহচর দুইজন বাগ্দীর কঠিন সাজা হইয়া গেল। নবীনের প্রতি শাস্তি বিধান হইল ছয় বৎসর দ্বীপান্তর-বাসের; আর তাহার সহচর দুইজনের প্রতি হইল দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাসের আদেশ। দায়রা মকদ্দমা; সাক্ষীর সংখ্যা একশতেরও অধিক; তাহাদের বিবৃতি, জেরা এবং এই দীর্ঘ বিবৃতি ও জেরা বিশ্লেষণ করিয়া উভয় পক্ষের উকিলের সওয়াল-জবাব শেষ হইতে দীর্ঘ দিন লাগিয়া গেল। দাঙ্গা ঘটিবার দিন হইতে প্রায় দুই বৎসর।

রায় বাহির হইবার দিন গ্রামের অনেক লোকই সদরে গিয়া হাজির হইল। নবীন বাগ্দীর সংসারে উপযুক্ত পুরুষ কেহ ছিল না। তাহার উপযুক্ত পুত্র মারা গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে এক নাবালক পৌত্র, পুত্রবধূ ও তাহার স্ত্রী মতি বাগ্দিনী। মতি নিজেই সেদিন পৌত্রকে কোলে করিয়া সদরে গিয়া হাজির হইল। রংলাল কিন্তু যাইতে পারিল না; অনেক দিন হইতেই সে গ্রামে বাহির হওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। অতি প্রয়োজনে বাহির যখন হয়, তখন সে মাথা হেঁট করিয়াই চলে; সদর-রাস্তা ছাড়িয়া জনবিরল পথ বাছিয়া চলে। আজ সে বাড়ীর ভিতর দাওয়ার উপর গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার স্ত্রী বলিল, হ্যাঁ গো, বলি সকালবেলা থেকে বসলে যে? আলুগুলো তুলে না ফেললে আর তুলবে কবে? কোন্ দিন জল হবে, হ'লে আলু আর একটিও থাকবে না, সব প'চে যাবে।

রংলাল বলিল, হুঁ।

হুঁ তো বলছ, কিন্তু রইলে যে সেই ব'সেই রাজা-রুজিরের মত।—বলিয়া রংলালের স্ত্রী ঈষৎ না হাসিয়া পারিল না।

অকস্মাৎ রংলাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, ভগমান! এত লোক মরছে, আমার মরণ হয় না কেনে, বল দেখি? সংসারের কচকচি আর আমি সইতে লারছি।—বলিতে বলিতে সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার স্ত্রী অবাক হইয়া গেল, সে কি যে বলিবে, খুঁজিয়া পর্য্যন্ত পাইল না; বুঝিতেও সে পারিল না, অকস্মাৎ সংসার কোন্ যন্ত্রণায় এমন করিয়া রংলালকে অধীর করিয়া তুলিল। দুঃখে অভিমানে তাহারও চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল।

রংলাল কপালের রগ দুইটা আঙুল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মাথা আমার খ'সে গেল। আমি আজ খাব না কিছু।—বলিয়া সে ঘরে গিয়া উপুড় হইয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল।

আরও একজন অধীর উৎকণ্ঠার উদ্বেগে ও অসহ মনঃপীড়ায় পীড়িত হইতেছিলেন। অতি কোমল হৃদয়ের স্বভাবধর্ম্ম অতি-মমতায়, সুনীতি এখন হইতেই নবীন ও তাহার সহচর কয়জনের জন্য গভীর বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। উৎকণ্ঠার উদ্বেগে তাঁহার দেহমন যেন সকল শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। উনানে একটা তরকারি চড়াইয়া সুনীতি ভাবিতেছিলেন ওই কথাই। সোরগোল তুলিয়া মানদা আসিয়া বলিল, পোড়া পোড়া গন্ধ উঠছে যে গো। আপনি ব'সে এইখানে, আর তরকারি পুড়ছে! আমি বলি, মা বুঝি ওপরে গিয়েছেন। নামান, নামান।

এতক্ষণে সচকিত হইয়া সুনীতি গন্ধের কটুত্ব অনুভব করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চারিপাশে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, ওই যা, সাঁড়াসিটা আবার আনি নি। আন্ তো মা মানদা।

মানদা অল্প বিরক্ত হইয়াই বলিল, ওই যে সাঁড়াশি—ওই যে গো। বাঁ হাতের নীচেই যে গো।

সুনীতি এবার দেখিতে পাইলেন, সাঁড়াশিটার উপরেই বাঁ হাত রাখিয়া তিনি বসিয়া আছেন। তাড়াতাড়ি তিনি কড়াটা নামাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু হাতেও যেন কেমন সহজ শক্তি নাই, হাতখানা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মানদার সতর্ক সযত্ন দৃষ্টিতে সেটুকু এড়াইয়া গেল না, সে এবার উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিল, কর্ত্তাবাবু আজ কেমন আছেন মা?

ম্লান হাসিয়া সুনীতি বলিলেন, তেমনই আছেন।

বাড়ে নাই তো কিছু, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

না। কদিন থেকে বরং একটু শান্ত হয়েই আছেন।

তবে?—মানদা আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল।

সুনীতিও এবার বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, কি রে? কি বলছিস তুই?

মানদা বলিল এমন মাটির পিতিমের মত ব'সে রয়েছেন যে?

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি বলিলেন, নবীনদের মামলার আজ রায় বেরুবে মানদা? কি হবে বল্ তো ওদের? যদি সাজা হয়ে যায়—। আর তিনি বলিতে পারিলেন না, তাঁহার রক্তাভ পাতলা ঠোঁট দুইটি বিবর্ণ হইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল, কোমল দৃষ্টিতে চোখ দুইটি জলে ভাসিয়া বেদনার দুগ্ধ-সায়রের মত টলমল করিয়া উঠিল।

মানদাও একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, সে আর আপনি-আমি কি করব, বলুন? মানুষের আপন আপন অদেষ্ট; অদেষ্টের লেখন কি কেউ মুছতে পারে মা?

অসহায় মানুষের মামুলী সান্ত্বনা ছাড়া আর মানদা কিছু খুঁজিয়া পাইল না; কিন্তু সুনীতির হৃদয়ে অকৃত্রিম পরম মমতা চিরদিনের মতই আজও তাহাতে প্রবোধ মানিল না। জলভরা চোখে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তিনি বলিলেন, মানুষ ম'রে যায়, বুঝতে পারি মানদা—তাতে মানুষের হাত নেই। কিন্তু এ কি দুঃখ বল্ তো? এক টুকরো জমির জন্যে মানুষ মানুষকে খুন ক'রে ফেললে, আর তারই জন্যে, যে খুন করলে তাকে রেখে দেবে খাঁচায় পূরে জানোয়ারের মত, কিংবা হয়তো গলায় ফাঁসি লটকে—। কথা আর শেষ হইল না, চোখের জলের সমুদ্র সর্ব্বহৃদয়ব্যাপী প্রগাঢ় বেদনার অমাবস্যা-স্পর্শে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—হু হু করিয়া চোখের জল ঝরিয়া ঝরিয়া মুখ-বুক ভাসাইয়া দিল।

মানদার চোখও শুষ্ক রহিল না, তাহারও চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, সে আক্রোশভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি ভেবো না মা, ভগবান এর বিচার করবেনই করবেন। ঘরে আগুন লাগবে, নির্ব্বংশ হবে—

বাধা দিয়া সুনীতি বলিলেন, না না মানদা, শাপ-শাপান্ত করিস নে মা। কত বার তোকে বারণ করেছি, বল্ তো?

মানদা এবার সুনীতির উপরই রুষ্ট হইয়া উঠিল; সুনীতির এই কোমলতা সে কোনমতেই সহ্য করিতে পারে না। ক্রোধ নাই, আক্রোশ নাই, এ কি ধারার মানুষ! সে রুষ্ট হইয়াই সেস্থান হইতে অন্যত্র সরিয়া গেল।

সুনীতি বেদনাহত অন্তরেই আবার রান্নার কাজে ব্যস্ত হইয়া

উঠিলেন। রামেশ্বরের স্নান, আহারের সময় হইয়া আসিয়াছে। সেই ঘটনার পর হইতে রামেশ্বর আরও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন; পূর্ব্বে আপন মনেই অন্ধকার ঘরে কাব্য আবৃত্তি করিতেন, ঘরের মধ্যে পায়চারিও করিতেন, কিন্তু এখন অধিকাংশ সময়ই স্তব্ধ হইয়া ওই খাটখানির উপর বসিয়া থাকেন, আর প্রদীপের আলোয় হাতের আঙুলগুলি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখেন। কখনও কখনও সুনীতির সহিত কথার আনন্দের মধ্যে খাট হইতে নামিতে চাহেন, সুনীতি হাত ধরিয়া নামিতে সাহায্য করেন। অন্ধকারে রাত্রে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে মুক্ত পৃথিবীর সহিত অতি গোপন এবং ক্ষীণ একটি যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেন। আপনার দুর্ভাগ্যের মধ্যা মনে করিয়া সুনীতি ম্লান হাসি হাসেন, তখন চোখে তাঁহার জল আসে না।

পিতলের ছোট একটি হাঁড়িতে মুঠাখানেক সুগন্ধি চাল চড়াইয়া দিয়া স্বামীর স্নানের উদ্যোগ করিতে সুনীতি উঠিয়া পড়িলেন। এই বিশেষ চালটি ছাড়া অন্য চাল রামেশ্বর খাইতে পারেন না।

অপরাহ্নের দিকে সুনীতির মনের উদ্বেগ ক্রমশ যেন বাড়িয়াই চলিয়াছিল; সংবাদ পাইবার জন্য তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। অন্য দিন খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি স্বামীর নিকট বসিয়া গল্পগুজবে তাঁহার অস্বাভাবিক জীবনের মধ্যে সাময়িকভাবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন; কোন কোন দিন রামায়ণ বা মহাভারত পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন। আজ কিন্তু আর সেখানেও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। আজ তিনি বই লইয়াই বসিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠের মধ্যে পাঠকের অন্তরে যে তন্ময়যোগ থাকিলে শ্রোতার অন্তরকেও তন্ময়তায় বিভোর করিয়া আকর্ষণ করা যায়, আপন অন্তরের সেই তন্ময়যোগটি তিনি আজ আর কোনমতেই স্থাপন করিতে পারিলেন না।

একটা ছেদের মুখে আসিয়া সুনীতি থামিতেই রামেশ্বর বলিলেন, তুমি যদি সংস্কৃতটা শিখিতে সুনীতি, তোমার মুখে মূল মহাকাব্য শুনতে পেতাম। অনুবাদ কিনা, এতে কাব্যের আনন্দটা পাওয়া যায় না।

সুনীতি অপরাধিনীর মত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আজ তা হলে এই পর্য্যন্তই থাক।

রামেশ্বর অভ্যাসমত মৃদুস্বরে বলিলেন, থাক। তারপর মাটির পুতুলের মত নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। সুনীতি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। রামেশ্বর সহসা বলিলেন, অহিন—অহিন কোথায় পড়ে, বল তো?

বহরমপুর মুরশিদাবাদে। এই যে কাল তুমি মুরশিদাবাদের গল্প করলে, বললে, অহিন খুব ভাল জায়গায় আছে; আমাদের দেশের ইতিহাস মুরশিদাবাদ না দেখলে জানাই হয় না।

হ্যাঁ হ্যাঁ। রামেশ্বরের এবার মনে পড়িয়া গেল। সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। জান সুনীতি, এই—

বল।

এই, মানুষের সকলের চেয়ে বড় অপরাধ হ'ল মানুষকে হত্যা করার অপরাধ। ও অপরাধ কখনও ভগবান ক্ষমা করবেন না। মুরশিদাবাদের চারিদিকে সেই অপরাধের চিহ্ন। আর সেই হ'ল তার পতনের কারণ। উঃ ফৈজীকে নবাব দেওয়াল গেঁথে মেরেছিল। একটা ছোট অন্ধকূপের মত ঘরে পুরে দরজাটা তার গেঁথে দিয়েছিল। যেমন ক'রে আনার কলিকে মেরেছিল—উঃ। রামেশ্বর চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—হে ভগবান! হে ভগবান!

সুনীতির চোখ সজল হইয়া উঠিল, নীরবে নতমুখে বসিয়া থাকার সুযোগে সে-জল চোখ হইতে মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাঁহার মনে পড়িতেছিল—ননী পালকে, হতভাগ্য মহীন—

তাঁহার মহীনকে—চরের দাঙ্গায় নিহত সেই . অজানা-অচেনা হতভাগ্যকে, হতভাগ্য নবীন ও তাহার সহচর কয়েকজনকে। তিনি গোপনে চোখ মুছিয়া ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য উঠিলেন: একবার মানদাকে পাঠাইবেন সংবাদের জন্য।

রামেশ্বর ডাকিলেন, সুনীতি! কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন; রামেশ্বরের কণ্ঠস্বর বড় ম্লান, কাতরতার প্রকাশ তাহাতে সুস্পষ্ট।

সুনীতি উদ্বিগ্ন হইয়াই ফিরিলেন, কি বলছ?

রামেশ্বর কাতর দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, দেখ। আমার—আমার শরীরটা—দেখ, আমাকে একটু শুইয়ে দেবে?

সযত্নে স্বামীকে শোয়াইয়া দিয়া সুনীতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বলিলেন, শরীর কি খারাপ বোধ হচ্ছে?

সে কথার জবাব না দিয়া রামেশ্বর বলিলেন, আমার গায়ে একখানা পাতলা চাদর টেনে দাও তো, আর ওই আলোটা, ওটাকে সরিয়ে দাও!—বলিতে বলিতেই তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন, ঈষৎ উত্তেজিত স্বরেই এবার তিরস্কার করিয়া বলিলেন, তুমি জান, আমার চোখে আলোর মধ্যে যন্ত্রণা হয়, তবু ওটা জ্বালিয়ে রাখবে দপদপ ক'রে?

প্রতিবাদে ফল নাই, সুনীতি তাহা ভাল করিয়াই জানেন; তিনি নীরবেই আলোটা কোণের দিকে সরাইয়া দিলেন, পাতলা একখানি চাদরে স্বামীর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার মন বার বার বাহিরের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছিল। ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া সুনীতি ডাকিলেন, মানদা!

মানদা দিবানিদ্রা শেষ করিয়া উঠান ঝাঁট দিতেছিল, সে বলিল, কি মা?

একবার একটা কাজ করবি মা?

বলুন।

একবার পাড়ায় একটু বেরিয়ে জেনে আয় না মা, সদর থেকে খবর-টবর কিছু এসেছে কি না।

মানদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এর মধ্যে কোথায় কে ফিরবে গো, আর ফিরবেই বা কেমন ক'রে? ফিরতে সেই রাত আটটা-নটা।

সে-কথা সুনীতি নিজেও জানেন, তবুও বলিলেন, ওরে, বার্ত্তা আসে বাতাসের আগে। লোক কেউ না আসুক, খবর হয়তো এসেছে, দেখ না একবার। মায়ের কথা শুনলে তো পুণ্যিই হয়।

ঝাঁটাটা সেইখানেই ফেলিয়া দিয়া মানদা বিরক্তভরেই বাহির হইয়া গেল। সুনীতি স্তব্ধ হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, বাগ্দীপাড়ায় যদি কেহ কাঁদে, তবে সে কান্না তো ছাদের উপর হইতে শোনা যাইবে। কম্পিতপদে তিনি ছাদে উঠিয়া শূন্য দৃষ্টিতে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি স্বস্তির একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, নাঃ, কেহ কাঁদে না। এতক্ষণে তাঁহার দৃষ্টি সজাগ হইয়া উঠিল; আপনাদের কাছারির সম্মুখের খামার-বাড়ীর দিকেই তিনি তাকাইয়াছিলেন; একটা লোক ধানের গোলার কাছে দাঁড়াইয়া কি করিতেছে! লোকটা তাঁহাদেরই গরুর মাহিন্দার; ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন, খড়ের পাকানো মোটা 'বড়' দিয়া তৈয়ারি মরাইটার ভিতর একটা লাঠি গুঁজিয়া ছিদ্র করিয়া ধান চুরি করিতেছে। তিনি লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, উপরে চোখ তুলিতেই সে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। অতি সন্তর্পণে সেদিক হইতে সরিয়া ছাদের ও-পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। গ্রামের ভাঙা তটভূমির কোলে কালীর বালুময় বুক চৈত্রের অপরাহ্ণে উদাস হইয়া উঠিয়াছে। কালীর ও-পারে চর, সর্ব্বনাশা চর! কিন্তু চরখানি আজ

তাঁহার চোখ জুড়াইয়া দিল। চৈত্রের প্রারম্ভে কচি কচি বেনাঘাসের পাতা বাহির হইয়া চরটাকে যেন সবুজ মখমলের মত মুড়িয়া দিয়াছে। হালকা সবুজের মধ্যে সাঁওতালদের পল্লীটির গোবরে-মাটিতে নিকানো, খড়িমাটির আলপনা-দেওয়া ঘরগুলি যেন ছবির মত সুন্দর। উঃ, পল্লীটি ইহার মধ্যে কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! সম্পূর্ণ একখানি গ্রাম। পল্লীর মধ্য দিয়া বেশ একটি সুন্দর পথ; সবুজের মধ্যে শুভ্র একটি আঁকা-বাঁকা রেখা, নদীর কূল হইতে সাঁওতাল-পল্লী পার হইয়া প্রান্তরের মধ্য দিয়া ও-পারের গ্রামের ঘন বনরেখার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। সাঁওতালদের পল্লীর আশেপাশে কতকগুলি কিশোর গাছে নূতন পাতা দেখা দিয়াছে। চোখ যেন তাঁহার জুড়াইয়া গেল। তবুও তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিলেন না। এমন সুন্দর চর, এমন কোমল—এখান হইতেই সে কোমলতা তিনি যেন অনুভব করিতেছেন—তাহাকে লইয়া এমন হানাহানি কেন করে মানুষ? আর, কোথায়—চরটার কোন্ অন্তস্তলে লুকাইয়া আছে এমন সর্ব্বনাশা চক্রান্ত?

নীচে হইতে মানদা ডাকিতেছিল, সুনীতি ত্রস্ত হইয়া দোতলার বারান্দায় নামিয়া আসিলেন। নীচের উঠান হইতে মানদা বলিল, এক-এক সময় আপনি ছেলেমানুষের মত অবুঝ হয়ে পড়েন মা। বললাম, রাত আটটা-নটার আগে কেউ ফিরবে না, আর না ফিরলে খবর আসবে না। টেলিগেরাপ তো নাই মা আপনার শ্বশুরের গাঁয়ে যে, তারে তারে খবর আসবে।

সুনীতি!—ঘরের ভিতর হইতে রামেশ্বর ডাকিতেছিলেন। শান্ত মনেই সুনীতি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রামেশ্বর বালিসে ঠেস দিয়া অর্দ্ধশায়িতের মত বসিয়া আছেন, সুনীতিকে দেখিয়া স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠেই বলিলেন, অহিনকে লিখে দাও তো,

রবীন্দ্রনাথ ব'লে যে বাংলা ভাষার কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থ যেন সে নিয়ে আসে। তা হ'লে তুমি পড়বে, তাতে কাব্যের রস পূরোই পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, আর কাদম্বরীর অনুবাদ থাকে। বুঝলে?

সংবাদ যথাসময়ে আসিল এবং শ্রীবাস ও মজুমদারের কল্যাণে উচ্চরবেই তাহা তৎক্ষণাৎ রীতিমত ঘোষিত হইয়া প্রচারিত হইয়া গেল। সেই রাত্রেই সর্ব্বরক্ষা-দেবীর স্থানে পূজা দিবার অছিলায় গ্রামের পথে পথে তাহারা ঢাক-ঢোল লইয়া বাহির হইল। ইন্দ্র রায়ের কাছারিতে রায় গম্ভীর মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার কাছারির সম্মুখে শোভাযাত্রাটি আসিবামাত্র তিনি হাসিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পথের উপরেই দাঁড়াইলেন।

শোভাযাত্রাটির গতি স্তব্ধ হইয়া গেল।

রায় বলিলেন, জনার্দ্দন কলিতে আজকাল পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেছেন; সুতরাং তিনি যে তোমাদের পক্ষে, এ আমি জানতাম মজুমদার। তারপর, নব্‌নেটাকে দিলে লটকে?

মজুমদার বিনীত হাসি হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে না, নবীনের ছ বছর দ্বীপান্তর হ'ল, আর দুজনের দু বছর ক'রে জেল।

রায় হাসিয়া বলিলেন, তবে আর করলে কি হে? এস এস, একবার ভেতরেই এস, শুনি বিবরণ। কই, শ্রীবাস কই? এস পাল, এস।

কৃত্রিম শ্রদ্ধার সমাদরের আহ্বানে শ্রীবাস ও মজুমদার উভয়েই শুকাইয়া গেল। সভয়ে মজুমদার বলিল, আজ্ঞে, আজ মাপ করুন, পূজো দিতে যাচ্ছি।

ঢাক বাজিয়ে পূজো দিতে যাচ্ছ, কিন্তু বলি কই হে? চরে বলি হয়ে গেল, আর মা সর্ব্বরক্ষার ওখানে বলি দেবে না? মায়ের জিভ যে লকলক করছে, আমি যে দিব্যচক্ষে দেখছি।

মজুমদার ও শ্রীবাসের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত

বাজনদার ও অনুচরের দল সভয়ে শ্বাসরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রায় আর দাঁড়াইলেন না, তিনি আবার একবার মৃদু হাসিয়া ছোট্ট একটি "আচ্ছা" বলিয়া কাছারির ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পর স্তব্ধ শ্রীবাস ও যোগেশ মজুমদার অনুভব করিল, আলো যেন কমিয়া আসিতেছে। পিছনে ফিরিয়া মজুমদার দেখিল, শ্রীবাসের হাতের আলোটি ছাড়া আর একটিও আলো নাই, বাজনদার অনুচর সকলেই কখন নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে।

ওদিকে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে সুনীতি স্তব্ধ হইয়া দাওয়ার উপর বসিয়া ছিলেন, চোখ দিয়া জল ঝরিতেছিল অন্ধকারের আবরণের মধ্যে। তাঁহার সম্মুখে নাতিকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল নবীনের স্ত্রী। সেও নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। বহুক্ষণ পর সে বলিল, সদরে সব বললে হাইকোর্টে দরখাস্ত দিতে।

সুনীতি কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, দরখাস্ত নয়, আপীল।

খালাস যদি না হয় রাণীমা, তবে আপনকারা ছাড়া আমরা তো কাউকে জানি না।

কিন্তু খরচ যে অনেক মা; সে কি তোরা যোগাড় করতে পারবি?

নবীনের স্ত্রী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুনীতি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তাও পরামর্শ ক'রে দেখব বাগ্দী-বউ; অহিন আসুক, আর পাঁচ-সাত দিনেই তার পরীক্ষা শেষ হবে, হ'লেই সে আসবে।

মতি বাগ্দিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আপনকারা তাকে কাজে জবাব দিয়েছিলেন; কিন্তু আমাকে যে আপুনি না রাখলে কেউ রাখবার নাই রাণীমা।

* * * *

অহীন্দ্র বাড়ী আসিতেই সুনীতি তাহাকে ইন্দ্র রায়ের নিকট পাঠাইলেন। মনে গোপন সঙ্কল্প ছিল, চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় হইলে আপনার অবশিষ্ট অলঙ্কার হইতেও কিছু বিক্রয় করিয়া খরচ সংস্থান করিয়া দিবেন। কিন্তু রায় নিষেধ করিলেন, বলিলেন, খরচ অনেক, শতকের মধ্যেও কুলোবে না বাবা। তা ছাড়া—। অকস্মাৎ তিনি হাসিয়া বসিলেন, তোমরা আজকালকার, কি বলে, ইয়ংমেন, তোমরা ভাববে, আমরা প্রাচীন কালের দানব সব; কিন্তু আমরা বলি কি, জান? ছ বছর জেল খাটতে নবীনের মত লাঠিয়ালের কোন কষ্টই হবে না। বংশানুক্রমে ওদের এ-সব অভ্যেস আছে।

অহীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রায় হাসিয়া বলিলেন, তুমি তো চুপ ক'রে রইলে; কিন্তু অমল হ'লে একচোট বক্তৃতাই দিয়ে দিত আমাকে। এখন একজামিন কেমন দিলে, ব'ল?

এবার স্মিতমুখে অহীন্দ্র বলিল, ভালই দিয়েছি আপনার আশীর্ব্বাদে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় বলিলেন, আশীর্ব্বাদ তোমাকে বার বার করি অহীন্দ্র। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়—

অহীন্দ্র কথাটা সমাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। রায় বলিলেন তোমার বাবাকে এবার কেমন দেখলে বল তো?

ম্লান কণ্ঠে অহীন্দ্র বলিল, আমি তো দেখছি, বেড়েছে মাথার গোলমাল।

রায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, যাও, বাড়ীর ভেতরে যাও, তোমার—মানে, অমলের মা এরই মধ্যে চার-পাঁচ দিন তোমার নাম করেছেন।

অহীন্দ্রকে বাড়ীর মধ্যে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী আনন্দে যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। অহীন্দ্র প্রণাম করিতেই উজ্জ্বল মুখে প্রশ্ন করিলেন, পরীক্ষা কেমন দিলে বাবা?

ভালই দিয়েছি মামীমা, আপনার আশীর্ব্বাদে।

অমল কি লিখেছে জান? সে লিখেছে অহিনের এবার ফার্স্ট হওয়া উচিত।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, সে আমাকেও লিখেছে। সে তো এবার ছুটিতে আসছে না লিখেছে।

না। সে এক ধন্যি ছেলে হয়েছে বাবা। তাদের কলেজের ছেলেরা দল বেঁধে কোথায় বেড়াতে যাবে, তিনি সেই হুজুকে মেতেছেন। তার জন্যে উমার এবার আশা হ'ল না।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন অমল আসিয়া হাজির হইল। আষাঢ়ের প্রথমেই ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘ করিয়া বর্ষা নামিয়াছিল, সেই বর্ষা মাথায় করিয়া গভীর রাত্রে স্টেশন হইতে গরুর গাড়ী করিয়া একেবারে অহীন্দ্রদের দরজায় আসিয়া সে ডাক দিল, অহিন! অহিন!

ঝড় ও বর্ষণের সেদিন সে এক অদ্ভুত গোঙানি! সন্ধ্যার পর হইতেই এই গোঙানিটা শোনা যাইতেছে। অহীন্দ্র ঘুম ভাঙিয়া কান পাতিয়া শুনিল, সত্যই কে তাহাকে ডাকিতেছে।

সে জানালা খুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে?

আমি অমল। ভিজে ম'রে গেলাম, আর তুমি বেশ আরামে ঘুমোচ্ছ? বাঃ, বেশ!

তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, তুমি এমনভাবে?

অমল অহীন্দ্রের হাতে ঝাঁকুনি দিয়া বলিল, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স! তুমি ফোর্থ হয়েছ।

অহীন্দ্র সর্ব্বাঙ্গসিক্ত অমলকে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় বুকে জড়াইয়া ধরিল। শব্দ শুনিয়া সুনীতি উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, সমস্ত শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া

উঠিয়াছে। চোখ যেন তাঁহার সমুদ্র, আনন্দের পূর্ণিমায়, বেদনার অমাবস্যায় সমানই উথলিয়া উঠে।

অহীন্দ্র বলিল, অমলকে খেতে দাও মা।

সুনীতি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অমল বলিল, না পিসীমা, স্টেশনে এক পেট খেয়েছি; এখন যদি আবার খাওয়ান তবে সেটা সাজা দেওয়া হবে। বরং চা এক পেয়ালা ক'রে দিন। আর অহিন, আলোটা আন তো, ব্যাগ থেকে কাপড়-জামা বের ক'রে পাল্‌টে ফেলি। বাড়ী আর যাব না রাত্রে, কাল সকালে যাব।

চা করিয়া খাওয়াইয়া অহীন্দ্র ও অমলকে শোয়াইয়া আনন্দ-অধীর চিত্তে সুনীতি স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। রামেশ্বর খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া বাহিরের দুর্য্যোগের দিকে চাহিয়া ছিলেন, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে, কিন্তু সে তীব্র আলোকের মধ্যেও নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। বিদ্যুৎ চমকের আলোকে সুনীতি দেখিলেন, গ্রামের প্রান্তে প্রান্তে কালীর বুক জুড়িয়া বিপুলবিস্তার একখানা সাদা চাদর কে যেন বিছাইয়া দিয়াছে। ঝড় ও বর্ষণের মধ্যে যে অদ্ভুত গোঙানি শোনা যাইতেছে, সেটা ঝড়ের নয়, বর্ষণের নয়, কালীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জন। কালীর বুকে বন্যা আসিয়াছে।

১৮

আষাঢ়ে প্রথম সপ্তাহে এবার কালিন্দীর বুকে বান আসিয়া পড়িল।

এক দিকে রায়হাট, অন্য দিকে সাঁওতালদের 'রাঙাঠাকুরের চর'—এই উভয়ের মাঝে রাঙা জলের ফেনিল আবর্ত্ত ফুলিয়া ফুলিয়া খরস্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আবর্ত্তের মধ্যে কুটিল কলকল শব্দ শুনিয়া মনে হয়, সত্য সত্যই কালী যেন খলখল করিয়া হাসিতেছে। কালী এবার ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিয়াছে।

গত কয়েক বৎসর কালিন্দীর বন্যা তেমন প্রবল কিছু হয় নাই, এবার আষাঢ়ের প্রথমেই ভীষণ বন্যায় কালী ফাঁপিয়া ফুলিয়া রাক্ষসীর মত হইয়া উঠিল। বর্ষাও নামিয়াছে এবার আষাঢ়ের প্রথমেই। জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির দিনই আকাশের ভ্রাম্যমাণ মেঘপুঞ্জ ঘোরঘটা করিয়া আকাশ জুড়িয়া বসিল। বর্ষণ আরম্ভ হইল অপরাহ্ণ হইতেই। পরদিন সকাল—অর্থাৎ পয়লা আষাঢ়ের প্রাতঃকালে দেখা গেল, মাঠঘাট জলে থৈ-থৈ করিতেছে। ধানচাষের 'কাড়ান' লাগিয়া গিয়াছে। ইহাতেই কিন্তু মেঘ ক্ষান্ত হইল না, তিন-চার দিন ধরিয়া প্রায় বিরামহীন বর্ষণ করিয়া দিল! কখনও প্রবল ধারায়, কখনও বা রিমিঝিমি, কখনও অতি মৃদু ফিনকির মত বৃষ্টির ধারাগুলি বাতাসের বেগে কুয়াশার বিন্দুর মত ভাসিয়া যাইতেছিল। অনেককালের লোকও বলিল, এমন সৃষ্টিছাড়া বর্ষা তাহারা জীবনে দেখে নাই। এ-বর্ষাটির না আছে সময়জ্ঞান, না আছে মাত্রাজ্ঞান।

দেখিতে দেখিতে কালীর বুকেও বন্যা আসিয়া গেল দুর্দান্ত ঝ'ড়ো হাওয়ার মত। এ-বেলা ও-বেলা বান বাড়িতে বাড়িতে রায়হাটের তালগাছপ্রমাণ উঁচু, ভাঙা কূলের কানায় কানায় হইয়া উঠিল; ভাঙা তটের কোলে কোলে কালীর লাল জল সূর্য্যের আলোয় রক্তাক্ত ছুরির মত ঝিলিক হানিয়া তীরের গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে খানিকটা করিয়া রায়হাটের কূল কাটিয়া ঝুপঝুপ শব্দে খসিয়া পড়িতেছে।

রায়হাটের চাষীরা বলে, কালী জিব দিয়ে চাটছে রাক্ষসীর মত; ভাগ্যে আমাদের কাঁকুরে মাটি!

সত্য কথা। রায়হাটের ভাগ্য ভাল যে, রায়হাটের বুকে সাঁওতাল পরগণার মত কঠিন রাঙা মাটি ও কাঁকর দিয়া গড়া। নরম পলিমাটিতে গঠিত হইলে কালীর শাণিত জিহ্বার লেহনে কোমল মাটির তটভূমি

হইতে বিস্তৃত ধস, কোমল দেহের মাংসপিণ্ডের মত খসিয়া পড়িত। রায়হাট ইহারই মধ্যে কঙ্কালসার হইয়া উঠিত। দুই-তিন বৎসরে কালী মাত্র হাত-পাঁচেক পরিমিত কূল রায়হাটের কোলে কোলে খাইয়াছে। এবার কিন্তু বন্যাতেই ইহার মধ্যে হাত দুয়েক খাইয়া ফেলিয়াছে, এখনও পূর্ণ ক্ষুধায় লেহন করিয়া চলিয়াছে। ও-পারে চরটাও এবার প্রায় চারিদিকে বন্যায় ডুবিয়া ছোট একটি দ্বীপের মত কোনমতে জাগিয়া আছে। চরের উপরেই এখন কালীনদীর ও-পারে খেয়ার ঘাট, ঘাট হইতে একটা কাঁচা পথ চলিয়া গিয়াছে চরের ও-দিকের গ্রাম পর্য্যন্ত। সেই পথটা মাত্র ও-দিকে একটা যোজকের মত জাগিয়া আছে।

চরের উপর শ্রীবাস পাল যে দোকানটা করিয়াছে, সেই দোকানের দাওয়ায় সাঁওতালদের কয়জন মাতব্বর বসিয়া অলস উদাস দৃষ্টিতে এই দুর্যোগের আকাশের দিকে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। কমল মাঝি, সেই রহস্যপ্রবণ কাঠের মিস্ত্রী চূড়াও বসিয়া আছে। আরও জন দুয়েক নীরবে 'চুটি' টানিতেছিল। শালপাতায় জড়ানো কড়া তামাকের বিড়ি উহারা নিজেরাই তৈয়ারি করে, তাহার নাম 'চুটি'। কড়া তামাকের কটু গন্ধে জলসিক্ত ভারী বাতাস আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন রাহী খেয়াঘাটে যাইতেছে বা খেয়াঘাট হইতে আসিতেছে।

দোকানের তক্তপোশের উপর শ্রীবাস নিজে একখানা খাতা খুলিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া আছে। ও-পাশে শ্রীবাসের ছোট ছেলে একখানা চাটাই বিছাইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়াছে, তাহার কোলের কাছে একটা কাঠের বাক্স, এক পাশে একটা তরাজু, ওজনের বাটখারাগুলি—সেরের উপর আধসের, তাহার উপর একপোয়া—এমনি ভাবে আধ-ছটাকটিকে চূড়ায় রাখিয়া মন্দির আকারে সাজাইয়া

রাখিয়াছে। সহসা এই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্রীবাস বলিল, কি রে, সবাই যে তোরা 'থন্ত' মেরে গেলি! কি বল্‌ছিস বল্‌, আমার কথার জবাব দে?

কমল নির্লিপ্তের মত উত্তর দিল, কি বুলব গো? আপুনি যি যা-তা বুলছিস!

শ্রীবাসের কপাল একেবারে প্রশস্ত টাকের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত কুঁচকাইয়া উঠিল; বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল, আমি যা-তা বলছি! আপনার পাওনা-গণ্ডা চাইলেই সংসারে যা-তা বলাই হয় যে, তার আর তোদের দোষ কি, বল্‌?

সাঁওতালেরা কেহ কোনও উত্তর দিল না, শ্রীবাসই আবার বলিল, বাকি তো এক বছরের নয়, বাকি ধর্‌ গা যেঁয়ে—তোর তিন বছরের। যে বছর দাঙ্গা হ'ল, সেই বছর থেকে তোরা ধান নিতে লেগেছিস। দেখ কেনে হিসেব ক'রে। দাঙ্গা হ'ল, মামলা হ'ল, মামলাই চলেছে দু বছর, তারপর লবীনের ধর্‌ গা যেঁয়ে—এক বছর ক'রে জেল খাটা হয়ে গেল। বটে কি না?

কমল সে কথা অস্বীকার করিল না, বলিল, হুঁ, সি তো বটে গো—ধান তো তিনটে হ'ল, ইবার তুর চারটে হবে।

তবে?

মাঝি এ "তবে"র উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। আবার চুপ করিয়া ভাবিতে বসিল। সাঁওতালদের সহিত শ্রীবাসের একটা গোল বাধিয়া উঠিয়াছে। দাঙ্গার বৎসর হইতে শ্রীবাস সাঁওতালদের ধান্য-ঋণ দাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ষার সময় যখন তাহারা জমিতে চাষের কাজে লিপ্ত থাকে, তখন তাহাদের দিনমজুরির উপার্জ্জন থাকে না। সেই সময়ে তাহারা স্থানীয় গ্রামের মহাজনের নিকট সুদে ধান লইয়া থাকে এবং মাঘ-ফাল্গুনে ধান মাড়াই করিয়া সুদে-আসলে ধার শোধ

দিয়া আসে। এবার অকস্মাৎ এই বর্ষা নামিয়া পড়ায় ইহারই মধ্যে সাঁওতালদের অনটন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অন্য দিক্ দিয়া চাষও আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। তাহারা শ্রীবাসের কাছে ধান ধার করিতে আসিয়াছে। কিন্তু শ্রীবাস বলিতেছে, তাহাদের পূর্ব্বের ধার এখনও শোধ হয় নাই। সেই ধারের একটা ব্যবস্থা আগে না করিয়া দিলে আবার নূতন ঋণ সে কেমন করিয়া দিবে? কিন্তু কথাটা তাহার বেশ বুঝিতে পারিতেছে না, অস্বীকারও করিতে পারিতেছে না। তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতেছে।

কতকগুলি দশ-বারো বছরের উলঙ্গ ছেলে কলরব করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল—মারাং গাডো, মারাং গাডো, খিক্ড়ী! অর্থাৎ বড় ইঁদুর, বড় ইঁদুর, খেঁকশিয়াল! কথা বলিতে বলিতে উত্তেজনায় আনন্দে তাহাদের চোখ বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছে; কালো কালো মূর্ত্তিগুলির বিস্ফারিত চোখের সাদা ক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট কালো তারাগুলি উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

কাঠের ওস্তাদ সর্ব্বাগ্রে ব্যগ্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে বলিল, ও-কারে? কুথাকে?

বানের জলের ধারে গো! ভূঁয়ের ভিতর থেকে গুল গুল ক'রে বার হ'ছে গো।

দুই-তিনজন কলরব করিয়া উঠিল, গোডা ভূগ্যারে-কো চোঁ-চোঁয়াতে। অর্থাৎ গর্ত্তের ভিতর সব চোঁ-চোঁ করছে।

এইবার সকলেই আপনাদের ভাষায় কমলের সহিত কি বলা-কওয়া করিয়া উঠিয়া পড়িল। শ্রীবাস রুষ্ট হইয়া বলিল, লাফিয়ে উঠলি যে ইঁদুরের নাম শুনে? আমার ধানের কি করবি, ক'রে যা।

ওস্তাদ বলিল, আমরা কি বুলব গো? উই মোড়ল বুলবে, আমাদের। আর যাব না তো খাব কি আমরা? তু ধান দিবি না

বুলছিস। ঘরে চাল নাই, ছেলেপিলে সব খাবে কি? ওইগুলা সব পুঁড়ায়ে খাব।

পাড়ার ভিতর হইতে তখন সারি বাঁধিয়া জোয়ান ছেলে ও তরুণীর দল বর্ষণ মাথায় করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে—ইন্দুর-খেঁকশিয়ালের সন্ধানে। ছেলের দল আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল, সমস্বরেই বলিয়া উঠিল, দেলা-দেলা! চল চল!

বুড়ার দলও ছেলেদের পিছনে পিছনে তাহাদেরই মতন নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল।

শ্রীবাসও অকস্মাৎ লোলুপ হইয়া উঠিল; সে কমলকে বলিল, মোড়ল বল্ কেনে ওদের খরগোশ পেলে আমাকে যেন একটা দেয়।

আসল ব্যাপারটা খুবই সোজা, সাঁওতালেরা সেটা বেশ বুঝতে পারে; কিন্তু আসল সত্যের উপরে জাল বুনিয়া শ্রীবাস যে আবরণ রচনা করিয়াছে, সেটা খুবই জটিল—তাহার জট ছাড়াইতে উহারা কিছুতেই পারিতেছে না। শ্রীবাস চায় সাঁওতালদের প্রাণান্তকর পরিশ্রমে গড়িয়া তোলা জমিগুলি। সে-কথা তাহারা মনে মনে বেশ অনুভব করিতেছে; কিন্তু ঋণ ও সুদের হিসাবের আদি-অন্ত তাহারা কোনমতেই খুঁজিয়া পাইতেছে না। এই তিন বৎসরের মধ্যেই তাহাদের জমিগুলিকে প্রথম শ্রেণীর জমিতে তাহারা পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। জমির ক্ষেত্র সুসমতল করিয়াছে, চারিদিকের আইল সুগঠিত করিয়া কালীর পলিমাটিতে-গড়া জমিকে চষিয়া খুঁড়িয়া সার দিয়া তাহাকে করিয়া তুলিয়াছে স্বর্ণপ্রসবিনী। চরের প্রান্তভাগে যে-জমিটা চক্রবর্ত্তী-বাড়ী খাসে রাখিয়া তাহাদের ভাগে বিলি করিয়াছে, সেগুলিকে পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ জমির আকার দিয়া গড়িয়া ফেলিয়াছে। শ্রীবাসের জমিও তাহারাই ভাগে করিতেছে, সে-জমিও প্রায় তৈয়ারী হইয়া আসিল। বে-বন্দোবস্তী বাকী চরটার জঙ্গল

হইতে তাহারা জ্বালানির জন্য আগাছা ও ঘর ছাওয়াইবার উদ্দেশ্যে বেনা-ঘাস কাটিয়া প্রায় পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের নিজেদের পল্লীর পাশে পাশে আম কাঁটাল মহুয়া প্রভৃতি চারাগুলি মানুষের মাথা ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, সজিনাডালের কলমগুলিতে তো গত বৎসর হইতেই ফুল দেখা দিয়াছে। বাঁশের ঝাড়গুলিতে চার-পাঁচটি করিয়া বাঁশ গজাইয়াছে, শ্রীবাস হিসাব করিয়াছে, এক-একটি বাঁশ হইতে যদি তিনটি করিয়াও নূতন বাঁশ গজায়, তবে এই বর্ষাতেই প্রত্যেক ঝাড়ে পনেরো-কুড়িটি করিয়া নূতন বাঁশ হইবে।

জায়গাটিও আর পূর্ব্বের মত দুর্গম নয়, শ্রীবাসের দোকানের সম্মুখ দিয়া যে-রাস্তাটা গাড়ীর দাগে দাগে চিহ্নিত হইয়া ছিল, সেটি এখন সুগঠিত পরিচ্ছন্ন একটি সাধারণের ব্যবহার্য্য রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। রাস্তাটা সোজা সাঁওতাল-পল্লীর ভিতর দিয়া নদীর বুকে যেখানে নামিয়াছে, সেইখানেই এখন খেয়ার নৌকা ভিড়িয়া থাকে, এইটাই এখন এ-পারের খেয়াঘাট। খেয়ার যাত্রীদের দল এখন এইদিকেই যায় আসে। গাড়ীগুলিও এই পথে চলে। রাস্তার এ-প্রান্তটা সেই গাড়ীর চাকার দাগে দাগে একেবারে এ-পারেব চক আফজলপুরের পাকা সড়কের সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছে। ওই পাকা সড়কে যাইতে যাইতে মুরশিদাবাদের ব্যাপারীদের কলাই, লঙ্কা প্রভৃতির গাড়ী এখানে আসিতে শুরু করিয়াছে। তাহারা কলাই, লঙ্কা বিক্রয় করে ধানের বিনিময়ে। এখানে কলাই, লঙ্কা বেচিবার সুবিধা করিতে পারে না, তবে সাঁওতালদের অল্প চড়া দর দিয়া ধান কিছু কিছু কিনিয়া লইয়া যায়। গরু-ছাগল কিনিবার জন্য মুসলমান পাইকারদের তো আসা-যাওয়ার বিরাম নাই। দুই-চারি ঘর গৃহস্থেরও এ-পারে আসিয়া বাস করিবার সঙ্কল্পের কথা শ্রীবাসের কানে আসিতেছে। বে-বন্দোবস্তী ও-দিকের ওই চরটার উপর তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ঘাস ও কাঠ

কাটিয়া সাঁওতালরাই ও-দিকটাকে এমন চোখে পড়িবার মত করিয়া তুলিল। আবার ইহাদের গরুর পায়ে পায়ে এবং ঘাস ও কাঠবাহী গাড়ীর চলাচলে ওই জঙ্গলের মধ্যেও একটা পথ গড়িয়া উঠিতে আর দেরী নাই। নবীন ও রংলালের সহিত দাঙ্গা করার জন্য শ্রীবাস এখন মনে মনে আপসোস করে। এত টাকা খরচ করিয়া এক শত বিঘা জমি লইয়া তাহার আর কি লাভ হইয়াছে? লাভের তুলনায় ক্ষতিই হইয়াছে বেশি। আজ চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে গিয়া জমি বন্দোবস্ত লইবার পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। মামলার খরচে তাহার সঞ্চয় সমস্ত ব্যয়িত হইয়া অবশেষে মজুমদারের ঋণ তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। মামলা না করিয়া বাকি চরটা সে যদি বন্দোবস্ত লইত, তবে সে কেমন হইত? আর গোপনে দখল করিবারও উপায় নাই, ছোট রায়—ইন্দ্র রায়ের শ্যেনদৃষ্টি এখন এখানে নিবদ্ধ হইয়া আছে। রায় এখন চক্রবর্ত্তীদের বিষয়-বন্দোবস্তের কর্ত্তা। সে দৃষ্টি, সে নখরের আঘাতের সম্মুখীন হইতে শ্রীবাসের সাহস নাই। সেদিনের সেই সর্ব্বরক্ষাতলার বলির কথা মনে করিয়া বুক এখনও হিম হইয়া যায়। এখন একমাত্র পথ আছে, ওই সাঁওতালদের উঠাইয়া ওই দিকে ঠেলিয়া দিয়া এদিকটা যদি কোনরূপে গ্রাস করিতে পারা যায়। জমি-বাগান-বাঁশ লইয়া এ-দিকটা পরিমাণে কম হইলেও এটুকু নিখাদ সোনা।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া শ্রীবাস জাল রচনা শুরু করিয়াছে। মাকড়সা যেমন জাল রচনা করে, তেমনি ভাবেই হিসাবের খাতায় কলমের ডগায় কালির সূত্র টানিয়া টানিয়া যোগ দিয়া গুণ দিয়া জালখানিকে সে সম্পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই সে বলিতেছে, আমার খাতায় টিপছাপ দিয়ে বকেয়ার একটা আধার ক'রে দে। তারপর আবার ধান লে কেনে?

একা বসিয়া অনেক ভাবিয়া কমল বলিল, হা পাল মশায়, ইটো কি ক'রে হ'ল গো? আমরা বছর বছর ধান দিলম যি! তুর ছেলে লিলে।

হাসিয়া পাল বলিল, দিস নাই এমন কথা বলেছি আমি?

তবে? বাকিটো তবে কি ক'রে বুলছিস গো?

এই দেখ, বোঙাজাতকে কি ক'রে সমঝাই, বল দেখি? আচ্ছা শোন্, ভাল ক'রে বুঝে দেখ্। যে ধানটো তোরা নিলি, এই তোর হিসেবই খুলছি আমি। এই দেখ্ পহিল সালে তু নিলি তিন বিশ ধান। তিন বিশের বাড়ি, মানে স্থদ ধর্ গা যেঁয়ে—দেড় বিশ। হ'ল গা যেঁয়ে—সাড়ে চার বিশ। বটে তো?

কমল হিসাব-নিকাশের মধ্যে আর ভাল ঠাওর পাইল না, বলিল, হু, সি তো হ'ল।

পাল আবার আরম্ভ করিল, তারপর তু দিলি সে বছর তিন বিশ আট আড়ি পাঁচ সের। বাকি থাকল বাইশ আড়ি পাঁচ সের—মানে, এক বিশ দু আড়ি পাঁচ সের। তার ফিরে বছরে তুই নিয়েছিস তিন বিশ চোদ্দ আড়ি। আর গত বছরের বাকি এক বিশ দু আড়ি পাঁচ সের। আর স্থদ ধর্ দু বিশ তিন আড়ি আড়াই সের।

কমল দিশা হারাইয়া বলিল, হুঁ।

পাল হাসিয়া বলিল, তবে? তবে যে বলছিস্, কি ক'রে হ'ল গো? ন্যাকা সাজছিস্?

কমল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শ্রীবাস ছেলেকে বলিল, সাজ্ তো বাবা, কড়া দেখে এক কল্কে তামুক। বাদলে—বাতাসে শীত ধ'রে গেল। কি বলে রে মাঝি, শীত-শীত করছে, তোদের কথায় কি বলে?

কমল কোন উত্তর দিল না, পালের ছেলে তামাক সাজিতে সাজিতে হাসিয়া বলিল, রবাং হো রাবাং কানা, নয় রে মাঝি?

পাল কৃত্রিম আনন্দিত-বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলিল, তুই শিখেছিস নাকি রে? শিখিস্ শিখিস্। বুঝলি মোড়ল, ওকে শিখিয়ে দিস তোদের ভাষা।

কিন্তু কমল ইহাতে খুশি হইল না। সে গভীর চিন্তায় নীরব হইয়াই বসিয়া রহিল। পালের ছেলে তামাক সাজিয়া একটু আড়ালে নিজে কয়েক টান টানিয়া হুঁকাটি বাপের হাতে দিল; পাল দেওয়ালে ঠেস দিয়া ফড়াৎ ফড়াৎ শব্দে হুঁকায় টান দিতে আরম্ভ করিল। দূরে চরের প্রান্তভাগে বন্যার কিনারায় কিনারায় উত্তেজনায় আত্মহারা সাঁওতালদের আনন্দোন্মত্ত কোলাহল উঠিতেছে। সে-কোলাহলের মধ্যে নদীর ডাকও ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আকাশে সীসার আস্তরণের মত দিগন্ত-বিস্তৃত মেঘের কোলে কোলে ছিন্ন ছিন্ন খণ্ড কালো মেঘ অতিকায় পাখীর মত দল বাঁধিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। শ্রীবাস বাহ্য উদাসীনতার আবরণের মধ্যে থাকিয়া উৎকণ্ঠিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কমলের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। কমলকে আপ্যায়িত করিবার নানা কৌশল একটার পর একটা আবিষ্কার করিয়া আবার সেটাকে নাকচ করিতেছিল, পাছে কমল তাহার দুর্ব্বলতাটা ধরিয়া ফেলে। সহসা সে একটা কৌশল আবিষ্কার করিয়া খুশি হইয়া উঠিল এবং কৃত্রিম ক্রোধে ছেলেকে ধমকাইয়া উঠিল, বলি গণেশ, তোর আক্কেলটা কেমন, বল দেখি? মোড়ল মাঝি ব'সে রয়েছে কখন থেকে, বর্ষা-বাদলের দিন, একটুকু তামাকের পাতা, একটু চুন তো দিতে হয়! সাঁওতাল হ'লেও মোড়ল হ'ল মান্তের লোক।

গণেশ ব্যস্ত হইয়া তামাকের পাতা ও একটা কাঠের চামচে করিয়া চুন আনিয়া মোড়লের কাছে নামাইয়া দিল। মোড়ল চুন ও তামাকপাতা লইয়া খইনি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল। এতক্ষণে সে যেন খানিকটা চেতনা ফিরিয়া পাইল, বলিল, খান

যখন নিলম আপোনার ঠেঞে, তখন সিটি দিব না, কি ক'রে বুলব গো মোড়ল?

পাল হাসিয়া বলিল, এই। মাঝি, সব বেচে মানুষ খায়, কিন্তু ধরম বেচে খেতে নাই। তোরা দিবি না—এ ভাবনা আমার এক দিনও হয় নাই। তোর সঙ্গে কারবার করছি এতদিন, তোকে আমি খুব জানি। তবে কি জানিস, এই মামলা-মকদ্দমায় প'ড়ে আমি নিজে কিছু দেখতে পারলাম না। ছেলেগুলো সব বোকা, ছেলেমানুষ তো। বছর বছর হিসেব ক'রে যদি ব'লে দিত যে, মাঝি, এই তোদের সব বাকি থাকল, তবে তো এই গোলটি হ'ত না। আমি এবার খাতা খুলে দেখে একেবারে অবাক।

কমল খানিকটা খইনি ঠোঁটের ফাঁকে পূরিয়া বলিল, হুঁ, আমরাও তো তাই হলাম গো।

শ্রীবাস ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, তার জন্যে ছেলেগুলোকে আমি মারতে শুধু বাকি রেখেছি। আবার ক্ষণিক নীরবতার পর সে বলিল, এবার থেকে সূ—ক্ষ্ম হিসাব ক'রে আমি নিজে ব'সে তোদের ঝঞ্ঝাট মেরে দোব, কিছু ভাবিস না তোরা।

কমল বলিল, হুঁ, সেইটি তু ক'রে দিবি মোড়ল।

নিশ্চয়। এখন এক কাজ কর্, তোরা বাপু, খাতাতে যে বাকি আছে, সেই বাকির হিসেবে একটি টিপছাপ দে। আর কার কি ধান চাই বল্, আমি জুড়ে দেখি, কত ধান লাগবে মোটমাট। তারপর লে কেনে ধান কালই।

কমল টিপছাপের নামে আবার চুপ করিয়া গেল। টিপসহিকে উহাদের বড় ভয়। ওই অজানা কালো কালো দাগের মধ্যে যেন নিয়তির দুর্ব্বার শক্তি তাহারা অনুভব করে। খত শোধ করিতে না পারিলে শুধু তো এখানেই শাস্তি হইয়া শেষ হইবে না! আরও,

খত কেমন করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করে, সে তো সে এই বয়সে কত বার দেখিয়াছে। কালো দাগগুলো যেন কালো ঘোড়ার মত ছুটিয়া চলে।

শ্রীবাস বলিল, তোদের তো আবার পূজো-আচ্চা আছে, ধান পোঁতার আগে সেই সব পূজোটুজো না ক'রে তো চাষে লাগতে পাবি না?

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কমল বলিল, হুঁ।

কি পরব বলে রে একে, নাম কি পরবের?

নাম বটে 'বাতুলী' পরব। আবার 'কদ্‌লেতা' পরবও বুলছে। 'রোওয়া' পরবও বলে। 'বাইন' পরবও বুলছে। যারা যেমন মনে করে, বুলে।

পরবে কি হবে তুদের?

কমল এবার খানিকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, 'জাহর সারনে'—আমাদের দেবতার থানে গো, পূজো হবে। 'এডিয়াসিম'—আমাদের মোরগাকে বলে 'এডিয়াসিম,' ওই মোরগা কাটা হবে, পচুই মদ দিব দেবতাকে, শাক দিব দ্-তিন রকম। তারপরে রাঁধা-বাড়া হবে উই দেবতা-থানে, লিয়ে খেয়ে-দেয়ে সব নাচগান করব।

তবে তো অনেক ব্যাপার রে! তা আমাদিকে নেমতন্ন করবি না?

কমল বড় বড় দাঁত মেলিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল, কৌতুক করিয়া বলিল, আপুনি আমাদের হাঁড়ি মদ খাবি মোড়ল?

শ্রীবাস বলিল, তা, আমাকে না হয় দোকান থেকে 'পাকিমদ' এনে দিবি।

কমল পশ্চাদপদ হইল না, বলিল, হুঁ, তা দিব।

হা-হা করিয়া হাসিয়া শ্রীবাস বলিল, না না, ও আমি তোকে ঠাট্টা করছিলাম।

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, উ—হুঁ, সি হবে না। আমি যখুন নেওতা দিলাম, তখুন তুকে উটি লিতে হবে।

বেশ, তা দিস্। সে হবে কবে তোদের?

জল তো হয়েই গেল গো। এই ধানটি হলেই পূজো করব। তারপরে চাষে লেগে যাব। তা আপুনি ধান দিবি তবে তো হবে।

বেশ। সবাইকে নিয়ে আয়, এসে টিপছাপ দিয়ে দে, পরশু নিয়ে নে ধান। ধান তো আমার এইখানেই আছে।

কমল ম্লানমুখে বলিল, তাই দিবে সব কাল।

গণেশ বলিল, মোড়ল, দোকানে নিতে সব সকালে সকালে পাঠিয়ে দিগ একটু। আজ তো আবার তোদের অনেক কিছু চাই রে; ইঁদুর খরগোশ খেঁকশিয়াল মারলি, মসলাপাতি চাই তো?

কমল হাসিয়া বলিল, হুঁ। বলিতে বলিতে অকস্মাৎ যেন একটা অতিপ্রয়োজনীয় কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল, বলিল 'ডিবির স্থম্ম' এনেছিস গো? করঙ্গা স্থন্থম জ্বলছে না ভাল বাতাসে!

হ্যাঁ, এক টিন কেরোসিন তেল এনেছি, ব'লে দিস সব ডিবিয়াও এনেছি। তোর নাতনীর হাতে একটা লণ্ঠন দেখছিলাম মাঝি, ওটা কোথা কিনলি রে?

কমল বলিল, উ উয়াকে রাঙাবাবুর মা দিয়েছে। ভাগে জমি করেছে জামাইটো, মেয়েটো উনিদের পাটকাম করছে কিনা।

শ্রীবাসের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিল, আচ্ছা, তোর নাতজামাই তো কই ধান নেয় না মোড়ল? আবার তোর সঙ্গে পৃথকও তো বটে।

কমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বিয়া দিলেই বেটী পর হয়ে যায় গো। আর জামাইটো হ'ল পরের ছেলে। আমরা বুলছি

কি জানিস, এটাঃ হপন বীর, সিম বাকো আপনারোয়াঃ—মানে বুলছে জামাইটো পরের ছেলে, বনের মুরগীর মত উ পোষ মানে না।

ও-দিক হইতে কলরব করিতে করিতে শিকার সমাধা করিয়া সাঁওতালের দল ফিরিতেছিল। পুরুষ নারী ছেলে—বাদ বড় কেহ ছিল না। অধিকাংশের হাতেই লাঠি, জন-কয়েকের কাঁধে ধনুক, হাতে তীর, খালি হাত যাহাদের তাহারাও রাশীকৃত মরা ইঁদুর, গোটা-কয়েক খেঁকশিয়াল, গোটা-চারেক বুনো খরগোশ, লেজে দড়ি ঝুলাইয়া লইয়া চলিয়াছে। সেই দীর্ঘাঙ্গী তরুণীটির হাতে ছিল দুইটা খরগোশ, সে অভ্যাসমত দর্পিত উচ্ছল ভঙ্গিতে আসিয়া কমলকে আপনাদের ভাষায় বলিল, এ-দুটা রাঙাবাবুকে দিতে হইবে। তুমি বল ইহাদের, ইহারা বলিতেছে, দিবে না! রাঙাবাবু ও-পারের ঘাটে বসিয়া আছে, আমি তাকে দেখিয়াছি।

দলের তরুণীগুলি সকলেই সমস্বরে সায় দিয়া উঠিল, হ্যাঁ হ্যাঁ। হুই নদীর উ পারে ব'সে রইছে। আমরা দেখলম। আমাদের রাঙাবাবু।

শ্রীবাসের খরগোশ-মাংসের উপর প্রলোভন ছিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, হ্যাঁ মাঝি, আমি যে বললাম একটা খরগোশের জন্যে, আমাকে একটা দে।

কমলের নাতনীই শ্রীবাসকে জবাব দিল। কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, কেনে, তুকে দিব কেনে? তুকে দিব তো আমরা কি খাব?

শ্রীবাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, এ তো আচ্ছা মেয়ে রে বাবা! ওই তো তোরা দিতে যাচ্ছিস রাঙাবাবুকে। তা, আমাকে দিবি না কেনে?

কলমরে নাতনী পরম বিস্ময়ের সহিত একটা আঙুল শ্রীবাসের

দিকে দেখাইয়া আপনাদের ভাষায় বলিয়া উঠিল, এ লোকটা পাগলা, না ক্ষ্যাপা ?

মেয়ের দল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শ্রীবাসের ছেলে গণেশ সাঁওতালী ভাষা বুঝিতে পারে; তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, সে কঠিন স্বরেই বলিয়া উঠিল, এই সারী, যা-তা বলিস্ না বলছি।

কমলের ওই নাতনীর নাম সারী; শুক-সারীর সারী নয়—উহাদের ভাষায় সারী অর্থে উত্তম, ভাল। সারী বলিল, কেনে বুলবে না ? ই কথা উ বুলছে কেনে? রাঙাবাবুর সাথে সাথ করছে কেনে? উ আমাদের জমিদার, আমাদিকে জমি দিলে, আমাদিকে ধান দেয়, তুদের মত সুদ লেয় না।

সারীর কথার ভঙ্গিতে কমলও এবার লজ্জিত হইল, সে যথাসম্ভব মোলায়েম করিয়া বলিল, উনিকে সবাই খুব ভালবাসে মোড়ল, উনি আমাদের রাঙাঠাকুরের লাতি।

মেয়েগুলি মুগ্ধ বিস্ময়ের সুরে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল আপনাদের ভাষায়, তিমুনি আগুনের পারা রং!—আঃ-য়-গো! বিস্ময়সূচক 'আয়-গো' শব্দটির দীর্ঘায়িত ধ্বনির সুর তাহাদের কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনির মতই বাজিয়া উঠিল।

১৯

এক অহীন্দ্র নয়, অমল এবং অহীন্দ্র দুইজনেই প্রাতঃকালে কালিন্দীর ঘাটে আসিয়া বসিয়া ছিল। বর্ষার জলে ভিজিবার জন্য দুইজনে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল। নদীর ঘাটে আসিয়া কালীর বন্যা দেখিয়া সেইখানেই তাহারা বসিয়া পড়িল। খেয়াঘাটের উপরে পথের পাশেই এক বৃদ্ধ বট; বটগাছটির শাখাপল্লব এত ঘন এবং

পরিধিতে এমন বিস্তৃত যে, বৃষ্টির জলধারা তাহার তলদেশের মাটিকে স্পর্শ করিতে পারে না, গাছের পাতা-ঝরা জল স্থানে স্থানে ঝরিয়া পড়ে মাত্র। গাছের গোড়ায় মোটা মোটা শিকড়গুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া চারিপাশে মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের উপরের খানিকটা অংশ অজগরের পিঠের মত মাটির উপরে জাগিয়া আছে, সেই শিকড়ের উপরে বসিয়া তাহারা দুইজনে কালীর খরস্রোতের মধ্যে ঢিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে কথা বলিতেছিল। গাছটারই তলায় তাহাদের হইতে কিছু দূরে, খান-দুই গরুর গাড়ী খেয়ানৌকার অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। বর্ষার বাতাসে গরুগুলির সর্ব্বাঙ্গের লোম খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, গাড়োয়ান দুইজন এবং আর জন-কয়েক খেয়ার যাত্রী ভিজা কাঠের আগুনের ধোঁয়ার সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া তামাক টানিয়া কাসিতেছে, গল্প করিতেছে।

বহুদিনের প্রাচীন বট, এই গাছের তলায় বহু বৎসর হইতেই পথের রাহীরা এমনই করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। গাছটার নামই 'আঁটের-বটতলা'। পথের মধ্যে অপরিচিত পথিকেরা জোট বাঁধিয়া এই স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকে—এই আশ্রয় লওয়াকেই এ-দেশে বলে আঁট-দেওয়া। গাছের তলাতেই একটা গরুর গাড়ীর টাপর বা ছই পাতিয়া তাহারই আশ্রয়ের তলে উবু হইয়া বসিয়া খেয়াঘাটের ঠিকাদারও তামাক টানিতেছিল।

আপনার বক্তব্যের উপর খুব জোর দিয়াই অমল কথা বলিতেছিল সে এবার ধরিয়াছে, অহীন্দ্রকে কলিকাতায় পড়িতে হইবে। অহীন্দ্রের কোন অজুহাতই সে শুনিতে চায় না; সে বার বার বলিতেছে, তোমার মত স্টুডেণ্টের পক্ষে মফস্বল কখনও উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে না।

কৌতুকভরে অহীন্দ্র বলিল, বল কি?

নিশ্চয়। অন্তত তিন ধাপ যে খাটো, সেটা তো প্রমাণিত হয়েই গেছে তোমার রেজাল্টে।

মানে?

ভেরি ঈজি। কলকাতায় থাকলে তোমার নাম থাকত সর্ব্বাগ্রে—এ আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-অনুর্ব্বরতা তোমার সায়েন্সে স্বীকৃত সত্য, বীজের অদৃষ্টের ঘাড়ে দোষ চাপানোর মত অবৈজ্ঞানিক মতবাদ নিশ্চয় তুমি পোষণ করতে পার না।

এবার অহীন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, তুমি কি আসল কারণটা বুঝতে পার না অমল?

অমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, অনেক কলেজ তোমাকে ফ্রী-স্টুডেণ্টশিপ দেবে, স্টাইপেণ্ড দেবে, হোস্টেল ফ্রী পর্য্যন্ত ক'রে দেবে। তার ওপর তোমার স্কলার্‌শিপ থাকবে, সুতরাং তোমার আটকাচ্ছে কোথায়?

অহীন্দ্র গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি সবটা বুঝতে পারছ না অমল। তবে তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই। আমাকে মাসে মাসে এবার থেকে মাকে কিছু ক'রে না পাঠালে চলবে না। নিয়মিত আদায়পত্র তো হয় না, টাকার অভাবে মা অনেক সময় বিব্রত হয়ে পড়েন। আর মাকে আমার রান্না করতে হয়, মানদা ঝি বিনা মাইনেতে কাজ করে, অন্ততঃ এ দুটো খরচ আমাকে পাঠাতেই হবে!

অমল চুপ করিয়া গেল। কথাগুলির মধ্যে যে একটি বেদনাদায়ক সঙ্কোচ লুকাইয়া আছে, সেই সঙ্কোচে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। প্রাণঢালা অন্তরঙ্গতায় সে অহীন্দ্রের অন্তরঙ্গ, তবুও তাহার মনে হইল, এ কথাটা জোর করিয়া অহীন্দ্রের কাছে শুনিয়া সে অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছে। এ-দিকে, ও-পার হইতে নৌকাখানা আসিয়া পড়ায় খেয়াঘাট কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। গাছতলায় গাড়ী লইয়া

গাড়োয়ানেরা ব্যস্ত হইয়া পড়িল।—শীতার্ত্ত গরু কয়টাকে গাড়ীতে জুড়িবার পূর্ব্ব হইতেই ঠ্যাঙাইতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, চীৎকার শুরু করিয়া দিয়াছে। যাত্রী যাহারা নামিতেছে তাহারাও চীৎকার করিতেছে কম নয়।

ঘাটের ঠিকাদার গরুর গাড়ীর টাপরের ভিতর বসিয়াই পারের পয়সা আদায় করিতে করিতে একজনের সঙ্গে বিতণ্ডা জুড়িয়া দিয়াছে, একটি ছেলের পারানির পয়সা লইয়া। লোকটি বলিতেছে, কোম্পানির র‍্যালে ছেলের জন্যে হাফ-টিকিট, আর তোমার লৌকোতে নাই বললে চলবে কেনে হে বাপু? মগের মুলুক পেয়েছ লেকিনি তুমি?

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান অত্যন্ত সাবধানতার সহিত গরুগুলিকে চালনা করিতে করিতে চেঁচাইতেছিল, অ-ই—হ-হ! ইদিগেই—

নিতান্ত প্রয়োজনীয় সময়ে এমনি কলরবমুখর একটি বিষয়ান্তরের সুযোগ পাইয়া অমল অহীন্দ্র দুইজনেই যেন বাঁচিয়া গেল। হাফটিকিট-যুক্তিবাদী লোকটির কথায় অকস্মাৎ প্রচুর কৌতুক অনুভব করিয়া অমল বেশ খানিকটা হাসিয়া লইয়া বলিল, ফাইন আর্‌গুমেণ্ট কিন্তু।

যাত্রী, গাড়ী বোঝাই করিয়া খেয়ানৌকা আবার ও-পারের দিকে রওনা হইল। খেয়ার মাঝি লগির একটা খোঁচা দিয়া নৌকাখানাকে তটভূমির সংস্পর্শ হইতে ঠেলিয়া জলে ভাসাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, হরিহরি বল সব। মিঞাসাহেবরা আল্লা-আল্লা বল।

হিন্দুর সংখ্যাই বেশি ছিল অথবা সবাই বোধ হয় হিন্দু ছিল, সমবেত কণ্ঠের একটা উচ্চ কলরোল উঠিল, হরি—বো—ল।

আবার ঘাট নিস্তব্ধ হইয়া গেল। শুধু নদীর আবর্ত্তের কুটিল নিম্ন কলকলশব্দ একই ভঙ্গিতে একটানা ধ্বনিত হইয়া চলিল। সে মৃদু ধ্বনি উঠিলেও জনবিরল খেয়াঘাটের উপরে যে দুই-তিনটি মানুষ বসিয়া ছিল, তাহাদের অন্তরের স্তব্ধতা সে-ধ্বনিতে ক্ষুণ্ণ হইল না; জনবিরল

খেয়াঘাটের শান্ত উদাসীনতার মধ্যে নদীর নিম্নস্বর সুশোভনরূপে অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। কানে বাজিলেও মনে ধরা পড়িবার মত ধ্বনি সে নয়।

অমল ও অহীন্দ্রের মনের বহির্দ্বারে অকস্মাৎ-আসিয়া-পড়া কৌতুক ফুরাইয়া গিয়াছে; আবার তাহারা দুইজনই গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। একটা কাঠি দিয়া অমল বালির উপর আঁকিতেছে একটা অর্থহীন চিত্র। অহীন্দ্রের স্থিরদৃষ্টি নদীর বুকের উপর। অমল সহসা বলিল, আচ্ছা, আমি যদি একটা টুইশনি যোগাড় ক'রে দিই? এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা পড়াবে, পনেরো টাকা কি কুড়ি টাকা তাঁরা দেবেন। তা হ'লে তো তোমার আপত্তি থাকতে পারে না?

অমলের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া অহীন্দ্র বলিল, আরও পরিষ্কার ক'রে বল। তুমি কি উমাকে পড়াবার কথা বলছ?

অমলও অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তাই যদি বলি?

পারব না—দৃঢ়স্বরেই অহীন্দ্র জবাব দিয়া বসিল।

এবারও অমল হাসিল, বলিল, জানি। তবু কথাটা ভাল ক'রেই জেনে নিলাম। যাক, সে কথা নয়; আমি বলছি আমার মামাতো ভাইকে পড়াবার কথা। ছেলেটি থার্ড ক্লাসে পড়ছে, তাকে পড়াবার জন্যে তাঁরা মাষ্টার খুঁজছেন।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া লইয়া অহীন্দ্র বলিল, ভাল, রাজী হলাম। তারপর অল্প হাসিয়া বলিল, চল, দেখি তোমার কলকাতা কেমন। মফস্বলের চেয়ে কতখানি ওপরে অবস্থান করছেন, পরখ ক'রে দেখা যাক।

অমল হাসিয়া বলিল, অনেক—অনেক। অনেক ওপরে অহি, তিন ধাপ নয়, আরও বেশি ওপরে। দেখছো না, প্রাইভেট টুইশনির কথা

বলতেই তুমি ধ'রে নিলে উমাকে পড়াবার কথা। অর্থাৎ, মনে ক'রে নিলে, উমাকে পড়াবার ভানে আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই। যে-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে, তাতে পুরাকাল হ'লে আমার ভস্ম হয়ে যাবার কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কেন? ধর, তাই যদি হ'ত তাতেই বা ক্ষতি কি ছিল? শ্রমবিনিময়ে মূল্য নেবে, তাতে মর্য্যাদার হানিটা কোথায়? এই হ'ল তোমার মফস্বল-মেণ্টালিটি।

অহীন্দ্র রাগ করিল না, হাসিয়াই বলিল, এ কথায় কিন্তু কলকাতার লোকেরই হার হ'ল অমল। মূল্য অপেক্ষা অমূল্য বস্তুর দাম বেশি এবং মূল্য না নিলে তবেই সংসারে অমূল্য বস্তু মেলে—এ সত্য কলকাতার লোকে জানে না, মফস্বলের লোকেরাই জানে প্রমাণ হচ্ছে।

অমলও হাসিয়া বলিল, বিজ্ঞানের ছাত্রের অযোগ্য কথা বললে অহিন। বৈজ্ঞানিকের কাছে অমূল্য শব্দের অ অক্ষরটা অঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী শূন্য ছাড়া আর কিছুই নয়; যতই উচ্চ মূল্যের বস্তু হোক, একটা মূল্য সে নির্দ্ধারিত করবেই করবে; সেইটেই তার জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের পরিচয়।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, আমার মূল্য তোমার কাছে তা হ'লে কত তুমি বলতে পার?

অমল বলিল, তোমার কাছে আমার যত মূল্য, সেইটে ইন্‌টু টেন।

আমার কাছে তো তুমি অমূল্য। অমূল্য ইনটু টেনের ভ্যালু কত, বল তো?

তুমি একটা বোগাস, যত কূটবুদ্ধি তোমার।—অমল হাসিয়া এবার পরাজয় মানিয়া লইল।

এতক্ষণে তাহারা সহজ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল, বাহির এতক্ষণে অন্তরে প্রবেশ করিল।

নদীর বন্যা, আকাশের ঘনঘোর মেঘ, স্রোতের নিম্ন কলস্বর, বাতাসের শব্দস্পর্শ, ভিজামাটির গন্ধ এতক্ষণে তাহারা স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিল। আবর্ত্তকুটিল গৈরিকবর্ণের বিশাল জলস্রোতের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া অমল বলিল, কালিন্দী আমাদের অদ্ভুত, বহুরূপা, রহস্যময়ী! অনেক দিন আগে, ছেলেমানুষ ছিলাম তখন, তখন দেখেছি কালিন্দীর বান। আর এই দেখছি।

অহীন্দ্র বলিল, এখানকার প্রবাদ কি জান? এখানকার লোকে বলে, উনি নাকি যমের সহোদরা; অর্থাৎ যমুনার কাহিনীটা এঁর ওপর আরোপ করতে চায়। কালিন্দী নাকি যে বস্তুটিকে গ্রাস করতে বদন ব্যাদান করেন, তার রক্ষা কিছুতেই নেই। যম এসে সেখানে দোসর হয়ে ভগ্নীর পাশে দাঁড়ান। এক চাষী, তার নাম রংলাল, সেই আমাকে বলেছিল। অদ্ভুত বিশ্বাস, বললে, উনি যে-কালে হাত বাড়িয়েছেন, সে-কালে রায়হাটের আর রক্ষা নেই।

কালীর তটভূমির ভাঙনের দিকে চাহিয়া অমল বলিল, ওদের সংস্কারের কথা বাদ দিয়েও কথাটা সত্যি, ভাঙনের দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

মৃদু হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, এ-দিকে ভাঙছে ও-দিকে গড়ছে। ও-পারের চরটা বছর বছর পরিধিতে অল্প অল্প ক'রে বেড়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের কলহ বাড়ছে। গোড়া থেকেই ব্যাপারটা আমি জানি। আমি হলপ ক'রে বলতে পারি অমল, যে, এ-গ্রামে—শুধু এ-গ্রামে কেন, আশেপাশে এমন লোক নেই, যার লোভ নেই ওই চরটার মাটির ওপর।

চরটার দিকে চাহিয়া অমল বলিল, চরটা কিন্তু সত্যিই লোভনীয় হয়ে উঠেছে, তা ছাড়া মাটিও বোধ হয় খুব উর্ব্বর।

খুব উর্ব্বর। রংলাল বলেছিল, ও মাটিতে সোনা ফলে—

চল, একদিন দেখে আসি। কাল চল।...আরে আরে, অত সব চেঁচামেচি করছে কেন? আরে বাপ রে, দল বেঁধে চাপে যে! নৌকাখানি ডুবে যাবে!

ও-পারের চরের পার-ঘাটে দল বাঁধিয়া সাঁওতালদের মেয়েরা নৌকায় চড়িতে চড়িতে কলরব করিতেছে! নৌকায় উঠিয়া মেয়ের দল চাপিয়া বসিয়াছে, সেই ভারে এবং চাঞ্চল্যে নৌকাটা টলমল করিতেছে, তাহাতেই তাহারা সভয় কৌতুকে কলরব করিতেছে। এ-পার হইতে ঘাটের ঠিকাদারও শঙ্কিত হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল, অই অই, এরা করছে কিরে বাপু? হে-ই! হে-ই!

কিন্তু তাহার কণ্ঠধ্বনি নদীর কল্লোল ভেদ করিয়া ও-পারের দলবদ্ধ সাঁওতালদের কলরবের মধ্যে আত্মঘোষণা করা দূরের কথা, বোধ হয় পৌঁছিতেই পারিল না। শেষ পর্য্যন্ত বেচারা কাসিয়া সারা হইল। কাসিতে কাসিতেই সে বলিল, মর্, তবে মর্ তোরা ডুবে, নিক, কালী নিক তোদিগে। অসীম বৈরাগ্যের সহিত সে নদীর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া নূতন করিয়া তামাক সাজিতে বসিয়া গেল।

অহীন্দ্রের মুখে একটি পুলকিত হাসির রেশ ফুটিয়া উঠিল, সে নৌকাভরা সাঁওতাল মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিল, একটা মজা দেখবে দাঁড়াও।

হঠাৎ মজাটা কোত্থেকে আসবে?

ওই নৌকায় চ'ড়ে আসছে।

বল কি? ব্যাপারটা কি?

আমার পূজারিণীর দল আসছে। আমি ওদের রাঙাবাবু।

অমল মুগ্ধ হইয়া গেল, বলিল, বিউটিফুল! চমৎকার নাম দিয়েছে তো। কিন্তু এ যে একটা রোমান্স হে!

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, রোমান্সই বটে। আবার চরটার নাম

দিয়েছে রাঙাঠাকুরের চর। আমার ঠাকুরদার সাঁওতাল-হাঙ্গামায় যোগ দেওয়ার কথা জান তো? তাঁর প্রতি ওদের প্রগাঢ় ভক্তি। তাঁকে বলত ওরা—রাঙাঠাকুর। আমি নাকি সেই রকম দেখতে। চোখগুলো খুব বড় বড় ক'রে বলে, তেমনি আগুনে—র পারা রং।

ঘাটের ঠিকাদারটি তামাক সাজিতে সাজিতে অহীন্দ্র ও অমলের কথাবার্ত্তা সবই কান পাতিয়া শুনিতেছিল, সে আর থাকিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, তা আজ্ঞে, ওরা ঠিক কথাই বলে, বাবুমশায়। আমাদের চক্রবর্ত্তী-বাবুদের বাড়ীর মত রং এ চাকলায় নাই, তার ওপর আপনার রং ঠিক আগুনের পারাই বটে।

অমল ফিসফিস করিয়া বলিল, মাই গড! লোকটা আমাদের কথা সব শুনেছে নাকি?

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, অসম্ভব নয়। চুরি ক'রে পরের কথা শোনায় মানুষ চুরির আনন্দ পায়।

ঠিকাদারটি এবার বাহির হইয়া আসিয়া অহীন্দ্র ও অমলের সম্মুখে সবিনয় ভঙ্গিতে উপু হইয়া বসিয়া বলিল, বাবুমশায়!

অহীন্দ্র বলিল, বল।

আজ্ঞে।—বলিয়াই সে একবার সঙ্কোচভরে মাথা চুলকাইয়া লইল, তারপর আবার বলিল, আজ্ঞে, বাদলের দিন, আমার কাছে সিগরেট তো নাই! তামুকও খুব কড়া, তা বিড়ি ইচ্ছে করুন কেনে।

অমল খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, অহীন্দ্রও ঈষৎ হাসিল, হাসিয়া সে বলিল, না আমরা বিড়ি সিগারেট তামাক—এসব খাই নে, ওসব কিছু দরকার নেই আমাদের।

লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল, আমি বলি—। কিছুক্ষণ অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া সে আবার বলিল, আমি আজ্ঞে আর একটা কথা নিবেদন করব্জীলাম।

অমল হাসিয়া ইংরেজীতে বলিল, হোয়াট নেক্‌স্ট? এ গ্লাস অব ওয়াইন?

লোকটি কিছু বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, আজ্ঞে?

গম্ভীরভাবে অহীন্দ্র বলিল, কিছু না। ও উনি আমাকে বলছেন। তুমি কি বলছ, বল?

হাত দুইটি জোড় করিয়া এবার লোকটি বলিল, আজ্ঞে, ওই চরের ওপর খানিক জমির জন্যে বলছিলাম।

একটি মৃদু হাসি অহীন্দ্রের মুখে ফুটিয়া উঠিল, বলিল, জমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশি আমার দরকার নেই, এই বিঘে দশ-পনেরো।

এ-কথার জবাব তো আমি দিতে পারব না বাপু। আমার মুরুব্বীরা রয়েছেন, তাঁরা যা করেন তাই হবে।

আজ্ঞে, আমার বিঘে পাঁচেক হলেও হবে।—লোকটি কাকুতি করিয়া এবার বলিয়া উঠিল, আমি একটি দোকান ও-পারে করব মনে করছি।

দোকান? দোকান তো একটা আছে ও-পারে। শ্রীবাস মোড়ল করেছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারও ইচ্ছে, একখানা দোকান করি। লোকও তো কেরমে-কেরমে বাড়ছে। আর চিবাস আপনার গলা কেটে লাভ করে। দরে তো চড়া পাবেন না, মারে ওজনে। সের-করা আধপো ওজন কম। দু-রকম বাটখারা রাখে আজ্ঞে। ধান-চাল নেয় যে বাটখারায় সেটা আবার সের-করা আধপো বেশী।

অমল এবার বলিল, সেই মতলবে তুমিও দোকান করতে চাও, কেমন?

আজ্ঞে না। এই আপনাদের চরণে হাত দিয়ে আমি বলতে পারি আজ্ঞে। ও-রকম পয়সা আমার গোরক্ত ব্রহ্মরক্তে সমান।

আমি আপনার ষোল-আনার ওজন দেব, ষোল-আনা পয়সা নেব—বলিয়া সে বুড়ো আঙুল ও মাঝের আঙুলটি একত্র করিয়া ওজন করিবার ভঙ্গিতে ডান হাতখানি তুলিয়া ধরিল, যেন সে এখনই ওজন করিতেছে। অমল, অহীন্দ্র উভয়েই সে ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ও-দিকে সাঁওতাল মেয়েগুলির কলরবের ভাষা স্পষ্ট শোনা যাইতেছে, কিন্তু এখনও বুঝা যাইতেছে না। একে একে কথা কহিতে উহারা জানে না। একসঙ্গে পাখীর ঝাঁকের মত কলরব করে। অহীন্দ্র ঠিকাদারকে বলিল, যাও যাও, তোমার নৌকো এসে পড়ল।

পিছন ফিরিয়া নৌকাখানার দিকে চাহিয়া ঠিকাদার বলিল, সব মাঝিন, একজনাও যাত্রী নাই। খেয়াটাই লোকসান। বলিতে বলিতে সে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, জ্বালালে রে বাবা, ঘাট দুটো কেটে, ঝুড়ি কতক মাটি ফেলে দিয়ে মনে করছে, মাথা কিনেছে সব। এই মেঝেন, এই, তোরা কি ভেবেছিস বল্ তো? এমনি ক'রে দল বেঁধে আসবার তোদের কথা ছিল নাকি?

ঘাটে নামিয়াই সারি ঠিকাদারের সঙ্গে প্রায় ঝগড়া বাধাইয়া তুলিল। সে বলিল আসবো না কেনে? আমরা যি পাড়াসুদ্ধু তিন দিন খেটে দিলম; ই-দিগের ঘাট, উ-পারের ঘাট ভাল ক'রে দিলম। সারীর পেছনে তাহাদের আপনাদের ভাষায় দলসুদ্ধ মেয়েরা কলরব করিয়া সারীকে সমর্থন করিতে লাগিল।

ঠিকাদার বলিল, তাই ব'লে একসঙ্গে দল বেঁধে আসবি নাকি? এ-খেয়াতে একটা পয়সা নাই। কি, কাজ কি তোদের? এত ঝাঁটা-ঝুড়ি নিয়ে যাবি কোথা সব?

বেচতে যাব। ডাওর করল, ঘরকে ধান নাই, চাল নাই, খাব কি আমরা?

প্রত্যেকের হাতেই ঝাঁটা ও ঝুড়ির বোঝা। নানান ধরণের ঝাঁটা—শর-পাতার ঝাঁটা, কুচিকাঠির ঝাঁটা, কাশকাঠির ঝাঁটা, ছোট বড় নানা ধরণের। ঝাঁটাগুলির বাঁধনের ছাঁদও বিচিত্র। ঝুড়িগুলিও সুন্দর এবং নানা আকারের।

ঠিকাদার এবার ঝগড়ার সুর ছাড়িয়া মোলায়েম সুরে বলিল, বেশ, কই, আমাকে খান-কয়েক ঝাঁটা দিয়ে যা দেখি।

পোয়সা, পোয়সা দে। সারী হাত পাতিয়া দাঁড়াইল।

ঠিকাদার কিছুক্ষণ বিচিত্র ভঙ্গিতে নীরবে বর্ব্বর মেয়েগুলির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, আচ্ছা, যা। তারপর আবার পার কেমন ক'রে হোস, তা দেখব আমি। বলে সেই, লায়ে পেরিয়ে লাউরেকে বলে শালা, সেই বিত্তান্ত।

সারী তাহার এই ভীতিপ্রদর্শনকে গ্রাহ্যও করিল না। ঘাট হইতে উঠিয়া একেবারে অহীন্দ্র ও অমলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিছনে পিছনে মেয়েদের দল। আর তাহাদের মুখে কলরব নাই, চোখে মুগ্ধ বিস্ময়ভরা দৃষ্টি, মুখে স্মিত সলজ্জ হাসি। পরস্পরের গলায় হাত রাখিয়া ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমনি ভঙ্গিতেই দাঁড়ানো উহাদের অভ্যাস। পথে চলে, তাও এমনি ভাবে এ উহার গলা ধরিয়া বঙ্কিম ছন্দে হেলিয়া দুলিয়া চলে।

অমল মুগ্ধ হইয়া গেল, বলিল, বিউটিফুল! মনে হচ্ছে অজন্তা অথবা কোন প্রাচীনযুগের গুহার প্রাচীরচিত্র যেন মূর্ত্তি ধ'রে বেরিয়ে এল।

মৃদু হাসিয়া বলিল, কি রে কোথায় যাবি সব দল বেঁধে?

সারী বলিল—আপোনার কাছে এলম গো, আমরা আজ সব শিকার করলম, তাই আনলম দুটো সুসুরে—উই যি, তোরা কি বুলিস গো?

পিছন হইতে তিন-চারজন কলরব করিয়া উঠিল, খোরগোশ, খোরগোশ।

রক্তাক্ত খরগোশ দুইটা অহীন্দ্র ও অমলের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া সারী বলিল, হুঁ, খোরগোশ আনলম আপনার লেগে গো।

একটা খরগোশের মাথা স্থূল-ফলা তীরের আঘাতে একেবারে ভাঙিয়া দুইখানা হইয়া গিয়াছে, অন্যটার বুকে গভীর একটা ক্ষত, সে ক্ষত হইতে এখনও অল্প অল্প রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

অহীন্দ্র এক অদ্ভুত স্থিরদৃষ্টিতে রক্তাক্ত পশু দুইটির দিকে চাহিয়া রহিল; এমন রক্তাক্ত দৃশ্যের আবির্ভাবের আকস্মিকতায় সে যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। অমল একটা খরগোশের লেজ ধরিয়া তুলিয়া বলিল, এত বড় খরগোশ এখানে পাওয়া যায়?

হেঁ গো, অনেক রইয়েছে আমাদের চরে। ভারী খারাপ করছে সব। ভূট্টা বরবটি গাছপালার ডগাগুলি কেটে কেটে খেঁয়ে দিছে।—একা সারী নয়, পাঁচ-ছয়জনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল। নিজ হইতে বলিবার মত কথা উহারা ভাবিয়া পায় না, প্রশ্নের উত্তরে কথা বলিবার সুযোগ পাইলেই সকলেই কথা বলিবার জন্য কলরব করিয়া উঠে।

অমল উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সে অহীন্দ্রকে ঠেলা দিয়া বলিল, চল, কাল চরে শিকার ক'রে আসি। বলিতে বলিতে অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেল; অহীন্দ্রের উজ্জ্বল গৌরবর্ণের মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে, চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, স্বচ্ছ অশ্রুজলতলে পিঙ্গল তারা দুইটি আসন্নমৃত্যু প্রবাল-কীটের মত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। অমল শঙ্কিত হইয়া বলিল, এ কি, কি হ'ল তোমার?

অহীন্দ্রের ঠোঁট দুইটি কাঁপিয়া উঠিল, সে বলিল, ও দুটো সরাও ভাই সামনে থেকে। ও বীভৎস দৃশ্য আমি সইতে পারি না।

অমল খোরগোশ দুইটা তুলিয়া লইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, বাবুর বাড়ীতে দিগে যা।

অহীন্দ্র শিহরিয়া উঠিল, বলিল, না না না। মা দেখলে সমস্ত দিন ধ'রে কাঁদবেন।

অমল নির্ব্বাক হইয়া গেল, এমন ধারার কথা সে যেন কখনও শোনে নাই। সম্মুখে সমবেত কালো মেয়েগুলির মুখের স্মিত হাসিও মিশাইয়া গেল, অপরাধীর মত সঙ্কুচিত শুষ্কমুখে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর সারী কুণ্ঠিতস্বরে বলিল, হাঁ বাবু, খাবি না তবে খোরগোশ? আমরা আনলাম আপোনার লেগে।

অহীন্দ্র অনেকটা আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়াছিল, এতক্ষণে সে ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, বাবুর বাড়ীতে দিগে যা। জানিস তো ছোট রায় মহাশয়ের বাড়ী? ইনি ছোট রায় মহাশয়ের ছেলে।

মেয়েগুলি আপনাদের ভাষায় মৃদুস্বরে কলরব করিয়া অমলকে লইয়া আলোচনা জুড়িয়া দিল। অমল অহীন্দ্রের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, ওরা ওকে নিয়ে যাক।

অহীন্দ্র বলিল, না, তাতে ওরা দুঃখ পাবে। তোমাদের বাড়ীতেই দিয়ে যাক।

বেশ, তা হ'লে তোমাকেও আমাদের ওখানে খেতে হবে।

খাব।

হাসিয়া অমল বলিল, তা হ'লে তুমি জাপানী বৌদ্ধ।

অহীন্দ্র এবার অল্প একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল, দিনে না, রাত্রে খাব কিন্তু; দিনে রান্না করতে দেরিও হবে। আর মায়ের রান্নাবান্না বোধ হয় হয়েই গেছে।

মেয়েগুলি কথা না বুঝিয়াও এতক্ষণে অকারণে হাসিয়া উৎফুল্ল

এবং সহজ হইয়া উঠিল। সারী বলিল, তাই দিব তবে রায় মশায়ের বাড়ীতে রাঙাবাবু ?

হ্যাঁ।

মেয়ের দল কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল। অমল বলিল, চল তা হ'লে, আমরাও যাই।

ঘাটের ঠিকাদার ঠিক সময়ে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে জোড়হাত করিয়া বলিল, বাবু, তা হ'লে আমার আরজির কথাটা মনে রাখবেন।

২০

সেদিন অপরাহ্ণে দুর্য্যোগটা সম্পূর্ণ না কাটিলেও স্তিমিত হইয়া আসিল। বর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে, পশ্চিমের বাতাস স্তব্ধ হইয়া দক্ষিণ দিক হইতে মৃদু বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই বাতাসে আকাশের মেঘগুলি দিক্‌পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তর দিকে চলিয়াছে।

ইন্দ্র রায় কাছারির সামনের বারান্দায় মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিতেছিলেন ; হাত দুইটি পিছনের দিকে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ। একটা কলরব তুলিয়া অচিন্ত্যবাবু বাগানের ফটক খুলিয়া প্রবেশ করিলেন, গেল, এবার পাষণ্ড মেঘ গেল। বাপ রে, বাপ রে, বাপ রে! আজ ছদিন ধ'রে বিরাম নেই জলের। আর, কি বাতাস! উঃ, ঠাণ্ডায় বাত ধ'রে গেল মশায়! তিনি আকাশের মেঘের দিকে মুখ তুলিয়া বলিলেন, এইবার ? এইবার কি করবে বাছাধন ? যেতে তো হ'ল। 'বামুন বাদল বান, দক্ষিণে পেলেই যান'—দক্ষিণে বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে, যাও, এইবার যাও কোথায় যাবে।

রায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার ? অনেক কাল পরে যে ?

অচিন্ত্যবাবু সপ্রতিভভাবে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক দিন পরেই বটে। শরীর সুস্থ না থাকলে কি করি বলুন? অবশেষে কলকাতায় গিয়ে—। অকস্মাৎ অকারণে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, বলুন তো কি ব্যাপার?

চিন্তাবিভোর মানুষ ভ্রূভঙ্গি করিয়া একধারা মৃদু হাসি হাসে, সেই হাসি হাসিয়া রায় বলিলেন, সেটা আবার কি?

হাসিতে হাসিতেই অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, দেখুন ভাল ক'রে দেখুন, দেখে বলুন। হেঁ হেঁ, পারলেন না তো?—বলিয়া আপনার দাঁতের উপর আঙুল রাখিয়া বলিলেন, দাঁত—দাঁত। পার্ল-লাইক টীথ, এই রকম মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত ছিল আমার। পোকাখেকো কালো কালো দাঁত, মনে আছে?

এইবার ইন্দ্র রায়ের মন কৌতুকবোধে সচেতন হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তাই তো মশায়, সত্যিই এ যে মুক্তোর পাঁতির মত দাঁত!

সগর্ব্বে অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, তুলিয়ে ফেললাম। ডাক্তার বল্‌লে কি জানেন? বললে, ওই দাঁতই তোমার ডিসপেপ্‌সিয়ার কারণ। এখন আপনার পাথর খেলে হজম হয়ে যাবে।

বলেন কি?

নি-শ্চ-য়। দেখুন না, ছ মাসের মধ্যে কি রকম বিশালকায় হয়ে উঠি। একেবারে যাকে বলে—ইয়ংম্যান। পরমুহূর্ত্তেই অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জানেন? খাবারদাবার, মানে যাকে বলে পুষ্টিকর খাদ্য, সে তো এখানে খাওয়া যাচ্ছে না।

রায় বলিলেন, এটা আপনি অযথা নিন্দে করছেন আমাদের দেশের। দুধ-ঘি এসব তো প্রচুর পাওয়া যায় আমাদের এখানে।

বিষম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে দুধ ও ঘিকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া অচিন্ত্য-বাবু বলিলেন, আরে মশায়, কি যে বলেন আপনি, বিশেষ ক'রে নিজে তান্ত্রিক হয়ে, তার ঠিক নেই। দুধ-ঘিই যদি পুষ্টিকর খাদ্য হ'ত, তবে গরুই হ'ত পশুরাজ। মাংস—মাংস খেতে হবে, তবে দেহে বল হবে। দুধ-ঘি খেয়ে বড় জোর চর্বিতে ফুলে ষণ্ড হওয়া চলে, বুঝলেন?

রায় হাসিয়া বলিলেন, তা বটে, দুধ-ঘি খেয়ে ষণ্ড হওয়া চলে, পাষণ্ড হওয়া চলে না, এটা আপনি ঠিক বলেছেন।

অচিন্ত্যবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। অপ্রতিভভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, আমিই বোকামি করলাম, আরও কিছুদিন কলকাতায় থাকলেই হ'ত। তা, একটা সাহেব কোম্পানির তাড়ায় এলাম চ'লে। ভাবলাম, সাঁওতালদের একটা দুটো পয়সা দিয়ে একটা ক'রে হরিয়াল, কি তিতির, নিদেন ঘুঘু মারার ব্যবস্থা ক'রে নেব। তা ছাড়া এখানে বন্য শশকও তো প্রচুর পাওয়া যায়, সে পেলে না হয় দু গণ্ডা তিন গণ্ডা পয়সাই দেওয়া যাবে। শশক-মাংস নাকি অতি উপাদেয় আর অতি পুষ্টিকর। মানে, ওরা খায় যে একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ভিটামিন—ছোলা, মসুর, এই সবের ডগা খেয়েই তো ওদের দেহ তৈরি।

রায় বলিলেন, আজ আমি আপনাকে শশক-মাংস খাওয়াব, আমার এখানেই রাত্রে খাবেন, নেমন্তন্ন করলাম। চরের সাঁওতালরা আজ দুটো খরগোশ দিয়ে গেছে।

অচিন্ত্যবাবু হাসিয়া বলিলেন, সে আমি শুনেছি মশায়, বাড়ীতে ব'সেই তার গন্ধ পেয়েছি।

রায় হাসিয়া উত্তর দিলেন, তা হ'লে, সিংহ ব্যাঘ্র না হতে পারলেও ইতিমধ্যেই আপনি অন্তত শৃগাল হয়ে উঠেছেন দেখছি। ঘ্রাণশক্তি অনেকটা বেড়েছে!

অচিন্ত্যবাবু অপ্রস্তুত হইয়া ঠোঁটের উপর খানিকটা হাসি টানিয়া বসিয়া রহিলেন। রায় বলিলেন আসবেন তা হ'লে রাত্রে।

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, বেশ! আবার এখন এই ভিজে মাটিতে ট্যাংট্যাং ক'রে যাচ্ছে কে, তাই আসব? সেই একেবারে খেয়ে-দেয়ে যাব। অম্বল ভাল হ'ল তো সর্দ্দি টেনে আনব নাকি? তা ছাড়া আসল কথাই তো আপনাকে এখনও বলা হয় নি। এক্ষুনি বললাম না, সায়েব কোম্পানির কথা? এবার যা একটা ব্যবসার কথা ক'য়ে এসেছি, কি বলব আপনাকে, একেবারে তিন শ পারসেণ্ট লাভ; দু' শ পারসেণ্টের আর মার নেই।

সকৌতুকে ভ্রূ দুইটি ঈষৎ টানিয়া তুলিয়া রায় বলিলেন, বলেন কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। খসখস চালান দিতে হবে, খসখস বোঝেন তো?

তা বুঝি, বেনাঘাসের মূল।

অচিন্ত্যবাবু পরম সন্তুষ্ট হইয়া দীর্ঘস্বরে বলিলেন, হ্যাঁ। সাঁওতাল ব্যাটারা চর থেকে তুলে ফেলে দেয়, সেইগুলো নিয়ে আমরা সাপ্লাই করব। দেখুন এখন হিসেব ক'রে, লাভ কত হয়।

রায় জবাব দিলেন না, খানিকটা হাসিলেন মাত্র। অন্দরে ভিতর হইতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল, ঈষৎ চকিত হইয়া রায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, পশ্চিমদিগন্তে অল্পমাত্রায় রক্তসন্ধ্যার আভাস থাকায় অন্ধকার তেমন ঘন হইয়া উঠিতে পারে নাই। গভীরস্বরে তিনি ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন, তারা তারা! তারপর অচিন্ত্যবাবুকে বলিলেন, তা হ'লে আপনি একটু নায়েবের সঙ্গে ব'সে গল্প করুন, আমি সান্ধ্যকৃত্য শেষ ক'রে নিই।

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, একটি গোপন কথা ব'লে নিই। মানে মাংস হ'লেও একটু দুধের ব্যবস্থা আমার চাই কিন্তু, ব্যাপারটা

হয়েছে কি জানেন, দাঁত তুলে দিয়ে ডাক্তারেরা বলেন বটে, আর হজমের গোলমাল হবে না, আমি কিন্তু মশায়, অধিকন্তু ন দোষায় ভেবে আফিং খানিকটা ক'রে আরম্ভ করেছি। বুঝলেন, তাতেই হয়েছে কি, ওই গব্যরস একটু না হ'লে আবার ঘুম আসছে না।

রায় মৃদু হাসিয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। একজন চাকর প্রদীপ ও প্রধূমিত ধূপদানি লইয়া কাছারির দুয়ারে দুয়ারে সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিতেছিল, অন্য একজন চাকর দুই-তিনটা লণ্ঠন আনিয়া ঘরে বাহিরে ছোট ছোট তেপায়াগুলির উপর রাখিয়া দিল।

সমৃদ্ধ রায়-বংশের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে অন্ততঃ দুই শ বৎসর পূর্ব্বে, হয়তো দশ-বিশ বৎসর বেশিই হইবে, কম হইবে না। তাহার পূর্ব্বকাল হইতেই রায়েরা তান্ত্রিক দীক্ষায় পুরুষানুক্রমে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। ছোট রায়ের প্রপিতামহ অবধি তন্ত্রের একটা মোহময় প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন; আজও গল্প শোনা যায়, অমাবস্যা অষ্টমী প্রভৃতি পঞ্চ পর্ব্বে তাঁহারা শ্মশানে গিয়া জপতপ করিতেন। তাহারও পূর্ব্বে কেহ একজন নাকি লতা-সাধনে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। যুগের প্রভাবে তন্ত্রের সেই মোহময় প্রভাব এখন আর নাই। কিন্তু তবুও তন্ত্রকে একেবারে তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইন্দ্র রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তন্ত্রমতে সায়ংসন্ধ্যায় বসেন, তখন গলায় থাকে রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধের উপর থাকে কালি-নামাবলী, সম্মুখে থাকে নারিকেলের খোলার একটি পাত্র আর থাকে মদের বোতল ও কিছু খাদ্য—মৎস্য বা মাংস। এক-একবার নারিকেলের মালার পাত্রটি পরিপূর্ণ করিয়া জপতপ ও নানা মুদ্রাভঙ্গিতে তাহা শোধন করিয়া লইয়া পান করেন, তাহার পর আবার আরম্ভ করেন ধ্যান ও জপ; একটি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জপ শেষ করিয়া আবার দ্বিতীয় বার পাত্র পূর্ণ করিয়া ওই ক্রিয়ারই পুনরাবৃত্তি করেন। এমনি ভাবে তিন বারে

তৃতীয় পাত্র শেষ করিয়া তিনি সান্ধ্যকৃত্য শেষ করেন; কিন্তু ইহাতেই তাঁহার দেড় ঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা কাটিয়া যায়, তিন পাত্রের অধিক তিনি সাধারণত পান করেন না।

হেমাঙ্গিনী স্বামীর সান্ধ্যকৃত্যের আয়োজন করিয়াই রাখিয়াছিলেন, ইন্দ্র রায় আসিয়া কাপড় বদলাইয়া আসন গ্রহণ করিতেই তিনি গৃহদেবী কালীমায়ের প্রসাদী কিছু মাছ আনিয়া নামাইয়া দিলেন। রায় বলিলেন, দেখ, অচিন্ত্যবাবুকে আজ নেমন্তন্ন করেছি, তাঁর দুধ একটু ঘন করেই জ্বাল দিয়ে রেখো। ভদ্রলোক আফিং ধরেছেন, ঘন দুধ না হ'লে তৃপ্তি হবে না।

হাসিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বেশ। কিন্তু আর কাউকে নেমন্তন্ন কর নি তো? তোমার তো আবার নারদের নেমন্তন্ন।

না। রায় একটু হাসিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আজ তুমি কি এত ভাবছ বল তো?

নাঃ ভাবিনি কিছু। রায়ের কথার সুরের মধ্যে একটি ক্ষীণ ক্লান্তির আভাস ফুটিয়া উঠিল বলিয়া হেমাঙ্গিনীর মনে হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কুণ্ঠিতভাবে হেমাঙ্গিনী বলিলেন, অমল ছেলেমানুষ, সে কাজটা ছেলেমানুষি ক'রেই করেছে, সেটা—

এইভাবে বাধা দিয়া রায় বলিলেন, ও-কথা উচ্চারণ ক'রো না হেম; তুমি কি আমাকে এমন সঙ্কীর্ণ ভাব? এই সন্ধ্যা করবার আসনে ব'সেই বলছি হেম, সত্যিই আমার আর কোন বিদ্বেষ নেই রামেশ্বর বা তার ছেলেদের ওপর। সুনীতির বড়ছেলে রাধারাণীর মর্য্যাদা রাখতে যা করেছে, তাতে রাধুর গর্ভের সন্তানের সঙ্গে তাদের কোন পার্থক্য আর থাকতে দেয়নি।

হেমাঙ্গিনী চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিতে মন যেন তাঁহার সায় দিল না। রায় হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে আমি সন্ধ্যাটা

সেরে নিই, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে রান্নাবান্নাটা দেখে দাও বরং ততক্ষণ।

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলেন।

রায় একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইষ্টদেবীকে পরম আন্তরিকতার সহিত স্মরণ করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তারা, তারা! সবই তোমার ইচ্ছা মা। তারপর তিনি শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী ভঙ্গিতে আসন করিয়া সান্ধ্যকৃত্য আরম্ভ করিলেন।

হেমাঙ্গিনীর ভুল হইবার কথা নয়। দুর্দ্দান্ত কৌশলী হইলেও ইন্দ্র রায় হেমাঙ্গিনীর নিকট ছিলেন শান্ত সরল উদার। একবিন্দু কপটতার ছায়া কোনদিন তাঁহার মনোতল ছায়াবৃত করিয়া হেমাঙ্গিনীর দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত বা প্রতারিত করে নাই। অমল অহীন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, এ-সংবাদ শুনিবামাত্র রায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া সামাজিক নিমন্ত্রণ-ব্যবহার বন্ধ না হইলেও, ছোট রায়-বাড়ী ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর মধ্যে আহার-ব্যবহারটা রাধারাণীর নিরুদ্দেশের পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বন্ধই ছিল। সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে দুই বাড়ীই ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী বা আপন আপন পূজক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া সামাজিক দায়িত্ব রক্ষা করিতেন।

তাহার পর অকস্মাৎ যেদিন ইন্দ্র রায়েরই নিয়োজিত ননী পাল চক্রবর্ত্তীদের অপমান করিতে গিয়া রায়-বংশের কন্যারই অপমান করিয়া বসিল এবং সে অপমানের প্রতিশোধে চক্রবর্ত্তী-বংশের সন্তান মহীন্দ্র তাহাকে হত্যা করিয়া ফাঁসি বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত হইল, সেদিন হইতে ইন্দ্র রায় যা-কিছু করিয়া আসিতেছেন, সে সমস্ত দানের প্রতিদান হিসাবেই করিয়া আসিতেছেন, অন্তত তাঁহার মনে সেই ধারণাই ছিল। অহীন্দ্র এখানে আসিলে জল খাইয়া যাইত বা অমল অহীন্দ্রের বাড়ীতে কিছু খাইয়া আসিত, তাহার অতি অল্পই তিনি

জানিতেন, বেশির ভাগই ছিল তাঁহার অজ্ঞাত। যেটুকু জানিতেন, সেটুকুকে শুষ্ক শিষ্টাচার বলিয়াই গণ্য করিতেন। দানের প্রতিদানে, তাঁহার দিকের প্রতিদানের ওজনটাই ভারী করিবার ব্যগ্রতায় তিনি চলিয়াছিলেন। আজ যেন তিনি সহসা অনুভব করিলেন যে, এই চলার বেগটা তাঁহার স্বেচ্ছা-আরোপিত বেগ নয়, নিজের ইচ্ছায় নিজের বেগেই তিনি চলিতেছেন না; অপরের চালনায় তিনি চালিত হইয়া চলিয়াছেন। আপনার সমস্ত চৈতন্যকে সতর্ক করিয়া রায় চারিটি দিক চাহিয়া দেখিলেন, তারপর চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখের দিকে। অদৃষ্ট-বাদী হিন্দুর মন তাঁহার, তিনি চারিদিকে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু কিছু যেন অনুভব করিলেন এবং সম্মুখের সমস্ত পথটা দেখিলেন এক রহস্যময় অন্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য। তিনি পিছন ফিরিয়া পশ্চাতের পথের প্রকৃতি দেখিয়া সম্মুখের ওই অন্ধকারাবৃত পথের প্রকৃতি অনুমান করিতে গিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর জীবন-পথ যেখানেই রায়বাড়ীর জীবন-পথের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছে, সেইখানেই একটা করিয়া ভাঙনের অন্ধকারময় খাত অতল অন্ধকূপের মত জাগিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু উপায় কোথায়? দিকপরিবর্ত্তন করিয়া চলিবার কথা মনে হইয়াছে; কিন্তু সেও পরম লজ্জার কথা। মনের ওজনে দান-প্রতিদানের পাল্লার দিকে চাহিয়া তিনি যে স্পষ্ট দেখিতেছেন, চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর দানের পাল্লা এখনও মাটির উপর অনড় হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, সন্তান সম্পদ সব যে চক্রবর্ত্তী-বাড়ী পাল্লাটার উপর চাপাইয়াছে। সুনীতি অহীন্দ্র গভীর বিশ্বাসের সহিত সকরুণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে তাহাদের পাওনা পাইবার প্রত্যাশায়।

জপ করিয়া শোধন-করা সুরাপূর্ণ পানপাত্র তুলিয়া পান করিয়া রায় গভীরস্বরে আবার ডাকিলেন, কালী! কালী! মা! তারপর আবার

তিনি জপে বসিলেন। কিন্তু কাছারি-বাড়ী হইতে অচিন্ত্যবাবুর চিলের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আসিতেছে; লোকটা কাহারও সহিত চীৎকার করিয়া ঝগড়া বা তর্ক করিতেছে। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই আপনাকে সংযত করিয়া প্রগাঢ়তর নিষ্ঠার সহিত সকল ইন্দ্রিয়কে রুদ্ধ করিয়া তিনি ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

অচিন্ত্যবাবু ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন অমল ও অহীন্দ্রের উপর। সন্ধ্যার পর তাহারা দুইজনে বেড়াইয়া আসিয়া চা পান করিতে করিতে পলিটিক্সের আলোচনা করিতেছিল। অচিন্ত্যবাবু নায়েবের কাছে বসিয়া অনর্গল বকিতেছিলেন, সহসা চায়ের পেয়ালা পিরিচের ঠুং ঠাং শব্দ শুনিবামাত্র তিনি সে-ঘর হইতে উঠিয়া অমলদের আসরে আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। অমল তীব্রভাবে ইংরেজ-রাজত্বের শোষণ-নীতির সমালোচনা করিতেছিল।

অহীন্দ্র বলিল, পরাধীন জাতির এই অদৃষ্ট অমল, পরাধীনতা থেকে মুক্ত না হ'লে শোষণ থেকে অব্যাহতির উপায় নেই।

পুতুলনাচের পুতুলের মত অচিন্ত্যবাবুর মুখ চায়ের কাপ হইতে অহীন্দ্রের দিকে ফিরিয়া গেল, সবিস্ময়ে অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, কি? ইংরেজ-রাজত্ব তুমি উলটে দিতে চাও?

ঈষৎ হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, চাইলেও সে ক্ষমতা আমার নেই, তবে অন্তরে অন্তরে সকলেই স্বাধীনতা চায়, এটা সার্ব্বজনীন সত্য।

তক্তাপোশের উপর একটা চাপড় মারিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, নো, নো, নো—। বলিতে বলিতে উত্তেজনার চাঞ্চল্যে খানিকটা গরম চা তাঁহার কাপড়ে পড়িয়া গেল, ফলে তাঁহার বক্তব্য আর শেষ হইল না, চায়ের কাপ সামলাইতে তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

অমল বলিল, আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন উত্তেজিত হব না? সাহেবদের তাড়িয়ে

কি রাজত্ব করবে তোমরা বাপু? বলে, ছেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে চায়। এমন বিচার করবার তোমাদের ক্ষমতা আছে? তোমরা আজ চাকর রাখবে, কাল তাড়াবে কুকুরের মত। কই, গভর্ণমেণ্টের একটা পিওনের চাকরি সহজে যাক তো দেখি! তারপর বুড়ো হ'লো তো, পেনশান! আছে এ বিবেচনা তোমাদের?

অমল ও অহীন্দ্র উভয়েই এবার হাসিয়া ফেলিল।

অচিন্ত্যবাবু চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন, হেসো না, বুঝলে, হেসো না। এই হ'ল তোমাদের জাতের স্বভাব—বড়কে ছোট ক'রে হাসা আর ভায়ে ভায়ে লাঠালাঠি করা। ইংরেজ হ'ল আমাদের ভাই, তাদের লাঠি মেরে তাড়িয়ে নিজেরা রাজত্ব করবে? বাঃ, বেশ!

অমল ও অহীন্দ্র উভয়েই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অচিন্ত্য-বাবু এবার অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোমরা অত্যন্ত ফাজিল ছেলে হে! বলি, এমন ফ্যাকফ্যাক ক'রে হাসছ কেন শুনি?

অমল বলিল, ইংরেজ আমাদের ভাই?

তক্তাপোশের উপর প্রাণপণ শক্তিতে আবার একটা চাপড় মারিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, নিশ্চয় সার্টেন্‌লি। ইংরেজ আমাদের ভাই, জ্ঞাতি, এক বংশ। পড়নি ইতিহাস? ওরাও আর্য্য, আমরাও আর্য্য। আরও প্রমাণ চাও? ভাষার কথা ভেবে দেখ। আমরা বাবাকে প্রাচীন ভাষায় বলি, পিতা পিতর্, ওরা বলে ফাদার। মাতর্ মাদার, বাবা, পাপা। ভ্রাতা ব্রাদার। তফাত কোন্‌খানে হে বাবু? আমরা ভয় পেলে হরি-বোল হরি-বোল, ওরা হরিব্‌ল হরিব্‌ল। চামড়ার তফাতটা তো বাইরের তফাত হে, সেটা কেবল দেশভেদে, জল-বাতাসভেদে হয়েছে।

তর্কটা আর অগ্রসর হইতে পারিল না, নায়েব আসিয়া বাধা দিল।

বলিল, অচিন্ত্যবাবু, আপনি একটু থামুন মশায়, একটি বাইরের ভদ্রলোক এসেছেন, ধনী মহাজন লোক ; কি ভাববেন বলুন তো ?

অচিন্ত্যবাবু মুহূর্ত্তে তর্ক থামাইয়া দিয়া ভদ্রলোক সম্বন্ধে উৎসুক হইয়া উঠিলেন, এ-ঘর ছাড়িয়া ও-ঘরে ভদ্রলোকটির সম্মুখে গিয়া চাপিয়া বসিয়া বলিলেন, নমস্কার। মহাশয়ের নিবাসটি জানতে পারি কি ?

প্রতি-নমস্কার করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, আমার বাড়ী অবশ্য কলকাতায়, তবে কর্ম্মস্থল আমার এখন এই জেলাতেই। সদর থেকেই আমি এসেছি।

এখানে—মানে, কি উদ্দেশ্যে—যদি অবশ্য—

আমি এখানে একটা চিনির কল করতে চাই। শুনেছি, নদীর ও-পারে একটা চর উঠেছে, সেখানে আখের চাষ ভাল হতে পারে; তাই দেখতে এসেছি জায়গাটা।

অচিন্ত্যবাবু গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বেনার মূলের ব্যবসায়ের প্রতিবন্ধকতা অনুভব করিয়া নীরবে গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন। নায়েব বলিল, আপনি বসুন একটু, আমি দেখি, কর্ত্তাবাবুর সন্ধ্যা শেষ হয়েছে কি না।

নায়েব বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, মা !

হেমাঙ্গিনী মাথার ঘোমটা অল্প বাড়াইয়া দিয়া ঘর হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, কিছু বলছেন ?

আজ্ঞে, কর্ত্তাবাবুর সন্ধ্যা শেষ হয়েছে ?

তা হয়ে থাকবে বৈকি। কোনও দরকার আছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একটি ভদ্রলোক এসেছেন, চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর ওই চরটা দেখবেন। তিনি একটা চিনির কল বসাবেন। আমাদের এখানে এসে উঠেছেন।

ও। আচ্ছা, আমি খবর দিচ্ছি, আপনি যান। চা-জলখাবারও পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নায়েব চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী চায়ের জল বসাইয়া দিতে বলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। অর্দ্ধেকটা সিঁড়ি উঠিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন মৃদুস্বরে রায় আজ গান গাহিতেছেন—"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।" তিনি একটু বিস্মিত হইয়া গেলেন, গান তো তিনি বড় একটা গান না। অভ্যাসমত তিন পাত্র 'কারণ' পান করিলে রায় কখনও এতটুকু অস্বাভাবিক হন না। পর্ব্ব বা বিশেষ কারণে তিন পাত্রের অধিক পান করিলে কখনও কখনও গান গাহিয়া থাকেন। হেমাঙ্গিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে সুরাপূর্ণ পাত্র রাখিয়া রায় মৃদুস্বরে গান গাহিতেছেন। তিনি বেশ বুঝিলেন, সন্ধ্যা শেষ হইয়া গিয়াছে, রায় আজ নিয়মের অতিরিক্ত পান করিতেছেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, এ কি? সন্ধ্যে তো হয়ে গেছে, তবে যে আবার নিয়ে বসেছ?

মত্ততার আবেশমাখা মৃদু হাসি হাসিয়া রায় হাত দিয়া পাশেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া বলিলেন, ব'স ব'স। মাকে ডাকছি আমার। আমার সদানন্দময়ী মা। তিনি আবার পূর্ণপাত্র তুলিয়া লইলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ওই শেষ কর। আর খেতে পাবে না।

রায় বলিলেন, আজ আনন্দের দিন। চক্রবর্ত্তী-বাড়ী আর রায়-বাড়ীর বিরোধের শেষ কাঁটাও আজ মা তুলে দিলেন। আনন্দ করব না? পাঁচ হয়েছে, সাত শেষ করব হেম, সাত-পাঁচ ভাবা আজ শেষ ক'রে দিলাম।

বলিয়া হেমাঙ্গিনীর মুখের সম্মুখে হাত নাড়িয়া আবার গান ধরিলেন, "সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।"

চিনির-কল-ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটির নাম বিমলবাবু। বিমলবাবু পরদিন সকালে গিয়া চর দেখিয়া আসিলেন। রাত্রের মধ্যে বান অনেক কমিয়াছে, তবুও চরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এখনও জলমগ্ন; সেই অবস্থাতেই তিনি চরটি দেখিয়া খুশি হইয়া উঠিলেন। সকলের চেয়ে বেশি খুশি হইলেন তিনি সাঁওতালদের দেখিয়া। ছোট রায়-বাড়ীর নায়েব মিত্তির ছিল তাঁহার সঙ্গে, বিমলবাবু মিত্তিরকে বলিলেন, অদ্ভুত জাত মশায় এরা, যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি কি খাটে! আমাদের দেশী লোকের মত নয়, ফাঁকি দেয় না।

মিত্তির মৃদু হাসিয়া বিমলবাবু অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বলিল, তাও অনেক ফাঁকি দিতে শিখেছে, মশায়, আজকাল। ধীরে ধীরে শিখছে, বুঝলেন? যখন ওরা প্রথম এল এখানে, তখন একটা লোকে যা কাজ করত, এখন সেই কাজ করে দুটো লোকে; দেড়টা লোক তো লাগেই।

বিমলবাবু ব্যবসায়ী লোক, কয়েকটি কলের মালিক, শ্রমিক-মজুরদের সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রচুর। তাহার উপর তিনি উচ্চ-শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক; মিত্তিরের কথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিলেন, বলিলেন, কিন্তু এখনও ওরা একজনে যা করে, সে-কাজ করতে আমাদের দেশী লোক অন্তত দেড়টা লাগে। দুটোই বলতাম, তা আপনার ভয়ে দেড়টাই বলছি।

মিত্তির এবার সন্তোষের হাসি হাসিল। বিমলবাবু তাহাকে ভয় করিয়া কথা বলিতেছেন, এটুকু তাহার বেশ ভালই লাগিল। হাসিয়া বিমলবাবুর কথা মানিয়া লইয়াই সে এবার বলিল, তা বটে।

বিমলবাবু বলিলেন, চলুন, একবার ওদের পাড়ার মধ্যে যাওয়া

যাক। একটু আলাপ করে রাখা যাক। কল চালাতে হ'লে ওদের না হ'লে তো চলবে না।

শ্রীবাসের দোকানের সম্মুখ দিয়াই পথ, দোকানের সম্মুখে আসিয়াই মিত্তির বলিল, ওরে বাপ রে। এখানেই যে সব ভিড় লাগিয়ে রয়েছিস রে মাঝিরা! কি করছিস সব এখানে?

শ্রীবাসের দোকানে বসিয়া মাঝিরা বাকির খাতায় টিপ-সহি দিতেছিল। শ্রীবাস একটি হুঁকা হাতে বসিয়া সমস্ত দেখিয়া লইতেছিল। মিত্তির ও অপরিচিত বিমলবাবুকে দেখিয়া সে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি হুঁকাটি রাখিয়া উঠিয়া পথে নামিয়া আসিল, অর্দ্ধনত হইয়া একটি নমস্কার করিয়া বলিল, পেনাম। তারপর, মিত্তির মশায়, কোন্ দিকে? এই বজ্রের মধ্যে? আর এই বাবুটি?

মিত্তির হাসিয়া বলিল, ইনি হলেন কলকাতার লোক, এসেছেন চর দেখতে। এখানে একটা চিনির কল করবেন। তাই এসেছিলাম ওঁকে সঙ্গে নিয়ে। তারপর, তোমার এখানে এত ভিড় কিসের?

চিনির কল করবেন? বিস্ময়ে শ্রীবাসের চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

চিনির কলও হবে, সঙ্গে সঙ্গে আখের চাষও হবে। কিন্তু আপনার নামটি কি? দোকানটি আপনার? বিমলবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শ্রীবাসের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীবাসের মুখ কঠিন অসন্তোষে শুষ্ক হইয়া উঠিল, সে বলিল, কল কি এখানে চলবে আপনার? এত আখ পাবেন কোথা?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কল হ'লেই চারিদিকে আখের চাষ বেড়ে উঠবে। দোকান আপনার খুব ভাল চলবে দেখবেন। তার ওপর জমিও বোধ হয় আছে আপনার এখানে, তাতেও আরম্ভ করুন আখের চাষ। কল আপনাদের অনিষ্ট করবে না, ভালই করবে।

ভাল কথা, এখানে এবারেই আমার পনেরো লাখ ইট হবে। আপনার তো দোকান এই চরের ওপরেই? আমার অনেক কুলী আসবে শহর থেকে ইঁট তৈরী করবার জন্তে, দু মাসের মধ্যেই এসে পড়বে, দোকান আপনি বাড়িয়ে ফেলুন।

শ্রীবাসের মুখ ধীরে ধীরে কোমল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে এবার বলিল, তা আপনাদের মত ধনী যেখানে আসবে, সেখানে তো দশের অবস্থা ভালই হবে। দোকান আমি হুকুম হলেই বাড়াব। আর দেখতে শুনতে যা-হয় আমিই সব দেখে-শুনে দেব। এই দেখুন, এই সব সাঁওতাল বেবাক আমার তাঁবে। আমার কাছেই ধান খায় বছর বছর। এক নেয়, এক দেয়। ওদের সঙ্গে খুব সুখ আমার। লোকজন যা দরকার হবে, সব আমি ঠিক ক'রে দেব।

মিস্তির বলিল, আজকে এত ভিড় কিসের হে?

আজ্ঞে, আজ ওদের 'রোয়া' পরব। মানে, চাষের জল তো লেগে গেল, তা ধান রুইবার আগে ওরা পূজো-টুজো দেবে। তারপর চাষে লাগবে। তাই সব জিনিস-পত্তর নিচ্ছে, আর খোরাকির ধানও নিচ্ছে।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই নাকি, আজ ওদের পর্ব্ব? তা হ'লে তো বড় ভাল দিনে এসে পড়েছি। বাঃ! কই, ওদের সর্দ্দার কই?

সাঁওতালদের সমস্ত দলটি নীরবে বসিয়া এক বিচিত্র দৃষ্টিতে বিমলবাবুকে দেখিতেছিল; বিস্ময়, ভয়, শ্রদ্ধা, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু সে দৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পাইতেছিল। বিমলবাবুর আহ্বানেও কমল সাড়া দিল না, তাহার প্রকাণ্ড দেহ লইয়া সে খানিকটা নড়িয়া-চড়িয়া বসিল মাত্র। শ্রীবাস ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বিমলবাবুকে সম্ভ্রম ও সাঁওতালদের উপর আধিপত্য দুইই একসঙ্গে দেখাইয়া বিরক্তি-

পূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিল, এই কমল মাঝি, কানে তোর কথা ঢুকছে না, না কি? ইদিকে আয়। কত বড়লোক ডাকছেন, দেখছিস্ না?

কমল এবার উঠিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া নত হইয়া প্রণাম জানাইয়া বলিল, কি বলছিস আপুনি?

হাসিয়া বিমলবাবু পরিষ্কার সাঁওতালী ভাষায় বলিলেন, তুমি এখানকার সর্দ্দার?

উপবিষ্ট সাঁওতালদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তাহাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠিল, এই, এই বাবু আমাদের কথা বুলছে, আমাদের কথা বুলছে! উ বাবা রে!

বিমলবাবু সাঁওতালীতেই বলিলেন, হ্যাঁ, তোদের ভাষাতেই কথা বলছি আমি।

কমল ভাঙা ভাঙা বাংলাতেই প্রশ্ন করিল, আমাদের ভাষা আপুনি কি ক'রে জানলিন বাবু?

আমার কাছে অনেক সাঁওতাল কাজ করে। আমার তিনটে কল আছে। কল বুঝিস্ তো?

হঁ হঁ। আপুনি চলে, খুব ধুঁয়া উঠে হিসহিস ক'রে। একটো এই মোটা, এই বড় লোহার চোঙা থেকে ধুঁয়া উঠে, গুমগুম শব্দ উঠে। বয়লা চলে, রিঞ্জি চলে—

হ্যাঁ। বয়লার-এঞ্জিনে কাজ হয় কলে। এখানেও একটি কল করব আমি। তোরা সব কাজ করবি। তারপর, আজ তোদের রোয়া পরব বটে, নয়?

কমলের বড় বড় হলুদ রঙের দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল, বলিল, তাই তো করছি গো। জল তো অনেক হয়ে গেল। বীজ-চারা-গুলান বড় হইছে, আর ব'সে থেকে কি হবে?

ঠিক ঠিক। তা, চিত কোপে জম এঃঃয়া ? আজ কি কি খাওয়াদাওয়া হবে রে, অ্যাঁ ?

হাসিয়া কমল এবার নিজের ভাষাতেই বলিল, জেল, দাকা, হাণ্ডি।

ওঃ, তা হ'লেতো আজ ভোজ রে তোদের। মাংস, ভাত, পচুই —অনেক ব্যাপার যে! কত হাণ্ডি করেছিস ?

সলজ্জভাবে কমল বলিল, করলম, তা মেলাই হবে গো। মেয়েগুলা খাবে, আমরা খাব, তবে তো আমোদ হবে।

ঠিক ঠিক। তা বেশ। এই নে, আজ তোদের পরবের দিন, খাওয়া-দাওয়া করবি।—বলিয়া মনিব্যাগ বাহির করিয়া ব্যাগ হইতে একখানি নোট বাহির করিয়া কমলের হাতে দিলেন। কমল সন্তর্পণে নোটখানির দুই প্রান্ত দুই হাতের আঙুল দিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে নোটখানার ছাপের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিমলবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, 'গেল্' টাকা, দশ টাকা পাবি ওটা দিলে।

সমস্ত দলটি সবিস্ময়ে এবার কলরব করিয়া উঠিল।

বিমলবাবু হাসিয়া মিত্তিরকে বলিলেন, চলুন তা হ'লে এবার। আসি এখন দোকানী মশায়। চললাম রে মাঝি।

কমল বলিল, হঁ-হঁ, আসুন গা আপুনি। খাটব, আপোনার কলে আমরা খাটব।

সাঁওতাল-পল্লীর মাঝখান দিয়া পরিচ্ছন্ন মেটে পথটি এই কয় দিনের প্রচণ্ড বর্ষণে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়াই ছিল; তাহার উপর পর্ব্ব উপলক্ষ্যে মেয়েরা পথের উপর ঝাঁটা বুলাইয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীর দুয়ারের মুখে মুখে একটি করিয়া মাড়ুলি দিয়াছে। আপনাদের উঠানে উঠানে মেয়েগুলি আজ খুব ব্যস্ত। তৎপরতার সহিত কাজ

করিয়া ফিরিতেছে। ছোট ছোট মেয়েগুলি আঁচলে ভরিয়া শাক সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে। আজিকার পর্ব্বে শাক একটা প্রধান উপকরণ।

চলিতে চলিতে মিত্তির বিকৃত মুখে বার বার জোরে জোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে বলিল, উঃ, মদে আজ ব্যাটারা বান ডাকিয়ে দেবে। পচুইয়ের গন্ধ উঠেছে দেখুন দেখি।

বিমলবাবু বলিলেন, প্রত্যেক বাড়ীতে মদ তৈরি হচ্ছে আজ। পরব কিনা! পরবে ওরা কখনও দোকানের মদ কিনে খায় না; দোকানের মদ হ'ল অপবিত্র। আর তা ছাড়া পয়সাও লাগবে বেশি। মদের কথা বলিতে বলিতেই বিমলবাবুর যেন একটা জরুরী কথা মনে পড়িয়া গেল। কথার স্বরে ও ভঙ্গিমায় গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলিলেন, ভাল কথা, এখানে পচুইয়ের দোকান সবচেয়ে কাছে কোথায় বলুন তো?

মিত্তির বিস্ময় বোধ করিয়াও না হাসিয়া পারিল না। হাসিয়া বলিল, হঠাৎ পচুইয়ের দোকানের খোঁজ?—বলিয়াই হঠাৎ মিত্তির বিমলবাবুর মতলবটা অনুমান করিয়া লইল, বলিল বুঝেছি, মেয়া চাই। মাছধরার বাতিক কি কলকাতার বাবুদের সবারই মশায়? তা আমার বাবুর পুকুরে খুব বড় বড় মাছ, এক-একটা আঠারো সের, বিশ সের, বাইশ সের।

বিমলবাবু বলিলেন, না, মাছ ধরবার জন্যে নয়। আমার কুলী আসবে এখানে। পগমিল, বক্স মোল্ডিঙের লোক তো এখানে মিলবে না। অন্তত ষাট-সত্তরজন কুলী আসবে। পচুইয়ের দোকান কাছে না থাকলে তো অসুবিধা হবে।

বার বার ঘাড় নাড়িয়া ব্যাপারটা উপলব্ধি করিয়া মিত্তির বলিল, অ্যাই দেখুন, এই নইলে কি পাকা ব্যাবসাদার হওয়া যায়? বটে,

মশায় বটে! দিষ্টি রাখতে হবে চারদিকে। তা, পচুইয়ের দোকান আপনার একটুকু দূরেই হবে। ক্রোশ দুয়ের কম নয়! তা হ'লে?

বিমলবাবু পকেট হইতে নোটবই বাহির করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়াই কথাটি নোট করিয়া লইলেন এবং তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, একটা দোকান স্যাংশন করিয়ে নেব এইখানেই। কল হ'লে তো চাইই। তা, আগে থেকেই ব্যবস্থা ক'রে নেব।

পথের ধারেই একটি ঘনপল্লব কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায় কতকগুলি সাঁওতালদের মেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। গাছটির গোড়ায় সুন্দর একটি মাটির বেদী ও বেদীর চারিপাশে খানিকটা জায়গা গোবর ও মাটি দিয়া অপূর্ব্ব পরিচ্ছন্নতার সহিত নিকানো; বেদীটির চারিদিক খড়ি-মাটির আলপনা দিয়া চিত্রিত করিয়া তোলা। মেয়েগুলি তখনও সম্মুখের নিকানো জায়গাটির উপর খড়িমাটির গোলা দিয়া আলপনার ছবি আঁকিতেছিল—পাখী ও পশুর ছবি, তাহার পাশে পাশে খেজুরগাছের ডালপালা, ধানগাছের ছবি; একটি মেয়ে আপনার সাদা রেখার মধ্যে মধ্যে সিঁদুরের লাল টোপা দিতেছিল। দিতে দিতে মৃদুস্বরে সকলে মিলিয়া পর্ব্বের কল্যাণী-গান গাহিতেছিল—

ঠাকুরাহি সিরিজিলা ইনা পিরথিমা হো,
ঠাকুরাহি সিরিজিলা গাইরা জো ইয়ারে
পুরুবাহি ডাহারালি গাইয়া জো ইয়ারে,
পুরুবাহি ডাহারালি—গাইয়া জো—

বিমলবাবু মৃদু হাসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহাদের আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল। মেয়েদের দলও সবিস্ময়ে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহাদেরও গান মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিয়াছিল। বেশির ভাগ মেয়েরাই গান বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, গাহিতেছিল

কেবল দুই-একজন প্রবীণা। মাঙ্গলিক গান তাহারা বন্ধ করিবে কি করিয়া ?

মিত্তির বলিল, চলুন, চলুন।

মেয়েদের দল হইতে সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি, কমল মাঝির নাতনী সারী, আগাইয়া আসিয়া বলিল, একটি ধার দিয়ে যা গো বাবুরা। ই-ঠিনে আমাদের পূজো হবে।

কতকগুলো ছেলে মাথায় ফুলওয়ালা গোটাকয়েক লাল রঙের মোরগের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। মহা উৎসাহ তাহাদের ; আপনাদের ভাষায় অতিমাত্রায় মুখর পাখীর মত একসঙ্গে কলকল করিয়া বকিয়া চলিয়াছে। মিত্তির বলিল, ওরে বাপ রে! এতগুলো মুরগী আজ তোরা খাবি নাকি ?

সারী বলিল, কেনে, উ কথা বুলছিল কেনে ? তুর লোভ হচ্ছে নাকি ?

মিত্তির বৈষ্ণব মানুষ, সে ঘৃণায় থুথু ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, রাম রাম রাম। অ্যাঁ, ই হারামজাদা বলে কি গো ?

সারী বলিল, তবে তু খাবার কথা বুলছিস কেনে ? উ আমরা দেবতাকে দেব ? কাটব এই দেবতা-থানে। তারপরে কুটিকুটি ক'রে একটি মাটিতে পুঁতব, আর সবগুলো রাঁধব। আগে থেকে খাবার কথা তু বুলছিস কেনে ?

মিত্তির মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, চলুন মশায়, চলুন, আমার গা ঘিন-ঘিন করছে।

বিমল দেখিতেছিলেন সারীকে। চলিবার জন্য পা বাড়াইয়া তিনি বলিলেন, বাঃ, মেয়েটির দেহখানি চমৎকার, tall, graceful; —youth personified !

সারী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, কি বুলছিস তু উ-সব ?

মৃদু হাসিয়া বিমলবাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন, কথার কোন উত্তর দিলেন না। নদীর পারঘাটের পাশেই অপেক্ষাকৃত বড় বড় সাঁওতাল ছেলেগুলি গরু-মহিষগুলিকে পরিপাটি করিয়া স্নান করাইতেছিল। কয়টা ছেলে আজও লম্বা লাঠি লইয়া জলের ধারের গর্ত্তগুলিতে খোঁচা দিয়া শিকারের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

* * * *

মিত্তির ও বিমলবাবু চলিয়া যাইতেই শ্রীবাস গভীর চিন্তান্বিত মুখে দোকানের সামনে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। এখানে চিনির কল হইবে! চরখানা বাড়ীঘর লোকজনে ভরিয়া যাইবে! হ্যাঁ, দোকানটা বড় করিতেই হইবে। বর্ষার শেষেই একখানা লম্বা তিন-কুঠারী ঘর আরম্ভ করিয়া দেওয়া চাইই। ঘরের বনিয়াদ ও মেঝেটা পাকা করিলেই ভাল হয়। যে ইন্দুরের উপদ্রব! ওই বাবুর ইট তো অনেক হইবে, পনেরো লাখ। তাহা হইতে ভাঙা-চোরা যাহা পড়িয়া থাকিবে, তাহাতেই তো একটা প্রকাণ্ড দালান তৈয়ারি হইতে পারিবে। আর লোকজনের সঙ্গে একটু, যাহাকে বলে সুখ, সেই সুখ থাকিলে—। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবাসের ঠোঁটের ডগায় অতি মৃদু একটি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই আবার সে গম্ভীর হইয়া পড়িল। আঃ, আরও খানিকটা জমি যদি সে দখল করিয়া রাখিত! জমির দাম হু-হু করিয়া বাড়িয়া যাইবে। দুই শ আড়াইশ টাকা বিঘা তো কথাই নাই।

সাঁওতালের দল শ্রীবাসের অপেক্ষাতেই বসিয়া ছিল, তাহাদের কাজ-কর্ম্ম বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। হিসাবের খাতায় টিপছাপ দিবার পর ধান মাপা হইবে। ওদিকে 'রোয়া' পর্ব্বের সমারোহ তাহাদের বর্ব্বর মনকে মুহুর্মুহু আকর্ষণ করিতেছে। তাহারা ক্রমাগত নড়িয়া-চড়িয়া বসিতেছিল, আর ব্যগ্রদৃষ্টিতে শ্রীবাসকে লক্ষ্য করিতেছিল।

তাহার উপর এই আকস্মিক টাকাপ্রাপ্তিতে পর্ব্বটা আরও রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। চূড়া, সেই কাঠের পুতুলের ওস্তাদ রসিক সাঁওতালটি, দেখিয়া শুনিয়া বলিয়া উঠিল, এ বাবা গো! মোড়লের আমাদের হ'ল কি? ডাঁশ কামড়াছে নাকি গো? এমন ক'রে ঘুরছে কেনে? ও সর্দ্দার! তোমার মুখ কি কেউ সেলাই ক'রে দিল নাকি?

কমল এবার ডাকিল, মোড়ল মশায় গো!

শ্রীবাস ঈষৎ চকিত হইয়া বলিল, কি? ও, যাই। সে ফিরিয়া আসিয়া তক্তাপোশের উপর বসিল। কমল বলিল, লেন গো, টিপ-ছাপগুলা লিয়ে লেন গো। ইয়ার বাদে আবার ধান মাপতে হবে।

হুঁ। হিসাবের খাতাটা কোলের কাছে টানিয়াই শ্রীবাসের মাথার মধ্যে একটা কথা বিদ্যুৎচমকের মত খেলিয়া গেল। জমির দাম বাড়িবে। টিপছাপ খাতায় না লইয়া একেবারে বন্ধকী দলিল করিয়া লইলে—; কিন্তু বর্ব্বরের দল বড় সন্দিগ্ধ। আবার একটা গোঁ ধরিয়া অবুঝের মত বলিবে, কেনে গো, উটিতে ছাপ কেনে দিব গো? তু যি বুললি, খাতাতে ছাপ দিতে হবে! পরমুহূর্ত্তেই সে দোয়াতটা খাতার উপর উল্‌টাইয়া ফেলিল এবং আঁতকাইয়া বলিয়া উঠিল, যা সর্ব্বনাশ হ'ল।

সাঁওতালদের দলও অপরিসীম উদ্বেগে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, যাঃ।

শ্রীবাসের ছেলে বাপকে তিরস্কার করিয়া বলিল, কি করলে বল তো? হ'ল তো! যাক, ও পাতখানা বাদ—

বাধা দিয়া শ্রীবাস অত্যন্ত দুঃখিত ভঙ্গিতে বলিল, উহু। এক কাজ কর, বোঁ ক'রে ও-পারে ভেণ্ডারের কাছ থেকে ডেমি নিয়ে আর খান পঁচিশেক। তারপর খাতা বেঁধে নিলেই হবে।

শ্রীবাসের ছেলে গণেশ একবার ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি ক্ষেপেছ নাকি? ডেমিতে কে কোন্‌কালে খাতা করে, শুনি?

দুরন্ত ক্রোধে অদ্ভুত দৃষ্টিতে বিকৃত মুখে শ্রীবাস নীরবে গণেশের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, তোকে যা করতে বলছি, তাই কর্‌। যা, এখুনি যা, যাবি আর আসবি।—বলিয়া বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিল।

সাঁওতালেরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া শ্রীবাসের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল, শ্রীবাস গম্ভীরমুখে উঠিয়া বলিল, টিপছাপ পরে হবে মাঝি, গণেশ কাগজ নিয়ে আসুক। ততক্ষণে তোরা আয়, বাখার ভেঙে ধানটা মেপে ঠিক ক'রে রাখ। তোদের সব আজ আবার পরব আছে।

সাঁওতালেরা এ কথায় খুব খুশি হইয়া উঠিল। কমল বলিল, নাঃ মোড়ল বড় ভাল লোক, বিবেচনা আছে মোড়লের।

চূড়া মাঝি ভ্রূ নাচাইয়া বলিল, কিন্তু ভারী বেকুব হয়ে গিয়েছে মোড়ল কালিটা ফেলে। ছেলের ওপর রাগ দেখলি না!

চূড়ার ব্যাখ্যায় সকলেই ব্যাপারটা সকৌতুকে উপভোগ করিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সত্যই মোড়ল বড় বেকুব হইয়া গিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে খড়ের তৈয়ারি মোটা দড়া জড়াইয়া বাঁধা বাখারটা ভাঙিয়া স্তূপাকার করিয়া ধান ঢালা হইল। হুস-হাস করিয়া টিন-ভর্ত্তি ধান মাপিয়া মাপিয়া ফেলা হইতে লাগিল। শ্রীবাস ধানের মাপের সঙ্গে হাঁকিতে আরম্ভ করিল, রাম—রাম, রাম—রাম, রাম—রামে দুই-দুই, দুই-রামে—তিন-তিন।

চূড়া এক পাশে বসিয়া একটা কাঠি লইয়া মাপের সঙ্গে সঙ্গে একটা করিয়া দাগ দিয়া সাঁওতালদের তরফ হইতে হিসাব করিয়া যাইতেছিল।

এ-দিকে গ্রামের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড জটলা পাকাইয়া উঠিল। সকাল হইতে না হইতে গ্রামের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রটিয়া গেল, ও-পারের চরের উপর চিনির কল বসিতেছে। খাস কলিকাতা হইতে এক ধনী মহাজন আসিয়াছেন, তিনি সঙ্গে আনিয়াছেন প্রচুর টাকা—ছোট একটি ছালায় পরিপূর্ণ এক ছালা টাকা। সঙ্গে সঙ্গে রায়বংশের অন্য সমস্ত শরিকেরা একেবারে লোলুপ রসনায় গ্রাস বিস্তার করিয়া জাগিয়া উঠিল। অপর দিকে উর্ব্বর-জমি-লোলুপ চাষীর দল বাঘের গোপন পার্শ্বচর শৃগালের মত জিভ চাটিতে চাটিতে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সর্ব্বপ্রথম নবীন বাগ্দীর স্ত্রী মতি বাগ্দিনী শিশু পৌত্রকে কোলে করিয়া চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অন্দরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে আরম্ভ করিল।

সংবাদটা শুনিয়া রংলাল বাড়ী ফিরিয়া অকারণ স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া প্রচণ্ড ক্রোধে লাঠির আঘাতে রান্নার হাঁড়ি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল। তারপর স্তব্ধ হইয়া মাটির মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল।

মনের আক্ষেপে অচিন্ত্যবাবুর সমস্ত রাত্রি ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই। ফলে—অতিপুষ্টিকর শশক-মাংস বদহজম হেতু নানা গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভদ্রলোক অন্ধকার থাকিতেই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া ঢক ঢক করিয়া এক গ্লাস জল ও খানিকটা সোডা খাইয়া মর্ণিং ওয়াকের জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। খুব জোরে খানিকটা হাঁটিয়া তিনি সম্মুখে ভরা কালিন্দীর বাধা পাইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। ও-পারের চরটা অন্ধকারের ভিতর হইতে বর্ণে বৈচিত্র্যে সম্পদে অপরূপ হইয়া প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে; গভীর তমিস্রাময়ী কালী যেন কমলা রূপে রূপান্তরিতা হইতেছেন।

অচিন্ত্যবাবু লক্ষ্য করিতেছিলেন, বেনাঘাসের গাঢ় সবুজ ঘন জঙ্গল চরের এ-প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। উঃ রাশি রাশি খসখস ওই ঘন সবুজ আস্তরণের নীচে লুকাইয়া আছে। খেয়াঘাটের ঠিকাদার ঠিক এই সময়েই ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। অচিন্ত্যবাবুকে দেখিয়া সে একটি প্রণাম করিয়া বলিল, আজ আজ্ঞে, ভাগ্যি আমার ভাল। পেভাতেই ব্রাহ্মণদর্শন হ'ল। এই ঘাট নিয়ে বুঝলেন কিনা, কত যে জাত-অজাতের মুখ সকাল দেখতে হয়! এ কাজ আপনার অতি পাজী কাজ মশায়। তবে দুটো পয়সা আসে, তাই বলি—

অসমাপ্ত কথা সে আকর্ণ-বিস্তার হাসিয়া সমাপ্ত করিল—

অচিন্ত্যবাবু আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, লাভ এবার তোমার ভালই হবে, বুঝলে কিনা। ও-পারের চরে কল বসছে, চিনির কল। লোকজনের আনাগোনা দেখতে দেখতে বেড়ে যাবে তোমার।

ঠিকাদার সবিস্ময়ে অচিন্ত্যবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কল? চিনির কল?

হ্যাঁ, চিনির কল। কাল কলকাতা থেকে মস্ত এক মহাজন এসেছে, সঙ্গে একটি ছালা টাকা। আমি নিজের চোখে দেখেছি। কাল আমার ছোট রায়ের বাড়ীতে নেমন্তন্ন ছিল কিনা।

ঠিকাদার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, ই টাকা কে পাবে? চরটা ত চক্রবর্ত্তী-বাড়ীরই বলছে সবাই; তা ছোট রায় মশায়ের বাড়ীতে—

ছোট রায় মশায়ই আজকাল ওদের কর্ত্তা। উনি সব দেখাশুনো করছেন যে।

বার বার ঘাড় নাড়িয়া ঠিকাদার বলিল, বটে, আজ্ঞে বটে! তা

দেখলাম কাল, এইখানেই চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর ছোট্‌কা আর রায় মশায়ের ছেলে ব'সে ছিল অ্যানেকক্ষণ; খুব ভাব দেখলাম দুজনায়। অ্যানেক কথা হ'ল দুজনায়।

হুঁ। অচিন্ত্যবাবু খুব গম্ভীর হইয়া বলিলেন, হুঁ; আচ্ছা, কি কথা দুজনার হচ্ছিল বল তো? স্বদেশীর কথা? মানে, সায়েবদের তাড়াতে হবে, বন্দে মাতরম্‌, মহাত্মা গান্ধীকি জয়, এই সব কথা হচ্ছিল?

আজ্ঞে না। আমি তো দূরে ব'সে ছিলাম। খুব খানিক কান বাজিয়ে শুনলাম; কাল কথা হচ্ছিল আজ্ঞে, আমি আঁচে বুঝলাম, কথা হচ্ছিল আপনার, আচ্ছা, উমা কার নাম বলেন তো? এই ছোট রায়ের ঝিউড়ী মেয়ে লয়?

হ্যাঁ হ্যাঁ! আমি তাকে পড়াতাম যে। বলিতে বলিতেই অচিন্ত্যবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিলেন, মেয়েটাকে কলকাতায় পাঠিয়ে ধিঙ্গী ক'রে তুললে। ছোট রায় বাইরে বাঘ, আর ভেতরে একেবারে শেয়াল—বুঝলে কিনা, গিন্নীর কাছে একেবারে কেঁচো। মেয়েকে যে ভয় করে, তাকে আমি ঘেন্না করি, বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তা, কাল আপনার ছোট রায়ের ছেলে ওই চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর ছোট্‌কাকে ধরেছিল, বলে, তোমাকে তাকে বিয়ে করতে হবে।

বল কি?—অচিন্ত্যবাবু একেবারে তীরের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। উপলব্ধি করার ভঙ্গিতে বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ঠিক কথা। ইন্দ্র রায়ের মতলব এতদিন ঠাওর করতে পারছিলাম না। হুঁ। অহীন্দ্র ছেলেটি যে হীরের টুকরো ছেলে। এবারেও তোমার ফোর্থ হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। বটে! ঠিক শুনেছ তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বয়েসও যে অ্যানেকটা হ'ল। মানুষ হা করলেই বুঝতে পারি, কি বলবে। তা ছাড়া আপনার, রায় মশায়ের মেয়ের

বিয়েরও তো অ্যানেক হাঙ্গামা আছে গো। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বউ আর রায় মশায়ের বুন। কুলের খুঁত ধরতে তো লোকে রায় মশায়েরই ধরবে।

ওরে বাপ রে, বাপ রে! এই দেখ, কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। তুমি তো ভয়ানক বুদ্ধিমান লোক। দেখ, তুমি ব্যবসা কর, তোমার নিশ্চয় উন্নতি হবে। আমার কাছে যাবে তুমি, তোমাকে আমি সঙ্গে নেব। ব'লো না যেন কাউকে, এই খসখসের ব্যবসা। খসখস বোঝ তো? খসখস হ'ল বেনার মূল।

বেনার মূল?

হ্যাঁ। চুপ কর, সেজ রায়-বাড়ীর হরিশ আসছে।

হরিশ রায় সেজ-রায়-বাড়ীর একজন অংশীদার। সমগ্র রায়-বংশের সিকি অংশের অধিকারী হইল সেজ তরফ, সেজ তরফের এক আনা অংশের অর্থাৎ ষোল আনা সম্পত্তির এক পয়সা রকমের মালিক হইলেন হরিশ রায়। এই এক পয়সা পরিমাণ জমিদারির অংশ লইয়া ভদ্রলোক অহরহই ব্যস্ত এবং কাজ লইয়া তাঁহার মাথা তুলিবারও অবসর থাকে না। কাগজের পর কাগজ তিনি তৈয়ারী করিয়া চলিয়াছেন। জমিদারীর এককণা জমি যদি কেহ আত্মসাতের চেষ্টা করে, তবে তাঁহার আয়নার মত কাগজে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবেই।

কানে পৈতা জড়াইয়া গাড়ু হাতে হরিশ রায় একটি দাঁতন-কাঠি চিবাইতে চিবাইতে নদীর ঘাটে আসিয়া নামিলেন। অচিন্ত্যবাবুকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কি রকম, আজ যে এদিকে?

উদাসভাবে অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, এলাম।

না, মানে, এদিকে তো দেখি না বড়।

হ্যাঁ! বলিয়াই হঠাৎ যেন তিনি আসিবার কারণটা আবিষ্কার

করিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন, চরের ওপর কল বসছে কিনা, চিনির কল—সুগার মিল। তাই ভাবলাম, দেখে আসি ব্যাপারটা কি রকম হবে।

কল ? চিনির কল ?—হরিশ রায়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। চিনির কল করবে কে মশায় ? এত টাকা কার আছে ?

কাল রাত্রে কলকাতা থেকে মস্ত এক মহাজন এসেছে, সঙ্গে আপনার একটি বস্তা টাকা। আমি নিজের চোখে দেখেছি—ওন আইজ। ইন্দ্র রায় মশায়ের ওখানে কাল আমার নেমন্তন্ন ছিল কিনা।

ইন্দ্র ? তা, ইন্দ্র চর বন্দোবস্ত করছে নাকি ?

হ্যাঁ। উনিই তো এখন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর সব দেখা-শুনো করছেন।—তিনি ভুরু নাচাইয়া মুচকি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, হুঁঃ, কোন খোঁজই রাখেন না আপনারা ?

হরিশ রায় বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এই দেখুন, এমন খোঁজ নাই যা হরিশ রায়ের কাগজে নাই। বুঝলেন, নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর আমল থেকে 'থাক', নক্সা, জমাবন্দী, জরিপী খতিয়ান, জমা-ওয়াশীল-বাকি সব আমার কাছে। কি বলব, পয়সা তেমন নাই হাতে, তা নইলে 'চাকচান্দী' লাগিয়ে দিতাম আমি। আর অন্যায় অধর্ম্মও করতে চাই না আমি ! যদি একটি কলম আমি খুচি, সব ত্রাহি ডাক ছাড়বে। দেখি না, হোক না বন্দোবস্ত। আমরা এতদিন চুপ ক'রেই ছিলাম, বলি—চক্রবর্ত্তীরা আমাদেরই দৌহিত্র, তা খাচ্ছে খাক। কিন্তু এ তো হবে না মশায়। উঁহু।

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, সে আপনারা যা করবেন করুন গে মশায়। চর তো আজই বন্দোবস্ত হচ্ছে।

হাসিয়া হরিশ বলিলেন, দেখুন না, বেবাক কাগজ আজ বার

করছি। একবারে কড়া-ক্রান্তি, মায় ধূল পর্য্যন্ত মিলিয়ে দেখিয়ে দেব চর কার।

অচিন্ত্যবাবুর এত সব শুনিতে ভাল লাগিতেছিল না। তাঁহার মন তখন ভীষণ উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। উঃ ভিতরে ভিতরে ইন্দ্র রায় কন্যাদায়ের ব্যবস্থা করিয়া বসিয়া আছে! হরিশ রায়কে এড়াইয়া চলিয়া যাইবার জন্য হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া ঠিকাদারকে বলিলেন, তা হ'লে, তুমি কখন যাবে বল তো—সন্ধ্যেবেলা, কেমন ?

হরিশ জলের কুলকুচা ফেলিতে ফেলিতে আপন মনেই বলিলেন, কি আর বলব ইন্দ্রকে। লজ্জার ঘাটে আর মুখ ধোয়া নাই। ছি ছি ছি! এতবড় কাণ্ডটার পরেও আবার রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তির দেখাশোনা করছে! ছি!

অচিন্ত্যবাবু যাইতে যাইতে ফিরিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, সেই তো বলছিলাম মশায়, কি খবর আর রাখেন আপনি? মাটির খবর নিয়েই মেতে আছেন আপনি, মানুষের মনের খবর কিছু রাখেন? ইন্দ্র রায় পাকা ছেলে। লজ্জার ঘাটে মুখ ধূয়ে ব'সে থাকলে ইন্দ্র রায়ের কন্যাদায় উদ্ধার হবে? বলতে পারেন? রায় ওই রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ছোট ছেলের সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে।

বলেন কি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই আমি বলি। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীকে ইন্দ্র রায় বাঁধছে। রূপে গুণে এমন পাত্র পাবে কোথায় মশায় ?

আরে মশায়, ওদের আর আছে কি ?

নাই, তাই মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে রায় নগর বসাচ্ছেন চরে।

হুঁ। কিন্তু রামেশ্বরের যে কুষ্ঠ হয়েছে শোনা যায়।

আজ্ঞে না। সে সব ওঁরা রক্ত পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছেন।

ওটা হ'ল রামেশ্বরবাবুর পাগলামি। আচ্ছা, চলি আমি। অচিন্ত্যবাবু কথা কয়টা বলিয়া খুশি হইয়া উঠিলেন!

দাঁড়ান দাঁড়ান, আমিও যাব। দন্ত-মার্জ্জনা অর্দ্ধসমাপ্তভাবেই শেষ করিয়া হরিশ রায় উঠিয়া পড়িলেন। অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গ ধরিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, দেখুন না, আমি কি করি! তামাম কাগজ আমি এখুনি গিয়ে বের ক'রে ফেলব। সব শরিককে ডাকব। সকলে মিলে বলব, ইন্দ্রকেও বলব, মহাজনকে বলব। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেব। শোনে ভাল, না শোনে কালই সদরে গিয়ে দেব এক নম্বর ঠুকে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌জাংশান। করুক না, কি ক'রে কল করবে। কল বসাবে, নগর বসাবে!

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, কল বসলে সর্ব্বনাশ হবে মশায়। রাজ্যের লোক এসে জুটবে—কুলী কামিন গুণ্ডা বদমায়েস, চুরি-ডাকাতি রোগ, সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে মশায়। তা ছাড়া সমস্ত জিনিষ হয়ে যাবে অগ্নিমূল্য, গেরস্ত লোকেরই হবে বিপদ। তার চেয়ে অন্য উপায়ে উন্নতি কর না নিজের। কত ব্যবসা রয়েছে। এই ধরুন গাছগাছড়া চালান দাও, খস খস—। অচিন্ত্যবাবু সহসা চুপ করিয়া গেলেন।

হরিশ রায় তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, আসুন আপনি, আপনাকেই দেখাব আমি কাগজ। আপনি ইন্দ্রর বন্ধুলোক, কই, আপনিই বলুন তো ন্যায্য কথা। আয়নার মত কাগজ, এক নজরে বুঝতে পারবেন। ইন্দ্র না হয় বড়লোক, আমাদের না হয় পয়সা নাই। তাই ব'লে এই অধর্ম্ম করতে হবে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিশ রায়ের বাড়ীতে রায়-বংশের প্রায় সকল শরিকই আসিয়া জুটিয়া গেল। আস্ফালন ও কটূক্তিতে প্রসন্ন প্রভাত কদর্য্য তিক্ত হইয়া উঠিল। সঙ্গতিহীন এক নাবালক পক্ষের অভিভাবিকা নাগিনীর মতই বিষোদ্গার করিয়া কেবলই অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে

আরম্ভ করিল, ধ্বংস হবে। ভোগ করতে পাবে না। অনাথা ছেলেকে আমার যে ফাঁকি দেবে, তার মেয়ে বাসরে বিধবা হবে। নির্ব্বংশ হবে। এই আমি ব'লে রাখলাম। রাঙা বর! রাঙা বর! রাঙা বর! বাসরে মরবে।

*　　　*　　　*

ইন্দ্র রায় ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। রায়-গোষ্ঠী দল বাঁধিয়া আসিয়া অধঃপতিত আভিজাত্যের স্বভাব-ধর্ম্ম অনুযায়ী যে কদর্য্য দম্ভ ও কুটিল মনোবৃত্তির পরিচয় দিল, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিশেষ করিয়া রায়বংশের গঞ্জিকাসেবী এক শরিক—শূলপাণি যখন ক্রোধে আত্মহারা হইয়া কদর্য্য ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়িয়া বলিল, অ্যাঁঃ, বাবু আমার 'লগর' বসাবেন মেয়ে-জামায়ের লেগে! আর আমরা সব ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দেখবো, না কি?

ইন্দ্র রায় বলিলেন, শূলপাণি শূলপাণি, কি বলছ তুমি?

রায়ের মুখের কাছে দুই হাত নাড়িয়া শূলপাণি বলিল, আহা-হা, ন্যাকা আমার রে, ন্যাকা! বলি, আমরা কিছু বুঝি না, না কি? রামেশ্বরের বেটার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবার কথা আমরা বুঝি না বুঝি?

ইন্দ্র রায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল, পায়ের তলায় পৃথিবী বুঝি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সভয়ে তিনি চোখ বুজিলেন, তাঁহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল—গত সন্ধ্যায় উপাসনার সময়ে মনশ্চক্ষে দেখা দৃশ্য।—চক্রবর্ত্তী-বাড়ী ও রায়-বাড়ীর জীবন-পথের সংযোগ-স্থলে ভাঙনের অতল অন্ধকূপ।

শূলপাণি কদর্য্য ভাষায় আপন মনে বকিতেছিল; অন্যান্য রায়েরা আপনাদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করিতেছিল; হরিশ রায় বেশ বুঝাইয়া বলিবার ভঙ্গিতে বলিলেন, বেশ তো পাঁচজনে একসঙ্গে

মজলিশ ক'রে ব'সে; আমি ফেলে দিই তামাম কাগজপত্র একটি একটি ক'রে একেবারে রুদ্রাক্ষের মালার মত গাঁথা! দেখ, বিচার ক'রে দেখ, যদি সকলের হয় সকলে নেবে। চক্রবর্ত্তীদের একার হয়, একাই নেবে চক্রবর্ত্তীরা। একা তোমার হয় তুমি নাও, তারপর তুমি দান কর মেয়ে-জামাইকে, নিজে রাখ, যা হয় কর। তখন বলতে আসি কান দুটো ধ'রে ম'লে দিও।

ইন্দ্র রায়ের কানে ইহার একটা কথাও প্রবেশ করিল না। ধীরে ধীরে তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া এতক্ষণে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তারা তারা মা! তারপর তিনি ডাকিলেন, গোবিন্দ! ওরে গোবিন্দ!

গোবিন্দ রায়ের চাকর। চাকরের সাড়া না পাইয়া তিনি ডাকিলেন, ঘরের মধ্যে কে রয়েছে?

ঘরের মধ্যে ছিল অমল ও অহীন্দ্র। অহীন্দ্র বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্তম্ভিতের মত বসিয়া ছিল। আর অমল হাসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল, বলিতেছিল, কুরুকুল চীৎকার করছে পাণ্ডব-যাদবদের মিতালি দেখে। মাই গড।

পিতার স্বর শুনিয়া সে হাসি থামাইয়া বাহিরে আসিতেই রায় বলিলেন, গোবিন্দ কোথায়? এদের তামাক দিতে বল তো।

শূলপাণি বলিল, তামাক আমরা ঢের খেয়েছি, তামাক খেতে আমরা আসি নি। আগে আমাদের কথার জবাব চাই।

কথার জবাব? সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধে রায়ের মাথা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বিপুল ধৈর্য্যের সহিত আত্মসম্বরণ করিয়া কিছুক্ষণ পর বলিলেন, জবাব আমি এখনই দিতে পারলাম না। ও-বেলায় দু-একজন আসবেন, তখন জবাব দেব আমি।

শূলপাণি আবার লাফ দিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু হরিশ তাহাকে

থামাইয়া দিয়া বলিলেন, থাম শূলপাণি। ইন্দ্র হ'ল এখন আমাদের রায়গুষ্ঠীর প্রধান লোক, তার সঙ্গে এমন ক'রে কথা কইতে নেই। আমি বলছি।

শূলপাণি সঙ্গে সঙ্গে হরিশের উপরেই ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, যা যা যাঃ, তোষামুদে কোথাকার। তোষামুদি করতে হয়, তুই করগে যা। আমি করব না। আচ্ছা আচ্ছা, কে যায় চরের ওপর দেখা যাবে।—বলিয়া সে হনহন করিয়া কাছারির বারান্দা হইতে নামিয়া চলিয়া গেল।

হরিশ বলিলেন, তা হ'লে মামলা-মকদ্দমাই স্থির ইন্দ্র?

ইন্দ্র রায় বলিলেন, আপনারা আগে আগে গেলে আমাকে রামেশ্বরের হয়ে পেছন পেছন যেতে হবে বৈকি।

হরিশ বলিলেন, তুমি ঠকবে ইন্দ্র, আমার কাছে এমন কাগজ আছে —একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র।

ইন্দ্র রায় হাসিলেন; কোন উত্তর দিলেন না। আবার একবার আস্ফালন করিয়া রায়েরা চলিয়া গেল। শূলপাণি কিন্তু তখনও চলিয়া যায় নাই, সে ইন্দ্র রায়ের দারোয়ানের নিকট হইতে খইনি লইয়া খাইতেছিল।

রায় আজ অসময়ে অন্দরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, হেম, আমার আহ্নিকের জায়গা কর তো।

অন্দর হইতে হেমাঙ্গিনী সমস্ত শুনিতেছিলেন, তিনিও আজ দিগ্‌-ভ্রান্তের মত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। উমা—তাঁহার বড় আদরের উমা। অহীন্দ্রও সোনার অহীন্দ্র। কিন্তু এ তো কোনদিন তিনি কল্পনা করেন নাই।

স্নান-আহ্নিক শেষে রায় আহারে বসিলেন, হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ওদের কথায় তুমি কান দিও না। কুৎসা করা ওদের স্বভাব।

রায় মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, আমি বিচলিত হই নি হেম।

*　　　*　　　*

সন্ধ্যায় তিনি বিমলবাবুকে লইয়া বসিলেন। বাধা-বিঘ্নের সম্ভাবনার কথা সমস্তই বলিয়া রায় বলিলেন, বাধা-বিঘ্ন হবে—এ আমি বিশ্বাস করি না। ওদের আমি জানি। তবে সমস্ত কথা আপনাকে আমার বলা দরকার, তাই বললাম। আপনি কাগজপত্র দেখুন, দেখলে সত্যিকার আইনের দিকটাও দেখতে পাবেন।

বিমলবাবু কাগজপত্রগুলি গভীর মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেন, তারপর বলিলেন, আমার দিক থেকে কোন আপত্তি নেই, আজই দলিল হয়ে যাক।

টাকাকড়ির কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া তিনি অমলকে পাঠাইলেন সুনীতির নিকট। সুনীতির অনুমোদন লওয়া আবশ্যক। কিছুক্ষণ পর অমল ও অহীন্দ্র বলিল, মা বললেন, আপনি যা করবেন, তাই তাঁর শিরোধার্য্য। তবে একটা কথা তিনি বলছেন—

রায় বলিলেন, কি, বল ?

নবীন বাগ্দীর স্ত্রী তাঁর কাছে এসেছিল। অন্য বাগ্দীরাও এসেছিল সঙ্গে। তারা আমাদের পুরানো চাকর। তারা কিছু জমি চায়।

রায় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, ভাল, তাদের জন্যে পঁচিশ বিঘে জমি রেখেই বন্দোবস্ত হবে। কিন্তু চরটা তা হ'লে মাপ করা দরকার। আজ দলিলের খসড়া হয়ে থাক, কাল মাপ ক'রে দলিল লেখা হবে, কি বলেন, বিমলবাবু ?

বিমলবাবু বলিলেন, তাই হবে।

তা হ'লে আমি সন্ধ্যা সেরে আসি। রায় উঠিলেন, কিন্তু যাওয়া হইল না। বারান্দার বাহির হইতে দেখিলেন, যোগেশ মজুমদার বাগানের রাস্তা ধরিয়া কাছারির দিকে আসিতেছে। আজ মজুমদারের

সঙ্গে একজন চাপরাসী। মজুমদার এখন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর বিক্রীত সম্পত্তির মালিক, রায়েদের শরিক জমিদার। ইন্দ্র রায় ঈষৎ হাসিলেন, হাসিয়া সম্ভাষণ করিলেন, এস এস, মজুমদার এস। কি ব্যাপার? হঠাৎ?

স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের হাসি হাসিয়া মজুমদার বলিল, এলাম আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে।

রায় বলিলেন, শ্রী এখন বিগত হয়েছে মজুমদার, এখন শুধু চরণই অবশিষ্ট। সুতরাং কথাটা তোমার বিনয় ব'লেই ধ'রে নিলাম। এখন আসল কথাটা কি, বল তো? সংক্ষিপ্ত হ'লে এখনই বলতে পার; সময়ের দরকার হ'লে একটু অপেক্ষা করতে হবে। আমার সন্ধ্যার সময় চ'লে যাচ্ছে।

মজুমদার বলিল, কথা অল্পই। মানে আপনি তো জানেন, চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর সেই ঋণটা সেটা বেনামীতে আমারই দেওয়া। নিলামে সম্পত্তি ডাকলাম, এখনও বাকি অনেক। আজ শুনছি চরটাও বন্দোবস্ত হয়ে যাচ্ছে। তা আমার কি ব্যবস্থা হবে?

রায় অদ্ভুত হাসি হাসিয়া মজুমদারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কথাটার উত্তর কি আমারই কাছে শুনবে মজুমদার? চক্রবর্ত্তী-বাড়ী তো তোমার অচেনা নয়।

কথাটার সুরের মধ্যে সূচের মত তীক্ষ্ণতা ছিল, মজুমদার সে তীক্ষ্ণতার আঘাতে একেবারে হিংস্র হইয়া উঠিল, বলিল, আপনিই যে এখন ও-বাড়ীর মালিক রায় মশায়। চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধী, আবার হবু বেয়াই—

রায় গম্ভীরভাবে নিশ্বাস টানিয়া অজগরের মত ফুলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, হ্যাঁ, রামেশ্বরের সম্বন্ধী আমি বটে, আর বেয়াই হবার কথাটাও ভাবছি। এখন উত্তরটা আমার শোন, চাকরের কাছে ধার,

জানি সে আমার টাকা চুরি ক'রেই আমাকে ধার ব'লে দিয়েছে, কিন্তু সে যখন ধার ব'লেই নিয়েছি, তখন আমার ভগ্নীপতি, কি আমার হবু বেয়াই, কখনও 'দেবে না' বলবেন না।

মজুমদার মুহূর্ত্তে এতটুকু হইয়া গেল। রায় বলিলেন, কাল সকালে এস তোমার হ্যাণ্ডনোট নিয়ে। তারপর কণ্ঠস্বর মৃদু ও মিষ্ট করিয়া বলিলেন, ব'স, তামাক খাও। গোবিন্দ! মজুমদার মশায়কে তামাক দাও।

তিনি অন্দরে চলিয়া গেলেন; চলিতে চলিতেই গম্ভীর স্বরে তিনি ডাকিলেন, তারা, তারা মা!

২৩

মাস ছয়েক পর।

শীত-জর্জ্জর শেষ-হেমন্তের প্রভাতটি কুয়াশা ও ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চরটার কিছুই দেখা যায় না। শেষরাত্রি হইতেই গাঢ় কুয়াশা নামিয়াছে। তাহার উপর লক্ষ লক্ষ ইঁট পুড়িতেছে, সেই সব ভাঁটার ধোঁয়া ঘন বায়ুস্তরের চাপে অবনমিত হইয়া সাদা কুয়াশার মধ্যে কালো কুণ্ডলী পাকাইয়া নিথর হইয়া ভাসিতেছে। বিপুলবিস্তার দুধে-ধোয়া পাতলা একখানি চাদরের উপর কে যেন খানিকটা কালি ফেলিয়া দিয়াছে! হিমশীতল কুয়াশার কণাগুলি মানুষের মুখে, চোখের পাতায়, চুলের উপর আসিয়া লাগিতেছে, তাহার সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম বালির মত কয়লার কুচি। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধে ভিজা বাতাস আরও যেন ভারী বোধ হইতেছে।

ইহার মধ্যেই বিমলবাবু, কলিকাতার কলওয়ালা মহাজন, চরের উপর একটি বাংলো তৈয়ারি করিয়া বাসা গাড়িয়া বসিয়াছেন। কল তৈয়ারি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাজ খুব দ্রুতবেগে চলিতেছে।

এখানকার লোকে কাজের গতি দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া পড়িয়াছে। এমন দ্রুতগতিতে যে কাজ হইতে পারে—এ ধারণাই তাহারা করিতে পারে না; এ যেন বিশ্বকর্ম্মার কাণ্ড, এক রাত্রে প্রান্তরের উপর প্রকাণ্ড নগর গড়িয়া উঠার মত ব্যাপার।

বিমলবাবু বাংলোর বারান্দায় একখানা ঈজি-চেয়ারের উপর বসিয়া চা পান করিতেছিলেন এবং কুয়াশার দিকে চাহিয়া ছিলেন। কুয়াশার মধ্যে কোথা হইতে বাষ্পের জোরে বাজানো বয়লারের বাঁশী ভোঁ-ভোঁ শব্দে বাজিয়া উঠিল। একটি ভার্টিকাল বয়লারও ইহার মধ্যেই বসানো হইয়াছে; বয়লারের জোরে নদীর গর্ভে একটা পাম্প চলিতেছে। সেই পাম্পে ইঁট তৈয়ারির কাজে প্রয়োজনমত জল সরবরাহ হইতেছে। জলের পাইপ বিমলবাবুর বাংলোয় চলিয়া আসিয়াছে এবং প্রয়োজনমত এখানে ওখানে কলের মুখ লাগাইয়া যখন যেখানে ইচ্ছা জল লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাংলোর সম্মুখেই একটা পাকা ইঁদারাও হইয়া গিয়াছে। ইঁদারাটার চারিপাশে বাগানে নানা রকমের মরসুমী ফুল ও তরিতরকারির গাছ। বারান্দার ধারেই একটা জলের কলের মুখ, সেখানে একটি প্রশস্ত সান-বাঁধানো চাতাল ও একটি চৌবাচ্চা। সেই চাতালে বসিয়া সারী, সাঁওতালদের সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি, বাসন মাজিতেছে। বিমলবাবুর বাসায় সারী এখন ঝিয়ের কাজ করে। কুয়াশা এত ঘন যে, বিমলবাবু সারীকেও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। সাদা কাপড় পরিহিত সারীকে দেখিয়া মনে হয়, কুয়াশার একটা পুঞ্জ যেন ওখানে জমিয়া আছে। এই কুয়াশার মধ্যে কোথায়ও শূন্যমার্গে অবিরাম কর্ণিকের ও ইঁটের ঠুংঠুং শব্দ উঠিতেছে। আর উঠিতেছে লোহার উপর লোহার প্রচণ্ড আঘাতের শব্দ, চারিদিকের মুক্ত প্রান্তর বাহিয়া শব্দটা শনশন শব্দে ছুটিয়া চলিয়া দিগন্তে বিপুল শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা ধীরে ধীরে কাটিতেছিল। কয়লার ধোঁয়া মাটির বুক হইতে শূন্যমণ্ডলে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। বিমলবাবু সারীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন, সারীর মাথায় মরসুমী ফুলের সারি, ইহারই মধ্যে সে কখন ফুল তুলিয়া চুলে পরিয়াছে। বিমলবাবু রাগের ছলনা করিয়া বলিলেন, আবার তুই ফুল তুলেছিস।

সারী শঙ্কিত মুখে বিমলবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সারীর মত উচ্ছল চঞ্চল বর্ব্বররাও বিমলবাবুকে ভয় করে, অজগরের মুখের অদূরবর্ত্তী জীবের মত যেন অসাড় হইয়া যায়। এই চর ব্যাপিয়া বিপুল এবং অতিকায় কর্ম্মসমাবেশের সমগ্রটাই যেন বিমলবাবুর কায়ার মত, মানুষের দেহ লইয়া তিনি যেন তাঁহার জীবাত্মা। তাঁহার সম্পদ, কর্ম্মক্ষমতা, গাম্ভীর্য্য, তৎপরতা, সব লইয়া বিমলবাবুর একটা ভয়াল রূপ তাহারা মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করে এবং ভয়ে স্তব্ধ হইয়া যায়।

সারীর ভয় দেখিয়া বিমলবাবু একটু হাসিলেন, তারপর পাশের টিপয়ের উপরে ফুলদানি হইতে এক গোছা মরসুমী ফুল লইয়া সারীকে ছুড়িয়া মারিলেন, বলিলেন, এই নে।

সারী ফুলের গোছাটি কুড়াইয়া লইয়া শঙ্কার সহিতই একটু হাসিল, তারপর বলিল, সেই কাপড় তুমি কিনে দিবি না?

দেব, দেব।

কোবে দিবি গো?

আচ্ছা, আজই দেব। তুই এখন ভেতরে গিয়ে সব পরিষ্কার ক'রে ফেল্, ওই সরকারবাবু আসছে।

কুয়াশা এখন প্রায় কাটিয়া আসিয়াছে; বাংলোর মুখ হইতে সোজা একটা পাকা প্রশস্ত রাস্তা কারখানার দিকে সোজা চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া আসিতেছিল শূলপাণি রায়, রায়-বংশের সেই গঞ্জিকাসেবী উগ্রমেজাজী লোকটি। শূলপাণির সঙ্গে জন দুইয়েক

চাপরাসী ; শূলপাণি আস্ফালন করিতেছিল প্রচুর। শূলপাণিই বিমলবাবুর সরকার। তাহার উগ্র মেজাজ ও বিক্রম দেখিয়া তিনি তাহাকে 'লেবার-সুপারভাইজার'—বাংলা মতে কুলী-সরকার নিযুক্ত করিয়াছেন। শূলপাণি কুলীদের হাজরি রাখে, তাহাদের খাটায়, শাসন করে ; মাসিক বেতন বারো টাকা।

শুধু শূলপাণিই নয়, রায়হাটের অনেকেই এখানে চাকরি পাইয়াছেন। ইন্দ্র রায় বিমলবাবুর কৌশল দেখিয়া হাসিয়াছিলেন, মুগ্ধ হইয়া হাসিয়াছিলেন! মামলা-মকদ্দমার সমস্ত সম্ভাবনা চাকরির খাঁচায় বন্ধ করিয়া ফেলিলেন এই বিচক্ষণ ব্যবসায়ীটি। মজুমদার এখন বিমলবাবুর ম্যানেজার, অচিন্ত্যবাবু অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, হরিশ রায় গোমস্তা। আরও কয়জন রায়বংশীয় এখানে কাজ পাইয়াছে। ইন্দ্র রায়ের নায়েব মিত্তিরের ছেলে হয়েও এখানে কাজ করিতেছিল, ইন্দ্র রায় নিজেই তাহার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি বিমলবাবু দুঃখের সহিত তাহাকে নোটিশ দিয়াছেন, কাজ তাহার সন্তোষজনক হইতেছে না।

শূলপাণি চীৎকার করিতে করিতেই আসিতেছিল, হারামজাদা বেটারা সব শূয়ারকি বাচ্ছা—

বিমলবাবুর কপালে বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন আস্তে। তারা তো এখানে কেউ নেই।

শূলপাণি অর্দ্ধদমিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে না। ওই বেটা সাঁওতালরা—

হ্যাঁ, বেটারা হারামজাদাই বটে। কিন্তু হয়েছে কি ; ব্যাপারটা কি, আস্তে আস্তে বল!

শূলপাণি এবার সম্পূর্ণ দমিয়া গিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল, আজ্ঞে, আজ কেউ আসে নি।

আসে নি ?

আজ্ঞে না।

হুঁ। বিমলবাবুর ভ্রূযুগল ও কপাল আবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

শূলপাণি উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল হুকুম দেন, গলায় গামছা দিয়ে ধ'রে আনুক সব।

বিমলবাবু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিলেন, রায় সাহেব, এটা তোমার পৈতৃক জমিদারী নয়, এটা হ'ল ব্যবসা। এতে গলায় গামছা চলবে না। না এসেছে, নেই। কাজ আজ বন্ধ থাক। বিকেলবেলা সবাইকে ডাকবে এখানে—আমার কাছে। একবার শ্রীবাস দোকানীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে, জরুরী দরকার। আর হ্যাঁ, কাল রাত্রে লোহাগুলো সব এসে পৌঁছছে ?

আজ্ঞে না। এখনও দু বার লরি যাবে, তবে শেষ হবে। লরি তো জোরে যেতে পারছে না। ইষ্টিশানের রাস্তায় ধূলো হয়েছে একহাঁটু আর মাঝে মাঝে এমন গর্ত্ত—

মেরামত করাও নিজেদের লোক দিয়ে, জলদি মেরামত ক'রে নাও। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মুখ চেয়ে থাকলে চলবে না। তাদের সেই বছরে একবার মেরামত, তাও হরির লুটের মত মাটি কাঁকর ছিটিয়ে দিয়ে। লরি যখন স্টেশনে যাবে, তখন ইঁটের কুচি বোঝাই দিয়ে দাও। যেখানে যেখানে গচকা পড়েছে ঢেলে দিক সেখানে। তারপর কয়েক লরি কাঁকর দিয়ে মেরামত করাও। বুঝলে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আচ্ছা, যাও তুমি এখন।

শূলপাণি একটি নমস্কার করিয়া শান্তশিষ্ট ব্যক্তির মতই চলিয়া গেল। তাহার মত গঞ্জিকাসেবীর আজন্ম-অভ্যস্ত উগ্র মেজাজের কড়া তারও কেমন করিয়া বিমলবাবুর সম্মুখে শিথিল মৃদু হইয়া যায়। আসে

সে আস্ফালন করিতে করিতে, কিন্তু যায় যেন দম-দেওয়া যান্ত্রিক পুতুল-মানুষের মত।

বিমলবাবু ডাকিলেন, সারী!

সারী আসিয়া নীরবে চকিত দৃষ্টি তুলিয়া দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ আলোকে দেখা যায়, সারীর নিটোল স্বাস্থ্যভরা দীর্ঘ দেহখানি আর সে তৈলাক্ত অতি মসৃণতায় প্রসাধিত নয়, রুক্ষ প্রসাধনের একটি ধূসর দীপ্তি সর্ব্বাঙ্গে সুপরিস্ফুট। পরনে তাহার সাঁওতালী মোটা শাড়ি নাই, একখানা ফুলপাড় মিলের শাড়ি সে পরিয়া আছে। বর্ব্বর আদিম জাতির দেহে অপরিচ্ছন্নতার একটা আরণ্য কটু গন্ধ থাকে, কিন্তু সারী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলেও সে গন্ধ আর পাওয়া গেল না।

বিমলবাবু বলিলেন, আবার সব তোদের পাড়ার লোক গোলমাল করছে নাকি?

সারী শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিল, আমি সি জানি না গো। উয়ারা তো বললে না আমাকে!

তবে সব খাটতে এল না যে?

সারীর মুখে এবার সঙ্কুচিত একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল, আশ্বস্ত কণ্ঠে সে বলিল, কাল আমাদের জমিদারবাবু, উই যি রাঙাবাবু, উয়ার শ্বশুর হবে যি, ওই রায়বাবু, সিপাই পাঠালে যি। বুললে, জমিগুলা চষতে হবে কলাই বুনবে, সরষা বুনবে, আলু লাগাবে, আর ধানগুলা কাটতে হবে।

বিমলবাবুর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, আপন মনেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, ড্রোন্‌স অব্ দি কানট্রি! ইডিয়ট্‌স! দিজ জামিণ্ডার্‌স।

সারী শঙ্কিত হইয়া উঠিল, তাহার কালো মুখে সাদা চোখ দুইটিতে শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিল, রাত্রির আকাশের চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়ার মত। বিমলবাবু কি বলিলেন, সে যে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না! তবু ভাল যে সম্মুখে এখন 'হাঁড়িয়া'র বোতলটা নাই।

বিমলবাবু বলিলেন, সকলে তো চাষ করে না, তারা এল না কেন?

উয়াদিগকে ধান কাটতে লাগালে। সারীর কণ্ঠস্বর ভীত শিশুর মত।

ধান কাটতে লাগালে? পয়সা দেবে, না, দেবে না?

না, বেগার লিলে। উয়ারা যে জমিদার বটে, রাজা বটে।

হুঁ। বিমলবাবু গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর উঠিয়া মোটা চেস্টার্‌ফিল্ড কোটটা গায়ে দিয়া বলিলেন, ছড়িটা নিয়ে আয়।

সারী তাড়াতাড়ি ছড়িটা আনিয়া বিমলবাবুর হাতে দিল, বিমলবাবু এবার প্রসন্ন হাসি হাসিয়া সারীর কপালে আঙুলের একটি টোকা দিয়া ক্ষিপ্রপদে রাস্তার উপর নামিয়া পড়িলেন।

কুয়াশা কাটিয়া এখন রৌদ্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। চরখানাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়িল আকাশলোকের দিকে উদ্ধত ভঙ্গিমায় উদ্যত একটা অর্দ্ধসমাপ্ত ইঁটের গড়া চিমনি। সেইখানে কর্ণিকের ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে। ও-দিকে আরও একখানা সুসমাপ্ত বাংলো। ওটা আপিস-ঘর। পাশে একটা লোহার-ফ্রেমে গড়া আচ্ছাদনহীন শেড।

এতক্ষণে সারীর মুখখানি ঈষৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল; বিমলবাবু খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলে সে স্বচ্ছন্দ সহজ হইয়া গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার জলসিক্ত অঙ্কুরের মত জাগিয়া উঠিল। কাজ করিতে করিতে সে এবার গুন গুন করিয়া গান আরম্ভ করিল, নিজেদের ভাষায় গান।—

"উঃ বাবা গো, এই জঙ্গলের ভিতর কি আঁধার আর কত গাছ! এখানে সাপও চলিতে পারে না। এই জঙ্গলের পরেই নাকি 'রামচারের,' সেই সূর্য্যঠাকুরের শোবার ঘর পর্য্যন্ত লম্বা ডাঙা, সেখানে বসতি নাই, পাখী নাই। তুমি আমাকে এখানে ফেলিয়া যাইও না, ওগো ভাল-বাসার লোক!"

সারী এখন বিমলবাবুর বাংলোয় কাজ করে, এইখানেই সে বাসও করিতেছে। কয়টা মাসের মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে অনেক।

বিমলবাবু এখানে আসার কিছু দিনের মধ্যেই সারী অনুভব করিল, অজগরের সম্মুখস্থ শিকারের সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হইয়া যায়, সেও যেন তেমনি অবশ হইয়া পড়িতেছে। চীৎকার করিয়া আপন জনকে ডাকিয়া সাহায্য চাহিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাহার হইল না। সম্পদ, গাম্ভীর্য্য, কর্ম্মক্ষমতা, প্রভুত্ববিস্তারের শক্তি, তৎপরতা প্রভৃতি বিচিত্র ছাপে বিচিত্র সুদীর্ঘকায় অজগরের মতই ভয়াল বিমলবাবু! অজগরের মুখের মধ্যে সারী অচেতন পশুর মত ধরা পড়িল। তাঁহার কঠিন দৃষ্টির সম্মুখে কাহারও প্রতিবাদ করিবার সাহসও হইল না। আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়া গেল, সাঁওতাল-পল্লীর সকলেই এক দিক হইয়া সর্দ্দার কমল মাঝি ও সারীর স্বামীকে একঘরে করিল ; অথচ তাহারাই রহিল বিমলবাবুর একান্ত অনুগত। কিছুদিনের মধ্যে সারীই নিজে পঞ্চজনের কাছে 'সামকচারী'র অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদের প্রার্থনা করিল। সামাজিক আইনমত তাহারই জরিমানা দিবার নিয়ম ; চাহিবার পূর্ব্বেই সে একশত টাকা 'পঞ্চে'র সম্মুখে নামাইয়া দিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই একদিন সকালে দেখা গেল, বুড়া কমল মাঝি, তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী এবং সারীর স্বামী রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

সাঁওতাল-পাড়ার সর্দ্দার এখন চূড়া মাঝি, সেই কাঠের পুতুলের ওস্তাদ। সর্দ্দার মাঝির জমি শ্রীবাস পাল দখল করিয়া লইল, তাহার নাকি বন্ধকী দলিল আছে।

সারী এখন বিমলবাবুর বাংলোয় কাজ করে, বাংলোর সীমানার মধ্যেই আউট-হাউসে থাকে। বেশভূষার প্রাচুর্য্য দেখিয়া সারীর সখীরা বিস্মিত হইয়া যায়।

এক-একদিন দেখা যায় গভীর রাত্রে সারী ভয়ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইতেছে, তাহার পিছনে ছুটিয়াছেন বিমলবাবু, হাতে একটা হাণ্টার।

গান গাহিতে গাহিতে সারী কাজ করিতেছিল ; ঘরের দেওয়ালের গায়ে টাঙানো প্রকাণ্ড আয়নার কাছে আসিয়া সে কাজ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল, চুলটা একবার ঠিক করিয়া লইল, একবার হাসিল, তারপর দেহখানি দোলাইয়া হিল্লোল তুলিয়া সে নাচিতে আরম্ভ করিল। "জঙ্গলের ভিতর আঁধার আর কি ঘন গাছ!...আমাকে ফেলিয়া যাইও না, ওগো ভালবাসার লোক!"

* * *

বাংলোর সম্মুখ দিয়া পথটা সোজা চলিয়া গিয়াছে ; সুগঠিত পথ, ইঁটের কুচি ও লাল কাঁকর দিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সরল রেখার মত সোজা, তেমনি প্রশস্ত, অন্তত তিনখানা গাড়ী পাশাপাশি চলিতে পারে। কুয়াশায় অল্প ভিজিয়া রাঙা পথখানির রক্তাভা আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলো হইতে খানিকটা আসিয়াই পথের দুই পাশে আরম্ভ হইল সারি সারি খড়ের তৈয়ারি কুঁড়েঘর। অনেক বিদেশী কুলী আনিতে হইয়াছে ; বাক্স-কর্মায় ইঁটপাড়া, ইঁটের ভাটি দেওয়া, কলের লোহা-লক্কড়ের কাজ এদেশের অনভিজ্ঞ অপটু মজুর দিয়া হয় না। ওই কুলীদেরই সাময়িক আশ্রয় হিসাবে ঘরগুলি তৈয়ারি হইয়াছে। ও পাশে ইহার মধ্যেই কুলীদের স্থায়ী বাসস্থান প্রায় তৈয়ারি হইয়া আসিল, পাকা ইঁটের লম্বা একটা ব্যারাক, ছোট ছোট খুপরি-ঘর, সামনে এক এক টুকরা বারান্দা।

কুলীদের কুটীরগুলি এখন জনবিরল, বয়লারের ভোঁ বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই প্রায় কাজে চলিয়া গিয়াছে, থাকিবার মধ্যে

কয়েকটি প্রায়-অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আর উলঙ্গ অর্দ্ধ-উলঙ্গ ছেলের পাল। বৃদ্ধ মাত্র কয়েকজন, তাহারা উপু হইয়া ঘোলাটে চোখে অলস অর্থহীন স্তিমিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছে। বৃদ্ধা কয়েকজন জটলা পাকাইয়া রৌদ্রের আশায় বসিয়া পরস্পরের অপরিচ্ছন্ন মাথা হইতে উকুন বাছিয়া নখের উপর রাখিয়া নখ দিয়া টিপিয়া মারিতেছে, আর মুখে করিতেছে, হুঁ। 'ওই' 'হুঁ' না করিলে নাকি উকুনের স্বর্গলাভ হয় না। মধ্যে মধ্যে দুর্দান্ত চীৎকার করিয়া ছেলের দলকে গাল দিয়া ধমকাইতেছে—

আরে বদমাসে হারামজাদে, তেরি কুচ না করে হাম—

ই, হারামজাদী বুঢ্‌ঢী, তেরি দাঁত তোড় দেঙ্গে হাম।—বলিয়া ছেলের দল দাঁত বাহির করিয়া ভেংচাইয়া দিতেছে। একটা বুড়ী একটি ক্রন্দমানা শিশুকন্যাকে আদর করিতেছে—

"এ আমার বেটী রাণী, সাতপরানী, বেটা লাঙাড়, পুতা কানি,—বেটী আমার ভাগ্‌মানী!—এ—এ—এ।" অর্থাৎ ও আমার রাণী মেয়ে, সংসারে তাহার সাতটি প্রাণী, তাহার মধ্যে পুত্রটি খোঁড়া, পৌত্রটি কানা; আহা, আমার বেটী বড় ভাগ্যবতী!

বিমলবাবু তাহার আদরের ছড়া শুনিয়া হাসিলেন। বৃদ্ধা মেয়েটিকে বলিল, আরে আরে চুপ হো যাও বেটীয়া, মালেক যাতা হ্যায়, মালেক। আরে বাপ রে!

বয়স্ক ছেলেগুলি বিমলবাবুকে দেখিয়া শান্ত হইয়া দাঁড়াইল, ছোটগুলি হাত তুলিয়া সেলাম করিয়া বলিল, সেলাম মালেক।

বিমলবাবু ছোট্ট একটি টুকরা হাসি হাসিয়া কেবল ঘাড় নাড়িলেন। কয়টা অল্পবয়স্ক শিশু পরম আনন্দভরে এ উহার মাথায় পথের ধূলা ঢালিয়াই চলিয়াছে। একটা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশু বিচিত্র খেয়ালে পথের ধূলার উপরে শুইয়া ধপধপ করিয়া ধূলার উপর পিঠ আছড়াইয়া

ধূলার রাশি উড়াইয়া আপন মনে হাসিতেছিল। ধূলার জন্য বিরক্ত হইয়া হাতের ছড়িটা দিয়া বিমলবাবু তাহাকে একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন, এই!

ছেলেটা তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিয়া বলিল, সেলাম মালেক।

হাসিয়া বিমলবাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন। বিমলবাবু পিছন ফিরিতেই ছেলেটা জিভ কাটিয়া দাঁত বাহির করিয়া কদর্য্য ভঙ্গিতে তাঁহাকে ভেংচাইয়া উঠিল, তারপর আবার লাফ দিয়া পথের ধূলায় পড়িয়া ধূলার উপর পিঠ ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল আলবৎ করেঙ্গে, আলবৎ করেঙ্গে, ইঁ—ইঁ—ই—।—বলিয়া আবার একবার ভেংচাইয়া উঠিল।

কুলী-বস্তি পার হইয়াই কারখানার পত্তন আরম্ভ হইয়াছে।

এ-দিকের চরটাকে আর সে-চর বলিয়া চেনাই যায় না। সে বেনাঘাসের জঙ্গল আর নাই, চরের এ-দিকটা একেবারে খুঁড়িয়া ফেলিয়া আবার সমান করিয়া ফেলা হইয়াছে, লালচে পলিমাটি এখন তকতক করিতেছে, মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে দূর্ব্বা ও মথো ঘাসের পাতলা আস্তরণ টুকরা টুকরা সবুজ ছাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারই মধ্যে মধ্যে বড় বড় চতুর্ভুজ ছকিয়া লাল কাঁকরের অনেকগুলি রাস্তা এ-দিক ওদিক চলিয়া গিয়াছে। বড় রাস্তাটা এখানে আসিয়া সুদীর্ঘ দেবদারুগাছের মত যেন চারিদিকে সোজা সোজা শাখা-প্রশাখা মেলিয়াছে।

এমনি একটা চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের উপর প্রকাণ্ড বড় টিনের শেডটা তৈয়ার হইতেছে। মোটা মোটা লোহার কড়ি ও বরগায় ছাঁদিয়া বাঁধিয়া কঙ্কালটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শেডের চালের উপর কুলীরা কাজ করিতেছে। লোহার উপর প্রকাণ্ড হাতুড়ির ঘা দিতেছে,

সেই উপরে দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে লোহার উপর প্রকাণ্ড হাতুড়ির আঘাতের প্রচণ্ড শব্দ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া দুই-তিন দিক হইতে প্রতিধ্বনিতে আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

একটা লরি হইতে লোহার কড়ি-বরগা নামানো হইতেছিল। স্টেশন হইতে লোহালক্কড় এই লরিতেই আসিতেছে। লোহার একটা স্তূপ হইয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রপাতিও অনেক আসিয়া গিয়াছে, নানা আকারের যন্ত্রাদি পৃথক পৃথক করিয়া রাখা হইতেছে। এক পাশে পড়িয়া আছে দুইটা বিপুলকায় ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লার—নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের মত। এই সব লোহালক্কড় ও যন্ত্রপাতিগুলিকে মুক্ত রোদ-বাতাসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্যই ওই টিনের শেডটা তৈয়ারি হইতেছে। একেবারে মধ্যস্থলে একটা বৃহৎ চতুষ্কোণ জমির উপর কলের বনিয়াদ খোঁড়া হইয়াছে। ঠিক তাহারই মধ্যস্থলে চিমনিটা উঠিতেছে। একেবারে ও-পাশে লাল ইঁটের লম্বা কুলী-ব্যারাক। ব্যারাকটার ছাদ পিটিতে পিটিতে এ দেশেরই কামিনেরা পিটনে কোপার আঘাতে তাল রাখিয়া একসঙ্গে গান গাহিতেছে।

বিমলবাবু একের পর একটি করিয়া কাজের তদারক করিয়া ফিরিলেন। ফিরিবার পথে বাংলোয় না আসিয়া ও-দিকে শ্রীবাসের দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীবাসের ছেলে গণেশকে আর সে-গণেশ বলিয়া চেনা যায় না। চৌকা ঘর-কাটা রঙিন লুঙ্গি পরিয়া, ঘাড় একেবারে কামাইয়া চৌদ্দআনা দুই-আনা ফ্যাশানে চুল ছাঁটিয়া, গায়ে একটা পুল-ওভার চড়াইয়া গণেশ একেবারে ভোল পাল্টাইয়া ফেলিয়াছে। দোকানেরও আর সে চেহারা নাই। পাকা মেঝে, পাকা বারান্দা, দোকানে হরেক রকমের জিনিস। লোহার তারের বাণ্ডিল। পেরেক, গজাল, গরুর গাড়ীর চাকার হালের জন্য লোহার পাটি, লোহার শলি, গরুর গলার দড়ির পরিবর্ত্তে লোহার

শিকল, জানলায় দিবার জন্য লোহার শিক, মোট কথা লোহার কারবারই বেশি। অদূরে একটা গাছের তলায় একজন পশ্চিম-দেশীয় মুসলমান একটা গরুকে দড়ি বাঁধিয়া ফেলিয়া পায়ে নাল বাঁধিয়া ঠুকিতেছে। কয়েকজন গাড়োয়ান তাহাদের গরুগুলি লইয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাস্তার ধারে এক-একটা ইঁট পাতিয়া কয়েকজন পশ্চিম-দেশীয় নাপিত চুল ছাঁটিতে বসিয়াছে। গণেশ বেচিতেছিল লোহার তার, কিনিতেছে একটি সাঁওতাল মেয়ে। গণেশ বলিতেছে, আরে বাপু, আলনা করবার জন্যে যে নিবি, তা, ক' হাত চাই সে-মাপ এনেছিস?

মেয়েটি বুঝিতে পারিতেছে না, বলিতেছে, মাপ কি বুলছিস গো?

কি বিপদ! ছোট হ'লে তখন করবি কি? এসে তখন আবার কাঁউমাউ করবি যে।

হঁ। কি কাঁউমাউ করলম গো?

কি বিপদ! কাপড় টাঙাবার জন্যে আলনা করবি ত?

হঁ।

ঠিক এই সময়েই বিমলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন। গণেশ ব্যস্ত হইয়া তার ফেলিয়া আসিয়া নমস্কার করিল, বলিল, হুজুর! তাড়াতাড়ি সে একখানা লোহার চেয়ার আনিয়া পাতিয়া দিল; বিমলবাবু বসিলেন না, চেয়ারখানার উপর একটা পা তুলিয়া দিলেন, বলিলেন, শ্রীবাস কোথায়?

আজ্ঞে, বাবা এখনও আসেন নি। কাল ও-পারে বাড়ী—

হঁ। তুমিই শোন তা হ'লে। মাঝি বেটারা আবার গোলমাল করতে আরম্ভ করেছে। ভেতরের ব্যাপারটা একটু খোঁজ নাও দেখি। শুনছি, ইন্দ্র রায় নাকি সব বেগার ধরেছেন। আসল কথাটা আমাকে জানিয়ে আসবে।

বিমলবাবু ফিরিলেন।

আপিসে বসিয়া বিমলবাবু ডাকিলেন, যোগেশবাবু!

যোগেশ মজুমদার আসিয়া দাঁড়াইল, বিমলবাবু বলিলেন, শ্রীবাসের হ্যাণ্ডনোটটা—আপনার দরুন যেটা, সেটার বোধ হয় তিন বছর পূর্ণ হয়ে এল, না?

যোগেশ মজুমদার ফৌজদারী মামলার সময় শ্রীবাসকে ঋণ দিয়াছিল, তাহার দরুণ হ্যাণ্ডনোটটা বিমলবাবু কিনিয়াছেন।

মজুমদার বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আর তমাদির সময় হয়ে এল। তা ছাড়া আপনার নিজেরও দুখানা হ্যাণ্ডনোট—

সে থাক। এখন এইটের জন্যেই একটা উকিলের নোটিশ দিয়ে দিন।

বিমলবাবু নিজেও শ্রীবাসকে ঋণ দিয়াছেন দুইবার। মজুমদার বলিল, ওকে ডেকে—

বাধা দিয়া বিমলবাবু বলিলেন, না। ঠিক প্রণালীমত কাজ ক'রে যান। এর পর যা কথা হবে, সে উকিলের মারফতেই হবে। উকিল আমাদের সর্ত্তটা জানিয়ে দেবেন, চরের এক শ বিঘে জমিটা ন্যায্য মূল্যেই আমি পেতে চাই।

মজুমদার বলিল, যে আজ্ঞে।

বিমলবাবু বলিলেন আর এক কথা। একবার ইন্দ্র রায়ের কাছে আপনি যান। তাঁকে বলুন যে, আমার শরীর খারাপ ব'লেই আমি আসতে পারলাম না। কিন্তু তিনি যে জমিদার-স্বরূপে সাঁওতালদের বেগার ধরেছেন, এতে আমার আপত্তি আছে। ওরা আমাদের দাদন খেয়ে রেখেছে। আমার দাদন-দেওয়া কুলী বেগার ধরলে আমার কাজের ক্ষতি হয়। বুঝলেন? সে আমি সহ্য করব না। আচ্ছা, তা হ'লে আপনি যান ওঁর কাছে।

মজুমদার চলিয়া গেল। বিমলবাবু কাগজ-কলম লইয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই একজন চাপরাসী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, বলিল, এসেছে।

মুখ না তুলিয়াই বিমলবাবু বলিলেন, নিয়ে আয়।

আসিয়া প্রবেশ করিল যে ব্যক্তি, সে এখানকার নূতন মদের দোকানের ভেণ্ডার। লোকটি একটি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বিমলবাবু চাপরাসীটাকে বলিলেন, যা তুই এখান থেকে।

চাপরাসীটা চলিয়া গেল। বিমলবাবু বলিলেন, দেখ, আমার জন্যেই তোমার এ দোকান।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ে কৃতজ্ঞতায় শতমুখ হইয়া বলিয়া উঠিল, দেখেন দেখি, দেখেন দেখি, হুজুরই আমার মা-বাপ—

হ্যাঁ। বাধা দিয়া বিমলবাবু বলিলেন, হ্যাঁ। একটি কাজ তোমাকে করতে হচ্ছে। সাঁওতালদের মাথায় একটা কথা তোমাকে ঢুকিয়ে দিতে হবে—কৌশলে। বুঝেছ? দরজাটা ভেজিয়ে দাও। জমিদার বেগার ধরলে ওরা যেন না যায়।

২৪

মজুমদার এই দৌত্য লইয়া ইন্দ্র রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইবার কল্পনায় চঞ্চল হইয়া পড়িল। ইন্দ্র রায়ের দাম্ভিকতা-ভরা দৃষ্টি, হাসি, কথা সুতীক্ষ্ণ শায়কের মত আসিয়া তাহার মর্ম্মস্থল যেন বিদ্ধ করে। আর তাহার নিজের বাক্যবাণগুলি যতই শান দিয়া শাণিত করিয়া সে নিক্ষেপ করুক, নিক্ষেপ-শক্তির অভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে নতশির হইয়া রায়ের সম্মুখে যেন প্রণত হইয়াই লুটাইয়া পড়ে। তবে এবার পৃষ্ঠদেশে আছেন সক্ষম রথী বিমলবাবু; বিমলবাবুর আজিকার এই বাক্য-শায়কটি

শুধু সুতীক্ষ্ণই নয়, শক্তির বেগে তাহার গতি অকম্পিত এবং সোজা। মজুমদার একটি সভয় হিংস্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নানা কল্পনা করিতে করিতেই সে চর হইতে নদীর ঘাটে আসিয়া নামিল। চরের উপর নদীর মুখ পর্য্যন্ত রাস্তাটা এখন পাকা হইয়া গিয়াছে, কালীর বুকেও এখন গাড়ীর চাকায় চাকায় বেশ একটি চিহ্নিত রাস্তা রায়হাটের খেয়াঘাটে গিয়া উঠিয়াছে। ও-পার হইতে মজুর-শ্রেণীর পুরুষ ও মেয়েরা দল বাঁধিয়া চরের দিকে আসিতেছে। কলের ইমারতের কাজেই ইহারা এখন খাটে, আগের চেয়ে মজুরিও কিছু বাড়িয়াছে। কতকগুলি চাষী বেগুন-মুলা-শাকসব্জি বোঝাই ঝুড়ি-মাথায় চরের দিকেই আসিতেছে। এখন রায়হাটের চেয়ে জিনিসপত্র চরেই কাট্‌তি হয় বেশী, চরের মিস্ত্রী-মজুরেরা দরদস্তুর করে কম, কেনেও পরিমাণে বেশী। এ-পারে যাহারাই আসিতেছিল, তাহারা সকলেই মজুমদারকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইল, মজুমদার এখন কলের ম্যানেজার। রায়হাটের ঘাটে আসিয়া মজুমদার বিরক্ত হইয়া উঠিল, পথে এক হাঁটু ধূলা হইয়াছে। চারিপাশে দীর্ঘকালের প্রাচীন গাছের ঘন ছায়ার মধ্যে হিম যেন জমাট বাঁধিয়া আছে। পথের উপর মানুষ-জনও নাই। মজুমদার চরের ম্যানেজারির গৌরবের গোপন অহঙ্কার নির্জ্জনতার সুযোগে প্রকাশ করিয়া ফেলিল বেশ জোর গলাতেই, আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল মা-লক্ষ্মী যখন ছাড়েন, তখনই এই দশাই হয়। হুঁঃ, অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানেচ কৌরবাঃ।

পথের দুই পাশে প্রাচীন কালের নৌকার মত বাঁকানো চাল-কাঠামোযুক্ত কোঠাঘরগুলির দিকে চাহিয়া তাহার ঘৃণা হইল। বলিল, হুঁঃ, কি সব জঘন্য চাল-কাঠামো! সেকালের কি সবই ছিল কিম্ভূত-কিমাকার! যত জবড়জং—হাতীর শুঁড়, পরী, সিংহী—এই

দিয়ে আবার ব্যবহার করেছে। ঘর করবে বাংলো-চাল, সোজা একেবারে পাকা দালান-ঘরের মত।

মোট কথা, রায়হাটের সমস্ত কিছুকে ঘৃণা করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া ইন্দ্র রায়ের সম্মুখীন হইবার মত মনোবৃত্তিকে সে দৃঢ় করিয়া লইতেছিল।

নায়েব-সেরেস্তার সম্মুখে একখানা সেকেলে ভারী কাঠের চেয়ারে বসিয়া ইন্দ্র রায় জমিদারী কাজকর্ম্মের তদারক করিতেছিলেন। নায়েব মিত্তির তক্তাপোশের উপর একটি সেকেলে ডেস্কের উপর খাতা খুলিয়া দেখিয়া রায়ের প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল। তাহার পাশে মিত্তিরের ভাইপো কতকগুলি খাতা লইয়া বসিয়া আছে। এই লোকটিকে রায় চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। মনে গোপন ইচ্ছা, এইবার তিনি ধীরে ধীরে চক্রবর্ত্তীদের সংস্রব হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন।

মজুমদার ঘরে ঢুকিয়াই নমস্কারের ভঙ্গিতে প্রণাম করিয়া বলিল, একবার মুখুজ্জে সায়েব আপনার কাছে পাঠালেন।

বিমলবাবু এখানে মুখার্জি সাহেব নামেই খ্যাত হইয়াছেন, বাবু নামটা তিনি অপছন্দ করেন, বলেন, ওটা গালাগালি। চরে কুলী কামিন ও রায়হাটের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে তিনি মালিক, হুজুর। কর্ম্মচারী ও অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত সাধারণের নিকট তিনি মুখার্জি সাহেব।

ইন্দ্র রায়ের পাশে আরও খানতিনেক চেয়ার খালি পড়িয়া ছিল। মজুমদার তাহার কথার ভূমিকা শেষ করিয়া ওই চেয়ারগুলোর দিকেই দৃষ্টি ফিরাইল; ইন্দ্র রায় সাদরে সম্ভাষণ জানাইয়া মিত্তিরের তক্তাপোশের দিকে আঙুল দেখাইয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া বলিলেন, ব'স, ব'স।

মজুমদার একটু ইতস্তত করিয়া তক্তাপোশের উপরে বসিল।

রায় তাঁহার অভ্যস্ত মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, কি সংবাদ তোমার মুখার্জি সাহেবের, বল?

আজ্ঞে। মাথা চুলকাইয়া যোগেশ মজুমদার বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, আজ্ঞে, আমাকে যেন অপরাধী করবেন না—

ইন্দ্র রায়ের ঠোঁটের প্রান্তে যে হাসির রেখাটুকু ফুটিয়া উঠে, সেটা অভিজাতসুলভ অভ্যাস-করা একটা ভঙ্গিমাত্র, হাসি নয়; মজুমদারের বিনয়ের ভূমিকা দেখিয়া কিন্তু রায় একবার সত্য সত্যই একটু হাসিলেন। বুঝিলেন, অস্ত্রপ্রয়োগের পূর্ব্বে মজুমদারের এটি প্রণাম-বাণ প্রয়োগ। রায় হাসিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, দূত চিরকালই অবধ্য; তোমার ভয় নেই, নির্ভয়ে তুমি মুখার্জি সাহেবের বক্তব্য ব্যক্ত কর।

রায়ের কথার সুরে অর্থে মজুমদার তাঁহার শক্তি অনুমান করিয়া আরও সংহত এবং সংযত হইয়া উঠিল, আরও খানিকটা বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, তিনি নিজেই আসতেন। তা তাঁর শরীরটা—। মজুমদার ভাবিতেছিল, কোন্ অসুখের কথা বলিবে।

শরীরটায় আবার কি হ'ল তাঁর? প্রশ্ন করিয়াই রায় হাসিলেন, বলিলেন, চালুনিতে যে-কালে সরষে রাখা চলছে যোগেশ, সে-কালে শরীরে যা হোক একটা কিছু হওয়ার আর আশ্চর্য্য কি? তোমার শরীর কেমন?

লজ্জার সহিত মজুমদার বলিল, আজ্ঞে, আমি ভালই আছি।

রায় বাঁ হাতে গোঁফে তা দিতে সুরু করিয়া বলিলেন, ভাল কথা, শরীর তো সুস্থই আছে, এইবার সরল অন্তঃকরণে স্পষ্ট ভাষায় বল তো, মুখার্জি সাহেবের কথাটা কি? বাঁ হাতে গোঁফে তা দেওয়াটা রায়ের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের একটা বহিঃপ্রকাশ।

মজুমদার প্রাণপণে আপনাকে দৃঢ় করিয়া বলিল, বেশ গাম্ভীর্য্যের

সহিতই আরম্ভ করিল, কথাটা চরের সাঁওতালদের নিয়ে। মানে, উনি সাঁওতালদের সব দাদন দিয়ে রেখেছেন। শ্রীবাসের কাছে ধানের বাকি বাবদ কারও বিশ, কারও ত্রিশ, দু'একজনের চল্লিশ টাকাও ধার ছিল। শ্রীবাসের প্যাঁচালো বুদ্ধি তো জানেন, সে আবার ডেমিতে টিপছাপ নিয়ে বন্ধকী দলিল পর্য্যন্ত ক'রে নিয়েছিল। যোগেশ একটু থামিল।

রায়ের গোঁফে তা দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহার মুখ-চোখ ধীরে ধীরে চিন্তাভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল।

মজুমদার কোন সাড়া না পাইয়া বলিল, মুখার্জি সাহেব সেটা জানতে পেরেই শ্রীবাসকে ডেকে ধমক দিয়ে তার টাকা দিয়ে খতগুলি কিনে নিলেন। সাঁওতালদের বললেন, তোরা খেটে আমাকে শোধ দিবি। মজুরি থেকে দৈনিক এক আনা হিসেবে কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন তিনি।

রায় নীরবে চিন্তাভারাতুর দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী করিয়া চাহিয়া ছিলেন অদৃষ্ট-লোকের সন্ধানে, কিছু কি দেখা যায়? দেখা কিছু যায় না, কিন্তু অনুভব করিলেন যে, জীবন-পথ অতি উচ্চ পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়াছে, সঙ্কীর্ণ পথ, পাশ ফিরিয়া গতি পরিবর্ত্তনের উপায় নাই। গতি পরিবর্ত্তন করিতে গেলে, তাঁহারই হাত ধরিয়া যিনি চলিয়াছেন, পঙ্গু, রুগ্ন রামেশ্বর—তাঁহাকেই পাশের খাদে ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে। সে ফেলিতে গেলে তাঁহাকেও পড়িতে হইবে এ-পাশের অতল অন্ধকারে—অধোগতির তমোলোকে, কৃতঘ্নতার নরকে।

মজুমদার বলিয়াই গেল, এখন ধরুন, এই সব দাদনের কুলী যদি আপনি আটক করেন, তা হ'লে কি ক'রে চলে বলুন?

চিন্তাকুলতার মধ্যেও রায় কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তিনি এবার সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে মিত্তিরের ভাইপোর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার রাধারমণ?

রমণ বলিল, আজ্ঞে, আটক কেন করতে যাব! তবে এখন ধান কাটার সময়, মাঝিরা আমাদের খাসের জমির ধান কাটছিল না, তাই তাদের কাটতে হুকুম দেওয়া হয়েছে। তারপর ধরুন, অঘ্রাণের শেষ সপ্তাহ হয়ে গেল, এখনও রবি-ফসল বুনলে না ওরা, কেবল কলেই খেটে যাচ্ছে; সেইজন্যেই বলা হয়েছে যে, আগে এসব কর, তারপর তোমরা যা করবে কর গে।

মজুমদার প্রতিবাদ করিয়া একটু চড়া সুরে এবার বলিয়া উঠিল, যারা ভাগীদার নয়, তাদেরও আপনারা বেগার ধরেছেন খাসের জমির ধান কাটবার জন্যে।

রায় রমণের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, বেগারও ধরা হয়েছে বুঝি?

রমণ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মজুমদার বলিয়া উঠিল, ধরা হয়েছে এবং আপনার নাম দিয়ে ধরা হয়েছে। আপনার নাম না দিলে সাহেব আমাকে পাঠাতেন না, বেগার উঠিয়ে নিতেন। সাঁওতাল-পাড়ায় সকলেই বললে, আমাদের রাঙাবাবুর শ্বশুর, রায় হুজুর হুকুম দিলে, বেগার দিতে হবে। কথার সঙ্গে সঙ্গে একটি শ্লেষভরা হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তে রায়ের মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চোখ বুজিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পর একটা গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তারা, তারা মা! সে কণ্ঠস্বর ধীর এবং প্রশান্ত; সারা ঘরটা যেন থমথম করিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তেই রায় নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন। সজাগ হইয়া বাঁ হাতে আবার গোঁফে তা দিতে দিতে হাসিয়া বলিলেন, তারপর?

মজুমদার শঙ্কিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে?

হাসিয়াই রায় বলিলেন, এখন মুখার্জি সাহেবের বক্তব্যটা কি?

আজ্ঞে, বেগার নিতে গেলে আমাদের কি ক'রে চলে, বলুন? তা ছাড়া ভেবে দেখুন, বেগার প্রথাটাও হ'ল বে-আইনী।

ওঃ, আইন! আইনের কথাটা আমার স্মরণ ছিল না। তা আইনে কি বলছে শুনি?

মজুমদার কথাটার সম্যক্ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিতভাবেই বলিল, আজ্ঞে?

তোমার মুখার্জি সাহেবকে ব'লো, তিনি বুঝবেন, তুমি বুঝবে না। ব'লো, আমাদের জমিদারির সনন্দ বাদশাহী আমলের,—বেগার ধরার অভ্যেস আমাদের অনেক দিনের। কেউ ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায়? বেগার আমরা চিরকাল ধ'রে আসছি, ধরবও।

তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, দরকার হ'লে তোমার মুখার্জি সাহেবকেও বেগার দিতে হবে হে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হ'লে ওঁকেও আমরা কোন কাজে লাগিয়ে দেব। কাজ তো নানা ধারার আছে।

মজুমদার সুযোগ পাইয়া চট করিয়া বলিয়া উঠিল, কাজ তো হাতের কাছে, আপনি ইচ্ছা করলেই তো লেগে যায়। উমা-মায়ের সঙ্গে অহিনবাবুর বিয়েটা এইবার লাগিয়ে দিন।

রায় হাসিয়া এবার বলিলেন, ছেলেমেয়ে থাকলেই বিয়ের কল্পনা হয় মজুমদার, পাত্রপক্ষ-পাত্রীপক্ষ তো করেই নানা কল্পনা, আবার পাড়াপড়শীতেও পাঁচরকম ভাবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ভগবানের হাতে, ভগবানের দয়া যদি হয় তবে হবে বৈকি। সে হ'লে তুমি জানতে পারবে সকলের আগে। যিনিই অহীন্দ্রের শ্বশুর হোন, তাঁকে আশীর্ব্বাদের সময় তোমাকে একটা শিরোপা দিতেই হবে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর প্রাচীন কর্ম্মচারী তুমি, আপনার জন।

শব্দার্থে 'শিরোপা' 'প্রাচীন কর্ম্মচারী' শব্দগুলি ক্ষুরধার মজুমদারের মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ হইবার কথা। কিন্তু রায়ের কণ্ঠস্বরে সুরের গুণ ছিল আজ অন্যরূপ; আঘাত করিবার জন্য ব্যঙ্গ-শ্লেষের নিষ্ঠুর গুণ টানিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি ছিল না; অদৃষ্টবাদী মনের দৃষ্টি আপনার ইষ্টদেবীর চরণপ্রান্তে নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি কথা বলিতেছিলেন। মজুমদার আজ আহত হইল না, বরং সে সুরের কোমল স্পর্শে বিচলিত এবং লজ্জিত হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে এবার অকৃত্রিম সরলতার সহিতই বলিল, আজ্ঞে বাবু, এই চরের সাঁওতালদের ব্যাপারটা কি কোন রকমে আপস করা যায় না?

রায় বলিলেন, কার সঙ্গে আপস যোগেশ? বিমলবাবুর সঙ্গে? তিনি হাসিলেন।

মজুমদার বলিল, লোকটি বড় ভয়ানক বাবু। ধর্ম্ম-অধর্ম্ম কোন কিছু মানেন না। আর লোকটির কূটবুদ্ধিও অসাধারণ।

রায় আবার হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

মজুমদার বলিল, সর্দ্দার মাঝির নাতনী ওই সারী মাঝিনের ব্যাপারে আমরা তো ভেবেছিলাম, সাঁওতালরা একটা হাঙ্গামা বাধালে বুঝি। কিন্তু এমন খেলা খেললে মশায়, যে, কমল আর সারীর স্বামীই হ'ল দেশত্যাগী, আর সমস্ত সাঁওতাল হ'ল বিমলবাবুর পক্ষ। তারা কথাটি কইলে না। আর কি জঘন্য রুচি লোকটার!

রায় বলিলেন, এতে আর ভয় পাবার কি আছে? ও-খেলা আমাদের পুরানো হয়ে গেছে। আগেকার কালে কর্ত্তারা ও-দিকে ভয়ানক খেলা খেলে গেছেন। এ-খেলা ব্যবসায়ীর পক্ষে নতুন। মা-লক্ষ্মীর কপালই ওই, পেছনে পেছনে অলক্ষ্মী জুটবেই। বাণিজ্য-লক্ষ্মীর ঘরে সতীন ঢুকেছে অলক্ষ্মী। যাক গে, ও কথাটা বাদই দাও।

মজুমদার আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল; ঝগড়া-বিবাদটা না হ'লেই ভাল হ'ত বাবু।

ঝগড়া-বিবাদ? রায় গোঁফে তা দিয়া হাসিয়া বলিলেন, ঝগড়া-বিবাদ করতে তা হ'লে মুখার্জ্জি সাহেব বদ্ধপরিকর, কি বল?

হ্যাঁ, তা যে রকম মনে হ'ল, তাতে—। মজুমদার ইঙ্গিতে কথাটা শেষ করিয়া নীরব হইয়া গেল।

রায় বলিল, জান তো, আগেকার কালে যুদ্ধের আগে এক রাজা আর এক রাজার কাছে দূত পাঠাতেন; সোনার শেকল আর খোলা তলোয়ার নিয়ে আসত সে দূত। যেটা হোক একটা নিতে হ'ত। তা তোমার মুখার্জি সাহেবকে ব'লো, খোলা তলোয়ারখানাই নিলাম, শেকল নেওয়া আমাদের কুলধর্ম্মে নিষিদ্ধ, বুঝেছ?

কথা বলিতে বলিতে রায়ের চেহারার একটা আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল; ব্যঙ্গহাস্যে মুখ ভরিয়া উঠিয়াছে, গোঁফের দুই প্রান্ত পাক খাইয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টিই হইয়া উঠিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। উৎফুল্ল উগ্র সে দৃষ্টির সম্মুখে সব কিছু যেন তুচ্ছ। কপালে সারি সারি তিনটি বলীরেখা অবরুদ্ধ ক্রোধের বাঁধের মত জাগিয়া উঠিয়াছে।

মজুমদার আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, একটি প্রণাম করিয়া সে বিদায় হইল।

রায় বলিলেন, মিত্তির, একখানা নতুন ফৌজদারী আইনের বইয়ের জন্যে কলকাতায় লেখ দেখি, আমাদের অমলের মামাকেই লেখ, সে যেন দেখে ভাল বই যা, তা পাঠায়। আমাদের খানা পুরানো অনেক দিনের।

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যেই খানিকটা পায়চারি করিয়া বলিলেন, এক পা যদি বিরোধের দিকে এগোয়, সঙ্গে সঙ্গে কালীর

বুকে বাঁধ দিয়ে যে পাম্প বসিয়েছে মুখুজ্জে, সেটা বন্ধ ক'রে দাও। চর-বন্দোবস্তির সঙ্গে নদীর কিছু নেই।

দ্বিপ্রহরে উপরের ঘরে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্র রায় ডাকিলেন, হেমাঙ্গিনী!

স্বামীর এমন কণ্ঠস্বর হেমাঙ্গিনী অনেক দিন শুনেন নাই, দ্রুতপদে তিনি উপরে আসিয়া রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই বয়েসে এতকাল পরে আবার অসময়ে আরম্ভ করলে? ছিঃ!

অর্থাৎ মদ। হেমাঙ্গিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রতারিত হয় নাই। রায় চিন্তা করিতে করিতে দুই-এক পাত্র কারণ পান করিতেছেন। তাঁহার মুখ থমথমে রক্তাভ, সদ্য-ঘুমভাঙা ব্যক্তির মত।

রায় হাসিয়া বলিলেন, বড় চিন্তায় পড়েছি হেম। সামনে মনে হচ্ছে অগ্নিপরীক্ষা।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, মুখ দেখে তো তা মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন কোন সুখবর পেয়েছ।

না না হেম, চরের কলের মালিকের সঙ্গে দাঙ্গা বাধবে ব'লে মনে হচ্ছে। লোকটা আজ শাসিয়ে লোক পাঠিয়েছিল। তোমায় একবার সুনীতির কাছে যেতে হবে। ব্যাপারটা তাকে জানানো দরকার। বলবে, কোন ভয় নেই তার, পেছনে নয়, আমি এবার সামনে।

* * *

মজুমদার ভারাক্রান্ত মন লইয়াই সংবাদ দিতে চলিয়াছিল। নদীর ঘাটে আবার যখন সে নামিল, তখন ও-পারে বয়লারে বারোটার সিটি বাজিতেছে। কলরবে কোলাহলে চরটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। এ-পার হইতে চরটাকে বিচিত্র মনে হয়। কালিন্দীর কালো জলধারার কূলে সবুজ আস্তরণের মধ্যে রাঙা পথের ছক, নূতন ঘরবাড়ী, মানুষের চাঞ্চল্য কোলাহল, কুলীদের গান—অদ্ভুত! চরটা

যেন এক চঞ্চলা কিশোরীর মত কালিন্দীর জলদর্পণের দিকে চাহিয়া অহরহ প্রসাধনে মত্ত।

এ-পারে রায়হাট নিস্তব্ধ; সমস্ত গ্রামখানা প্রাচীন কালের গাছে গাছে আচ্ছন্ন গাছগুলির মাথায় রাশি রাশি ধূলা, কয়খানা প্রাচীন কালের দালানের বিবর্ণ জীর্ণ চিলে-কোঠা কেবল গাছের উপরে জাগিয়া আছে ধূলিধূসর জটার কুণ্ডলীর মত। ও-পারের চরটার তুলনায় মনে হয়, যেন কোন লোলচর্ম্মা পলিতকেশা জরতী ঘোলাটে চোখের স্তিমিত অর্থহীন দৃষ্টি মেলিয়া পরপারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে নিস্পন্দ নির্ব্বাক।

মজুমদার প্রত্যক্ষভাবে এমন করিয়া না বুঝিলেও ভারাক্রান্ত মনে ব্যথা পাইল। সে যখন গিয়াছিল, তখন ইন্দ্র রায় ও চক্রবর্ত্তীদের উপর ক্রোধবশত রায়হাটকেও ঘৃণা করিয়াছিল, কিন্তু ফিরিবার পথে ইন্দ্র রায়ের সহৃদয়তার উত্তাপে তাহার মন হইয়াছে অন্যরূপ, সে এবার রায়হাটের জন্য বেদনা অনুভব করিল। মাথা নীচু করিয়াই নদীর বালি ভাঙিয়া সে চলিতেছিল; সহসা চিলের মত তীক্ষ্ণ গলায় কে তাহাকে বলিল, কি রকম? কি হ'ল মশায়? কি বললে চামচিকে পাখী, আড়াই-হাজারী জমিদার?

মজুমদার মাথা তুলিল; সম্মুখে চর হইতে ফিরিতেছেন অচিন্ত্যবাবু, হরিশ রায়, শূলপাণি। প্রশ্নকর্ত্তা তীক্ষ্ণকণ্ঠ অচিন্ত্যবাবু। বিমলবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর হইতেই অচিন্ত্যবাবু ইন্দ্র রায়ের নামকরণ করিয়াছেন, চামচিকা পক্ষী, আড়াই-হাজারী জমিদার।

মজুমদার বলিল, ছিঃ অচিন্ত্যবাবু, রায় মশায় আমাদের এখানকার মানী লোক—

শূলপাণি আসিবার পূর্ব্বেই গাঁজা চড়াইয়াছিল, সে বাধা দিয়া হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, মানী লোক! কে হে? ইন্দ্র রায়? ম'রে

যাই আর কি! বলি, আমরাও তো জমিদার হে, আমরাই বা কি কম?

মজুমদার বলিল, দেখ শূলপাণি, যা-তা বাজে ব'কো না। তুমি মুখার্জি সাহেবের তাঁবেদার, আর রায় মশায় হলেন তোমার সাহেবের জমিদার।

অচিন্ত্যবাবু এককালে চাকুরিজীবী ছিলেন, মজুমদার তাঁহার অপেক্ষা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—এ-জ্ঞান তাঁহার টন্‌টনে, তিনি ধাঁ করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, কি বললেন রায় মশায়!

বলবেন আর কি! যা বলবার তাই বললেন। বললেন, 'বেগার ধরা আমাদের অনেক কালের অভ্যেস, ছাড়তে বললেই কি ছাড়া যায়?' তারপর অবিশ্যি হাসতে হাসতেই বললেন যে, 'এ তো সাঁওতাল, চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে ক্রিয়াকর্ম্ম হ'লে তোমাদের সাহেবকেও বেগার ধরব হে। কাজ তো অনেক রকম আছে।'

অচিন্ত্যবাবু পরম বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে গম্ভীরভাবে বলিলেন, লাগল তা হ'লে। এইবার কিন্তু রায় ঠকবেন। জমিদারী আর সাহেবী বুদ্ধিতে অনেক তফাত। মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে এইবার রায় অপমানিত হবেন।

মজুমদার বলিল, না না, ও-কথাটা ঠিক নয় হে।

মানে?

আজ যা বললেন, তাতে বুঝলাম, ও বিয়ের কথাটা ঠিক নয়, বললেন আমাকে, 'ও ছেলেমেয়ে থাকলেই কথা ওঠে যোগেশ, কিন্তু তা হ'লে কি তুমি জানতে পারতে না—চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পুরানো কর্ম্মচারী তুমি? তবে ভগবানের ইচ্ছে হয়, হবে।'

আপনার মাথা। অচিন্ত্যবাবু প্রচণ্ড অবজ্ঞাভরে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন আপনার মাথা। আমি নিজে জানি, কথা উঠেছিল। রায়ের

ছেলে অমল অহীন্দ্রকে পর্য্যন্ত ধরেছিল। এখন আসল ব্যাপার,. রামেশ্বরবাবু আর ও বাড়ীর মেয়ে ঘরে ঢোকাবেন না। এ যদি না হয়, আমার কান দুটো কেটে ফেলব আমি। ভগবানের ইচ্ছে হয়, হবে! শাক দিয়ে মাছ ঢাকা আর কি!—বলিয়া তিনি হেঁ-হেঁ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিলেন—বিজ্ঞতার হাসি।

হরিশ রায়ের চোখ দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ভ্রূ দুইটি ঘন ঘন নাচিতে আরম্ভ করিল, ঘাড়টি ঈষৎ দোলাইয়া বলিয়া উঠিলেন, অ্যাই ঠিক কথা। অচিন্ত্যবাবু ঠিক ধরেছেন।

শূলপাণি বার বার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ-হুঁ, সে বাবা কঠিন ছেলে, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী, আর কেউ নয়। তারপর হি-হি করিয়া হাসিয়া অদৃশ্য ইন্দ্র রায়কে সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গভরে বলিল, লাও বাবা, লাও, মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে চরের ওপর লগর বসাও!

কথাটা মজুমদারেরও মনে ধরিল। ইন্দ্র রায়ের সহৃদয়তায় যে সাময়িক কোমলতা তাহার মনে জাগিয়াছিল, কুয়াশার মত সেটা তখন মিলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

হরিশ রায় চুপিচুপি বলিলেন, এই দেখ আমাদের জ্ঞাতি হ'লে হবে কি, ছোট রায়-বাড়ীর ওই কেলেঙ্কারি, যাকে বলে বংশগত, তাই। আমাদের কাছে রায়-বংশের কুর্সীনামা আছে, দেখিয়ে দোব, প্রতি পুরুষে ওদের এই কেচ্ছা, বুঝেছ?

সেই দু'পহরের রৌদ্র মাথায় করিয়া নদীর বালির উপরেই তাহাদের মজলিস জমিয়া উঠিল। সকলেরই মনোভাণ্ডে পরিনিন্দার রস রৌদ্রতপ্ত তাড়ির মতই ফেনাইয়া গাঁজিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যা না হতেই কথাটা গ্রামময় রটিয়া গেল।

ছোট রায়-বাড়ীর কাছারি পর্য্যন্ত কথাটা আসিয়া পৌছিয়া গেল,

ইন্দ্র রায় কাছারিতে ছিলেন না, অন্দরে নিয়মিত সন্ধ্যা-তর্পণে বসিয়াছিলেন ; কথাটা প্রথম শুনিলেন রায়ের নায়েব মিত্তির। পথের উপরে দাঁড়াইয়া অতিমাত্রায় ইতরতার সহিত রায়-বংশের নিঃস্ব নাবালকটির সেই অভিভাবিকাটি উচ্চকণ্ঠে কথাটা ঘোষণা করিতেছিল। মিত্তিরের সর্ব্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরিয়া গেল, কিন্তু উপায় ছিল না, ঘোষণাকারিণী স্ত্রীলোক। রায়কে কথাটা শুনাইতেও তাহার সাহস হইল না। সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রায়ের সান্ধ্য-উপাসনা তখন অর্দ্ধসমাপ্ত, দ্বিতীয় পাত্র কারণ পান করিয়া জপে বসিয়াছেন। গদ্গদস্বরে ইষ্টদেবীকে বার বার ডাকিতেছেন, মা আমার রণরঙ্গিনী মা! ধনী মুখার্জির সহিত দ্বন্দ্বসম্ভাবনায় বহুকাল পরে গোপন উত্তেজনা-বশে আজ ওই রূপ ওই নামটিই তাঁহার কেবল মনে পড়িতেছে।

সহসা বাড়ীর উঠানে কাংস্যকণ্ঠে কে চীৎকার শুরু করিয়া দিল, হায় হায় গো! ম'রে যাই, ম'রে যাই! আহা গো! 'পিঁড়ি পেতে করলাম ঠাঁই, বাড়া ভাতে পড়ল ছাই।' দিলে তো চক্রবর্ত্তীরা নাকে ঝামা ঘ'ষে? হয়েছে তো? নাবালক শরিককে ফাঁকি দেওয়ার ফল ফলল তো? ঈর্ষাতুরা মেয়েটির পথে পথে চীৎকার করিয়াও তৃপ্তি হয় নাই, সে রায়ের অন্দরে আসিয়া হেমাঙ্গিনীর সম্মুখে হাত নাড়িয়া কথাগুলি শুনাইতেছে।

রায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই আপনাকে তিনি সংযত করিলেন, ধীর স্থির ভাবে ইষ্ট দেবীকে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলেন।

নীচে হেমাঙ্গিনীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া ভঙ্গি সহকারে নাবালকের অভিভাবিকাটি তখনও বলিতেছিল, তাই বলতে এলাম, বলি, একবার ব'লে আসি। আমার নাবালককে যে ফাঁকি দেবে,

ভগবান তাকে ফাঁকি দেবে। আঃ, হায় হায় গো! হায় হায়! সে যেন নাচিতে আরম্ভ করিল।

হেমাঙ্গিনী ব্যাপারটার আকস্মিকতায় এবং রূঢ়তায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, শঙ্কায় বিস্ময়ে কম্পিত মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন, কি বলছ তুমি ?

ইতর ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করিয়া বিধবাটি বলিল, আ ম'রে যাই! কিছু জানেন না কেউ! বলি, চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর রাঙা বড় জুটল না তো মেয়ের কপালে? দিয়েছে তো চক্রবর্ত্তীরা হাঁকিয়ে? বলি, কোন্ মুখে তোরা আবার গিয়েছিলি তাই শুনি? এই বাড়ীর মেয়ে নাকি আবার চক্রবর্ত্তীরা নেয়! বলে যে, সেই—'মিনসে নেয় না বসতে পাশে, মাগী বলে আমায় ভালবাসে' সেই বিত্তান্ত। আঃ, হায় হায় গো! ফসকে গেল এমন সুযোগ! অকস্মাৎ তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত রূঢ় হইয়া উঠিল, যা চর ঢুকিয়ে দিগে চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতে। মেয়ে-জামায়ের জন্যে লগর বসালেন! আঃ হায় হায়! হায় হায় গো! সে যেমন নাচিতে নাচিতে আসিয়াছিল, তেমনি নাচিতে নাচিতেই চলিয়া গেল।

চৈতন্যহারা হেমাঙ্গিনী মাটির পুতুলের মতই বসিয়া রহিলেন। উপর হইতে গভীর ধীর কণ্ঠের ধ্বনি ভাসিয়া আসিল, তারা, তারা মা। সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনির ঝঙ্কারে সুগভীর হইয়া বাজিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পর সিঁড়ির উপরে খড়মের শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা-উপাসনার পর বিশেষ প্রয়োজন না হইলে নীচে রায় নামেন না। আজ রায় নীচে নামিলেন, হেমাঙ্গিনী কিন্তু তবুও সচেতন হইয়া উঠিতে পারিলেন না। রায় নীচে নামিয়া ডাকিলেন, হেম! এ ডাক তাঁহার আদরের ডাক।

হেমাঙ্গিনী সাড়া দিতে পারিলেন না। রায় বলিলেন, উঠতে হবে।

যে হেম। উঠে একখানা ভাল কাপড় পর দেখি। আমার শালখানাও বের ক'রে দাও।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হেমাঙ্গিনী এবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রায় বলিলেন, একটু শিগগির কর হেম, মাহেন্দ্রযোগ খুব বেশিক্ষণ নেই।

হেমাঙ্গিনী এতক্ষণে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাবে?

হাসিয়া রায় বলিলেন, মা আমার আজ অনুমতি দিয়েছেন হেম। যাব রামেশ্বরের কাছে, উমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে। ভাল কাপড় পর একখানা, আমার শালখানাও দাও।

হেমাঙ্গিনীর মুখ এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সোনার উমা, সোনার অহীন্দ্র তাঁহার। গোপন মনে এ-কথা তাঁহার কত বার মনে হইয়াছে।

চাকর চলিয়াছিল আলো লইয়া, চাপরাসী ছিল পিছনে।

সুদীর্ঘ কাল পরে ইন্দ্র রায় চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া ডাকিলেন, কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, রামেশ্বর!

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনির মতই একটা ধ্বনি ভাসিয়া আসিল, কে? বিচিত্র সে কণ্ঠস্বর!

রায় উত্তর দিলেন, আমি ইন্দ্র।

২৫

বিশীর্ণ ম্লানদেহ, রক্তহীনের মত বিবর্ণ পাংশু, এক পলিতকেশ বৃদ্ধ বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া—দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। উত্তেজনার আতিশয্যে কঙ্কালসার বুকখানা হাপরের মত উঠিতেছে নামিতেছে। হেমাঙ্গিনী সুনীতিকে বলিলেন, ধর সুনীতি, হয়তো প'ড়ে যাবেন উনি।

ইন্দ্র রায় বিস্ময়ে বেদনায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—এই রামেশ্বর! কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, বিলাসী রামেশ্বর এমন

হইয়া গিয়াছে! সে রামেশ্বরের এতটুকু অবশেষও কি আর অবশিষ্ট নাই! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া রায় দেখিলেন, আছে, কঠোর বাস্তব একটি মাত্র পরিচয়-চিহ্ন অবশেষে রাখিয়াছে, চোখের পিঙ্গল তারা দুইটি এখনও তেমনি আছে। কয়েক মুহূর্ত্ত পর রায় দেখিলেন, না, তাও নাই; চোখের তারা তেমনি আছে, কিন্তু পিঙ্গল তারার সে দ্যুতি আর নাই। সুরহারা গানের মত অথবা রসহীন রূপের মতই সকরুণ তাহার অবস্থা।

ধীরে ধীরে রামেশ্বরের উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসিতেছিল। খাটের বাজু ধরিয়া দেহের কম্পন তিনি রোধ করিয়াছিলেন; কেবল ঠোঁটের সঙ্গে চিবুক পর্য্যন্ত অংশটি এখনও থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, পিঙ্গল চোখে জল টলমল করিতেছে। হেমাঙ্গিনী সুনীতিকে বলিলেন, একটু বাতাস কর তুমি।

ইন্দ্র রায়েরও চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন, কেমন আছ?

চোখে জল এবং কম্পিত অধর লইয়াই রামেশ্বর হাসিলেন; ইন্দ্র রায়ের কথার উত্তর দিতে গিয়ে অকস্মাৎ তাঁহার রঘুবংশের মহারাজ অজের শেষ অবস্থা মনে পড়িয়া গেল, সেই শ্লোকের একটা অংশ আবৃত্তি করিয়াই তিনি বলিলেন, 'প্লক্ষ প্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ।' ব্যাধি বটবৃক্ষের মত দেহ-মন্দিরে ফাট ধরিয়ে মাথা তুলেছে ইন্দ্র। এখন ভূমিসাৎ হবার অপেক্ষা।

রায়ের চোখের জল এবার আর বাধা মানিল না, টপটপ করিয়া মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িল, অশ্রু-আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, না না রামেশ্বর, ও-কথা ব'লো না তুমি, তোমাকে সুস্থ হতে হবে। আর তোমার হয়েছেই বা কি?

রামেশ্বর ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, দেখতে পাচ্ছ

না ?—বলিয়া হাত দুইখানি আলোর সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন।

রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আঙুলগুলির দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; প্রদীপের আলোকের আভায় শুভ্র, শীর্ণ, অকুণ্ঠিত-অবয়ব আঙুলগুলির ভিতরের রক্তধারা পর্যান্ত পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। রায় একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, না, তোমার কিছুই হয় নি, ও কেবল তোমার মনের ব্যাধি। মনকে তুমি শক্ত কর। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ ; তোমার ছেলের বিয়ে দাও, স্ত্রী পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে আনন্দ কর।

রামেশ্বর অকস্মাৎ যেন কেমন হইয়া গেলেন, অর্থহীন দৃষ্টিতে শূন্য-লোকের দিকে বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন, ঠোঁট দুইটি ঈষৎ নড়িতে লাগিল, আপন মনেই তিনি যেন কিছু বলিতেছিলেন।

রায় রামেশ্বরের এই অসুস্থ অবস্থা দেখেন নাই, তিনি প্রথম দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, শঙ্কিত হইয়াই তিনি ডাকিলেন, রামেশ্বর ! রামেশ্বর !

ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরাইয়া রামেশ্বর রায়ের দিকে চাহিলেন ; রায় বলিলেন, কি বলছ ?

বলছি ? ডাকছি, ভগবানকে ডাকছি, বলছি, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ'। এ অন্ধকারের মধ্যে আর থাকতে পারছি না।

হেমাঙ্গিনী এবার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিলেন ; ইন্দ্র রায় ও রামেশ্বরের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া অবস্থাটা ক্রমশ যেন অসহনীয় বায়ুলেশহীন অন্ধকার-লোকের দিকে চলিয়াছে। দীর্ঘকাল পরে দুই বন্ধু এবং পরম আত্মীয়ের দেখা হওয়ার ফলে উভয়েই আত্মসংযম হারাইয়া স্মৃতির বেদনার তীব্র আবর্ত্তের মধ্যে অসহায়ের মতই আবর্ত্তিত হইয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন। রামেশ্বরের পক্ষে এ অবস্থাটা

অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু উচ্ছ্বাসই কথাবার্ত্তাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, রায় কথাকে টানিয়া নিজের পথে চালিত করিতে পারিতেছেন না। এ ছাড়া, এই অবস্থাটাও আর সহ্য হইতেছে না। এই বেদনাদায়ক অবস্থাটিকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে একটু আনন্দ সঞ্চার করিবার জন্যই তিনি সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, আমি কিন্তু এবার রাগ করব চক্রবর্ত্তী মশায়, আপনি আমাকে এখনও একটি কথাও বলেন নি।

রামেশ্বর ঈষৎ চকিত হইয়া হেমাঙ্গিনীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষণ্ণতার মধ্য হইতেও আনন্দে একটু চঞ্চল এবং সজীব হইয়া উঠিলেন। হেমাঙ্গিনীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সীমা ছিল না। নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতার মধ্যে মৃদু বাতাসের আকস্মিক সঞ্চরণে সব যেন স্নিগ্ধ সানন্দ চাঞ্চল্যে সজীব হইয়া উঠে, হেমাঙ্গিনীর সস্নেহ সরস কৌতুকে সমস্ত ঘরখানাই তেমনি চঞ্চল সজীব হইয়া উঠিল। রামেশ্বর সত্য সত্যই এতক্ষণ হেমাঙ্গিনীকে লক্ষ্য করেন নাই। দীর্ঘকাল পরে ইন্দ্র রায় ছাড়া অন্য সকল কিছু—স্থান কাল পাত্র—তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। হেমাঙ্গিনীর কথায় রামেশ্বর তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখ তাঁহার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সস্নেহে সম্ভ্রমের সহিত মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন।

'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু কপ্তং নু তাবৎ ফলমেব পুণ্যৈঃ।'

এ আমার স্বপ্ন, না মায়া, না মনের ভ্রম, কিংবা কোন পুণ্যফলের ক্ষণিক সৌভাগ্য, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি এসেছেন?

হেমাঙ্গিনী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অকপট আনন্দে কৌতুক করিয়া বলিলেন, আমি কিন্তু স্বপ্নও নই, মায়াও নই, পুণ্যফলের সৌভাগ্য না কি বললেন, তাও নই। আমি আপনার কুটুম্বিনী। আপনি

পণ্ডিত লোক, কবি মানুষ, কবিতা দিয়ে আসল কথা চাপা দিলেন। কথা তো আমিই যেচে কইলাম, আপনি তো কথা বলেন নি।

রামেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে বুঝতে পারছি, জীবনে সাগরতুল্য অপরাধের মধ্যেও কোথাও ক্ষুদ্রতম প্রবালদ্বীপের মত কোন একটি পুণ্যফল অক্ষয় হয়ে আছে, যার ফলে দেবীকে নিজে এসে দর্শন দিতে হ'ল এবং ভক্তের সঙ্গে যেচেই কথা কইতে হ'ল। ওর জন্যে আপনি নিজেও আক্ষেপ করবেন না, আমার প্রতিও অনুযোগ করবেন না ; কারণ আপনি দেবধর্ম্ম পালন করেছেন, আমিও ভক্তের অভিমান বজায় রেখেছি।

রামেশ্বরের কথা শুনিয়া রায় আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু বেদনা অনুভব না করিয়া পারিলেন না। স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচায়ক উত্তর শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইল, কল্পনাই ব্যাধির সৃষ্টি, রামেশ্বরের এই আপনাকে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস—এ শুধু রাধারাণীর অভাব। রাধারাণীকে হারাইয়াই আজ রামেশ্বরের এই অবস্থা। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিতে গিয়া সেটাকে তিনি রুদ্ধ করিলেন। রামেশ্বরের পাশে বসিয়া অবনতমুখী সুনীতি ব্যথিত মুখেও হাসি মাখিয়া ধীরসঞ্চালনে পাখার বাতাস করিয়া চলিয়াছেন। সুনীতির দিকে চাহিয়া, তাঁহার কথা ভাবিয়া রায়ের বেদনার বাষ্প জমিয়া পাথর হইয়া গেল। দীর্ঘনিশ্বাস রোধ করিয়াও একটি অসম্বৃত মুহূর্ত্তে গম্ভীর স্বরে তিনি ডাকিয়া উঠিলেন, তারা, তারা মা !

ঘরখানা সে গম্ভীর স্বরের ডাকে মুহূর্ত্তে আবার গম্ভীর হইয়া উঠিল। রামেশ্বর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, হেমাঙ্গিনী স্তব্ধ হইয়া গেলেন, সুনীতি উদাস হইয়া সকলের দিকে কোমল করুণ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিলেন।

দেওয়ালে ব্র্যাকেটের উপর পুরানো আমলের মন্দিরের আকারের ক্লক-ঘড়িটার পেণ্ডুলামটা শুধু বাজিতেছিল—টক-টক, টক-টক।

* * *

ঘড়ির শব্দেই সহসা ইন্দ্র রায়ের খেয়াল হইল, মাহেন্দ্রযোগ পার হইয়া যাইতে আর বিলম্ব নাই। তিনি চঞ্চল হইয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন, গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইলেন, তারপর প্রাণপণে সকল দ্বিধাকে অতিক্রম করিয়া বলিলেন, রামেশ্বর!

চক্রবর্ত্তী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, উঠবে বলছ?

না, আমি তোমার কাছে আজ ভিক্ষে চাইতে এসেছি।

ভিক্ষে! রামেশ্বর চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, আমার কাছে?

সুনীতিও সচকিত হইয়া উঠিলেন, মাথার ঘোমটা বাড়াইয়া দিয়া বিস্মিতভাবে রায় ও হেমাঙ্গিনীর দিকে চাহিলেন। চোখে চোখ পড়িতেই হেমাঙ্গিনী হাসিলেন।

ইন্দ্র রায় বলিলেন, হ্যাঁ, তোমার কাছেই ভিক্ষে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ভিক্ষে বলতে হয় উনি বলুন, আমি বলছি ডাকাতি; না দিলে শুনব না, জোর ক'রে কেড়ে নেব।

রামেশ্বর প্রশান্ত গম্ভীর মুখে ধীরভাবে বলিলেন, রায়-গিন্নী ভাগ্যদেবতা যার বিমুখ হন, তার লক্ষ্মী ভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়েই বেরিয়ে যান, ভাণ্ডারের দরজা আমার খোলা, হা-হা করছে। আপনি সে ভাণ্ডারে কিছু নেবার অছিলায় প্রবেশ করলে বুঝব, লক্ষ্মী আবার ফিরে আসছেন। কিন্তু আমার লজ্জা কি জানেন, শূন্য ভাণ্ডারের ধূলোয় আপনার সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে যাবে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ও-কথা বলবেন না। যে ঘরে সুনীতির মত

গিন্নী আছে, সে-ঘরে ধূলোর পাপ কি থাকে, না থাকতে পারে? আর সে-ঘর শূন্যও কখনও হয় না। ভাগ্য বিমুখ হয়, লক্ষ্মীও লুকিয়ে পড়েন, কিন্তু মানুষের পুণ্যের ফল, আঁধার ঘরের মাণিক কোথাও যায় না। আমরা আপনার সেই মাণিকের লোভে এসেছি। আমাদের ঘরে আছে এক টুকরো সোনা, সেই সোনা টুকরোর মাথায় আপনার মাণিকটি গেঁথে গয়না গড়াতে চাই। সুনীতি আর আমি, ভাগাভাগি ক'রে সে গয়না পরব।

ইন্দ্র রায় একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, এমন করিয়া গুছাইয়া বলিতে তিনি পারিতেন না। পুলকিত মৃদু হাসিতে তাঁহার মুখ ভরিয়া উঠিল। ও-দিকে সুনীতি বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে হেমাঙ্গিনীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার হাত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, মাথার অবগুণ্ঠন প্রায় খসিয়া পড়িয়াছে, বুকের ভিতরটা উত্তেজনার স্পন্দনে দুর্‌দুর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। সোনা ও মাণিকের অর্থ তিনি যে বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু সে কি সত্য!

গভীর চিন্তায় সারি সারি রেখায় রামেশ্বরের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; অনন্ত আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত কোথায় তাঁহার কোন্ ঐশ্বর্য্য আছে, তিনি যেন তাহাই খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন; কিছু বুঝিতে পারিলেন না, শঙ্কিতভাবে বলিলেন, রায়-গিন্নী, আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী যখন যান, তিনি তো শুধু বাইরের ঐশ্বর্য্যই নিয়ে যান না, মনকেও কাঙাল ক'রে দিয়ে যান। আমার বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে। আমায় আরও বুঝিয়ে বলুন।

এবার হেমাঙ্গিনী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই ইন্দ্র রায় বলিলেন, রামেশ্বর, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করতে এসেছি, তোমার অহীন্দ্রের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করতে এসেছি।

মুহূর্ত্তে রামেশ্বর পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া গেলেন। স্থির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ইন্দ্র রায়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আমার উমাকে আপনি দেখেছেন, সেই যে, যে আপনাকে কবিতা শুনিয়েছিল—বাংলা কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা।

তবু রামেশ্বর কোন উত্তর দিলেন না, তেমনি স্তব্ধভাবে বিস্ফারিত চোখে অর্থহীন দৃষ্টিতে রায়-দম্পতির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। এবার ইন্দ্র রায় ও হেমাঙ্গিনী উভয়েই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রামেশ্বরের পিছনে সুনীতি বসিয়া ছিলেন, আনন্দের আবেগে তাঁহার দুই চোখ বাহিয়া অশ্রুর ধারা বিন্দু বিন্দু করিয়া কোলের কাপড়ের উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল। অকস্মাৎ সে ধারা জলের প্রাচুর্য্যে যেন উচ্ছ্বাসময়ী হইয়া উঠিল। ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সেদিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না, হেমাঙ্গিনী ও ইন্দ্র রায় শঙ্কিতভাবে রামেশ্বরের মুখের দিকেই চাহিয়া ছিলেন।

রামেশ্বর মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আঃ, ছি ছি ছি! ঘৃণিত রোগ, বীভৎস ব্যাধি ছড়িয়ে গেল, পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল! এঃ!

ইন্দ্র রায়ের আশঙ্কা এবার বাড়িয়া গেল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, ডাকিলেন, রামেশ্বর! রামেশ্বর!

কে? কে?—অপেক্ষাকৃত সহজ দৃষ্টিতে রায়ের দিকে চাহিয়া রামেশ্বর এবার বলিলেন, ও, ইন্দ্র। রায়-গিন্নী!—বলিতে বলিতেই দারুণ বেদনায় তাঁহার মুখ চোখ আর্ত্ত সকরুণ হইয়া উঠিল, বলিলেন, আঃ, ছি ছি ছি! রায়-গিন্নী, আমার কুষ্ঠ হয়েছে, কুষ্ঠ। আমার সন্তানের দেহে আমারই রক্ত। শাপভ্রষ্টা স্বর্গের মেয়ে উমা—ইন্দ্র, ইন্দ্র, আঃ, ছি ছি ছি, এ তুমি কি বলছ?

রায় পরম আন্তরিকতার সহিত গভীর স্বরে বলিলেন, ছি-ছি নয়

রামেশ্বর, তোমার রোগ তোমার মনের ভ্রম। আর এ বিবাহ আমার ইষ্টদেবীর প্রত্যাদেশ। মা আমাকে আদেশ করেছেন।

রামেশ্বর আবার যেন বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, এত বড় অভাবনীয় ঘটনার সংঘাতে তাঁহার দুর্বল রুগ্ন মস্তিষ্ক ক্ষণে ক্ষণে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল; তিনি বিহ্বলের মত বলিলেন, ইষ্টদেবী? কিন্তু—কিন্তু—

আর কিন্তু কি হচ্ছে তোমার, বল?

কে? কার কথা তুমি বলছ?

হেমাঙ্গিনী পিছন হইতে স্বামীকে আকর্ষণ করিয়া কথা বলিতে ইঙ্গিতে বারণ করিলেন, তারপর রামেশ্বরের আরও একটু কাছে আসিয়া বলিলেন, বলেছে, সেও বলেছে. হাসিমুখে বলেছে।

রামেশ্বরের চোখ হইতে টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, চোখের জলের মধ্যেও ম্লান হাসি হাসিয়া এবার তিনি বলিলেন, সে কি অনুমতি দিয়েছে? আপনাকে বলেছে?

হ্যাঁ। এ বিয়ে না হ'লে তার গতি হচ্ছে না, সে শান্তি পাচ্ছে না। হেমাঙ্গিনীও এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র রায় সজল চক্ষে উপরের দিকে মুখ তুলিয়া ডাকিলেন, তারা, তারা মা!

দুর্ব্বল রামেশ্বর আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না; দরদর ধারায় চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, অধীর হবেন না চক্রবর্ত্তী মশায়।—বলিয়া তিনি সুনীতির পরিত্যক্ত পাখাখানা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিয়া রামেশ্বর হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন, আপনি একটা কথা তাকে বলবেন? একটি কবিতা। বলবেন—

"গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘো লক্ষান্তরেঽর্কে সলিলে চ পদ্মম্।
দ্বিলক্ষ দূরে কুমুদস্যনাথো যো যস্য মিত্র ন হি তস্য দূরম্॥"

হেমাঙ্গিনী অশ্রুসজল চোখে বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, বলব।

তারপর কিছুক্ষণের জন্য ঘরখানা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হেমাঙ্গিনাই আবার বলিলেন, তা হ'লে আমাদের কথার কি বলছেন, বলুন?

রামেশ্বর বলিলেন, ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। উমা, উমা, পর্ব্বতদুহিতা উমার মতই সে পুণ্যবতী। ইন্দ্র ইষ্টদেবীর আদেশ পেয়েছে, আপনি তার অনুমতি পেয়েছেন, এ যে আমারই মহাভাগ্য রায়-গিন্নী। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে লক্ষ্মীর প্রত্যাগমনের সময় হয়েছে। সুনীতি! কই, শাঁখ বাজাও—

রামেশ্বরের পিছনে আত্মগোপন করিয়া সুনীতি বিরামহীন ধারায় কাঁদিয়া চলিয়াছিলেন, স্বামীর শেষ কথা কয়টির পর আর তিনি থাকিতে পারিলেন না, অতি মৃদুস্বরে করুণতম বিলাপধ্বনিতে তাঁহার বুকের কথা মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, মহীন, আমার মহীন?

* * *

মুহূর্ত্তে ঘরখানা স্তব্ধ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, ঘরের মৃদু আলোটুকু পর্য্যন্ত কেমন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। হেমাঙ্গিনী, ইন্দ্র রায় অপরিসীম বেদনার আত্মগ্লানিতে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে-ছিলেন, রামেশ্বর আবার বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া নীরবে বসিয়া ছিলেন। সুনীতির কণ্ঠও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। মুখে দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানিয়া তিনি নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিলেন, যেন কত অপরাধ হইয়া গিয়াছে মুহূর্ত্তের অসংযমে। এই স্তব্ধতার মধ্যে সুনীতির সেই মৃদু বিলাপের কয়টি কথার সকরুণ ধ্বনি যেন প্রতিধ্বনিত পুঞ্জীভূত হইয়া সমস্ত ঘরখানাকে পরিপূর্ণ করিয়া ভরিয়া দিয়াছে; নিশীথরাত্রির নীরবতার

মধ্যে মাটির বুকে কীটপতঙ্গের রবধ্বনির নিরবচ্ছিন্ন একটি উদাস সুরে যেমন পৃথিবীর বুক হইতে অসীম শূন্য পর্যান্ত পরিপূর্ণ করিয়া দেয়।

কিছুক্ষণ পর রামেশ্বর বলিলেন, মহীন! হ্যাঁ হ্যাঁ, মহীন। আচ্ছা, দ্বীপান্তরে এক রকম পাতা পাকিয়ে দড়ি করতে দেয়, যাতে হাতে কুষ্ঠ হয়, না?

রায় বলিলেন, আঃ রামেশ্বর, তুমি মনকে একটু দৃঢ় কর ভাই। ও সব মিথ্যা কথা।

হেমাঙ্গিনী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিবর্ণ মুখে অতি কষ্টে একটি হাসির সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, বেশ তো, সম্বন্ধ হয়ে থাক।

রামেশ্বর বলিলেন, না না না। এ-বিয়ে না হ'লে সে যে শান্তি পাচ্ছে না, তার যে গতি হচ্ছে না! রায়-গিন্নী বলেছেন, রায় গিন্নী—

রায় বলিলেন, না না। হবে, দু দিন পরেই হবে। তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না।

সুনীতি অন্দরের মধ্যে নির্ব্বাসিতার মত নিতান্ত একাকিনী বাস করিলেও বায়ুতরঙ্গ ধ্বনি বহন করিয়া আনিয়া কানে তুলিয়া দেয়। এই অপমানকর রটনার ধ্বনির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এখন হেমাঙ্গীনীর কথা—'এ বিবাহ না হইলে রাধারাণী শান্তি পাইতেছেন না, তাঁহার গতি হইতেছে না', ইহার মধ্য হইতে সহজেই তিনি একটি গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করিলেন। রাধারাণীকে লইয়া রায়-বাড়ীর লজ্জা সময়ক্ষেপের ক্ষয়ে ক্ষয়িত হইয়া ইন্দ্র রায়কে মাথা তুলিবার অধিকার দিয়াছিল, কিন্তু রায়-বাড়ীর জীবন-গণ্ডীর মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তিনি এবং অহীন্দ্রই আবার সে ক্ষয়িত লজ্জাকে দ্বিগুণ করিয়া তুলিয়াছেন, পুরানো লজ্জা আজ নূতন হইয়া উঠিয়াছে। সে আত্মগ্লানি এবং লজ্জাতেই সুনীতি অপরাধিনীর মত

স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ধীরে মৃদুস্বরে ইন্দ্র রায় এবং স্বামীর সমক্ষেই ডাকিলেন, দিদি!

হেমাঙ্গিনী সচকিত হইয়া সুনীতির মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, অনবদ্য প্রশান্তির একটি ক্ষীণ হাস্যরেখা সুনীতির মুখে নিশান্তের ক্ষীণ প্রসন্নতার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুনীতি বলিলেন, না দিদি, হোক, বিয়ে হোক। আমি একা আর থাকতে পারছি না। মহীন যখন ফিরে আসবে, তখন তার বিয়ে দিয়ে আবার আনন্দ করব। সুখের মধ্যে হঠাৎ তাকে আমার মনে প'ড়ে গিয়েছিল। হোক, বিয়ে হোক।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া রায় বলিলেন, তোমার মঙ্গল হবে বোন, তুমি আমাকে সত্য-লজ্জা না হোক, লোকলজ্জার হাত থেকে ত্রাণ করলে।

সুনীতি উঠিয়া বলিলেন, ঠাকুরের পূজোর টাকা তুলে আসি দিদি, আর মানদাকে বলি, শাঁক বাজাক, বাজাতে হয়। আপনি একটু বসুন দিদি, মিষ্টিমুখ ক'রে যেতে হবে।

রায় বলিলেন, আন বোন, তোমার রান্নার সুখ্যাতি তোমার বেয়ানের মুখে তো ধরে না; আজ আমি পরখ ক'রে দেখি।

২৬

হাউইয়ে আগুন ধরিলে সে যেমন আত্মহারা উন্মত্ত গতিতে ছুটিয়া চলে ইন্দ্র রায়ও ইহার পর তেমনি দুরন্ত গতিতে ধাবমান হইলেন। রাধারাণীর নিরুদ্দেশের ফলে যে অপমান বারুদের মত সর্ব্বনাশা ক্ষোভ লইয়া বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, সে অপমানের বারুদ-স্তূপকে ভস্মীভূত করিয়া ইন্দ্র রায়ের বংশকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া লইবার উপযুক্তমত নিষ্কলুষ অগ্নিকণা দিতে পারিত একমাত্র চক্রবর্ত্তী-বংশই, সেই পরম বাঞ্ছিত অগ্নিকণার সংস্পর্শ পাইয়া ইন্দ্র রায়ের এমনি ভাবে

অপূর্ব্ব আনন্দে বহ্নিমান হইয়া দশ দিক প্রতিভাত করিয়া তোলাই স্বাভাবিক। সংসারে স্বভাবধর্ম্মের বিপরীত কিছু কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে, ইন্দ্র রায় স্বভাবধর্ম্মের আবেগেই ছুটিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণের আর ছয়টা দিন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, ইহারই মধ্যে তিনি পাত্র-কন্যা আশীর্ব্বাদ-অনুষ্ঠান শেষ করিয়া ফেলিলেন। সুনীতির নাম দিয়া অহীন্দ্রকে টেলিগ্রাম করা হইল, ইন্দ্র রায় নিজে টেলিগ্রাম করিলেন অমলকে, "অবিলম্বে উমাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া এস।"

সেই দিনই গভীর রাত্রে অহীন্দ্র এবং উমাকে সঙ্গে করিয়া অমল আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই বাড়ীই প্রতীক্ষমান হইয়া ছিল, অহীন্দ্র ডাকিবামাত্র মানদা ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিল, দাদাবাবু!

অহীন্দ্র উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল, বাবা কেমন আছেন মানদা?

ভাল আছেন গো দাদাবাবু, সবাই ভাল আছে। মানদার মুখে কৌতুকসরস হাসি ঝলমল করিতেছিল।

তবে? এমন ভাবে টেলিগ্রাম কেন করলে মানদা?

আপনার বিয়ে গো দাদাবাবু, উ-বাড়ীর উমাদিদির সঙ্গে।

অহীন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে একটা অদ্ভুত শিহরণ বহিয়া গেল, বুকের ভিতরটা এক অপূর্ব্ব অনুভূতিতে চঞ্চল অস্থির হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সে অনুভব করিল, উমাকে সে ভালবাসে—হ্যাঁ, সত্যই সে ভালবাসে।

ঠিক এই সময়ে সুনীতি আসিয়া দাঁড়াইলেন, অতি মিষ্ট মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, আয়, বাড়ীর ভেতরে আয়, আমরা জেগেই ব'সে আছি তোর জন্যে।

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অহীন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল দাদাকে; সুনীতির সুন্দর মুখখানির উপর তাঁহার জীবনের মর্ম্মন্তুদ দুর্ভাগ্যগুলি কেমন একটি পরিস্ফুট বেদনার্ত্ত সকরুণ ভঙ্গির ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

সুনীতির মুখে বর্ত্তমানের দীপ্ত আনন্দের উজ্জ্বলতা জ্বলজ্বল করিলেও তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই অতীত দুঃখের স্মৃতিগুলি মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠে। বেদনার আবেগে অহীন্দ্রের বুক ভরিয়া উঠিল, সে কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল, ছি ছি, এ করেছ কি মা? না না না, এ যে হয় না, হতে পারে না।

সুনীতি আশঙ্কায় চকিত হইয়া উঠিলেন, শঙ্কাতুর কণ্ঠে বলিলেন, কেন হয না অহি? আমরা যে কথা দিয়েছি বাবা।

অহীন্দ্রের চোখ হইতে জল ঝরিয়া পড়িল, সে বলিল দাদার কথা কি ভুলে গেলে মা?

সুনীতির মুখে একটি সকরুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, গাঢ় শীতের জ্যোৎস্নার মত সে-হাসি—তীক্ষ্ণ কাতর স্পর্শময়ী অথচ উজ্জ্বল রূপ সে-হাসির, অহীন্দ্রের মাথাটি গভীর স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, তবু তোকে বিয়ে করতে হবে, উপায় নেই। এ তোর বাপ-মায়ের আজ্ঞাপালন; কোন অপরাধ তোকে স্পর্শ করবে না বাবা।

অহীন্দ্র মুখে কোন প্রশ্ন করিল না, কিন্তু স্থির সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুনীতি বলিলেন, ঘরে আয়।

বাড়ীর ভিতর উপরে অহীন্দ্রের ঘরে বসিয়া সুনীতি সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া বলিলেন, তোর বড়মা—আমার দিদি, আমি স্থির জানি অহিন, তিনি বেঁচে নেই। কোন দুরন্ত অভিমানে তিনি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত আত্মগোপন ক'রেছেন, যার আঘাতে তোর বাপ এমন ক'রে পাগল হয়ে গেছেন অহি। কিন্তু কলুষের কালি এ ওর মুখে মাখিয়ে, মানুষ ভগবানের পৃথিবীকে ক'রে তুলছে সঙ-সার। সেখানে মানুষ তো রেয়াত কাউকে করে না, তারা তাঁর স্মৃতির ওপর কালি বুলিয়ে দিয়েছে বাবা। এ কালি তোমাকে আর উমাকেই ধুয়ে মুছে তুলতে হবে।

অহীন্দ্র স্তব্ধ হইয়া অভিভূতের মত মায়ের কথা শুনিতেছিল। সুনীতি আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন, সেদিন উমার মা বললেন, তোর বড় মায়ের নাম ক'রে, যে, এ বিয়ে না হ'লে তিনি শান্তি পাচ্ছেন না, তাঁর গতি হচ্ছে না ; এত বড় সত্যি কথা আর হয় না।

প্রথমেই পাত্র-আশীর্ব্বাদ শেষ হইল। ইন্দ্র রায় সমারোহ করিয়া অহীন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন। তিনি রায়-বংশের প্রত্যেককে তাঁহার সঙ্গে পাত্র আশীর্ব্বাদ করিতে চক্রবর্ত্তী-বাড়ী যাইবার নিমন্ত্রণ জানাইলেন। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতে আহারের আয়োজন হইয়াছিল। ইন্দ্র রায়ের নায়েবের ভাইপো চক্রবর্ত্তী-বাড়ার নূতন নায়েব : ইন্দ্র রায়েরই আদেশ অনুযায়ী সে সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেছিল। সেই নায়েবই একদিন যোগেশ মজুমদারকে সুনীতির নাম করিয়া সাদর আহ্বান জানাইয়া আসিল, কর্ত্তাবাবুর অবস্থা তো জানেন, গিন্নীমা বললেন; এ বাড়ীর মর্য্যাদা জানেন এক আপনি, আপনি না গেলে এ-সব কাজ কি ক'রে হবে ?

মজুমদার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর বলিল, যাব আমি, বলবেন, আমার ক্ষমতায় যা হবে, তার কসুর আমি করব না।

আর ও-বাড়ীর রায় মশায়ও একবার দেখা করবার জন্যে বার বার ক'রে বলেছেন।

কে, ছোট রায় মশায় ?

আজ্ঞে হ্যাঁ! তিনি তাঁর ছেলেকেই পাঠাতেন, তা—

বাধা দিয়া মজুমদার বলিল, না না না, আমি নিজেই যাব।

মজুমদার আসিতেই সাদরে আহ্বান করিয়া রায় বলিলেন, তোমার মনটা সেদিন বড় পবিত্র ছিল যোগেশ, কথাটা মা তারা সত্যে

পরিণত ক'রে দিলেন। তোমাকে আমি বলেছিলাম, সত্য হ'লে তুমিই জানবে সর্ব্বাগ্রে, সেটা আমার মনে আছে। এখন তোমাকে কিছু ভার নিতে হচ্ছে ভাই, চক্রবর্ত্তী-বাড়ী তোমার পুরানো বাড়ী। ওখানকার কাজকর্ম্মের ভার তোমাকেই নিতে হবে। আর কন্যা-আশীর্ব্বাদ করতে রামেশ্বর তো আসতে পারছেন না, আশীর্ব্বাদ করবেন ও বাড়ীর কুলগুরু, তা সেদিন তুমি আসবে ও-বাড়ীর প্রতিনিধি হয়ে।

মজুমদার মুখে কিছু বলিতে পারিল না, কিন্তু রায়ের কথা প্রাণপণে পালন করিবার চেষ্টা করিল এবং অকপট অন্তরেই চেষ্টা করিল।

কলের মালিক বিমলবাবুকে সমাদর করিয়া আহ্বান করা হইয়াছিল। তিনিও পাত্রআশীর্ব্বাদের আসরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র রায় অকস্মাৎ একটা কাজ করিয়া বসিলেন; বিমলবাবুকে দেখিবামাত্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কি ভাবিয়া লইলেন, তারপর ব্যস্তভাবে তাঁহার হাতে গোলাপজল-ভরা গোলাপপাশটি ধরাইয়া দিলেন এবং আতরদানবাহী চাকরটাকে তাঁহার সঙ্গে দিয়া বলিলেন, আপনি হলেন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর লোক, আমরা আজ আপনাদের বাড়ী কুটুম্ব এসেছি। আপনি আজ আমাদের খাতির করুন, আপনার খাতির করব আমি আমার বাড়ীতে।

বিমলবাবু প্রত্যাখ্যান করিলেন না, করিবার যেন উপায় ছিল না।

বাহিরে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সাঁওতালেরা মাদল বাজাইয়া মহা আনন্দে গান গাহিয়া নাচ জুড়িয়া দিয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে বাগ্দীপাড়ার লাঠিয়াল দলের প্রত্যেকে হাত দশেক লম্বা এক গজ চওড়া একফালি করিয়া লাল শালু ও একটি করিয়া ফতুয়া পাইয়াছিল; নূতন ফতুয়া গায়ে লাল পাগড়ি মাথায় তাহারা লাঠি হাতে মোতায়েন ছিল। তাহারা এবং সাঁওতালেরা মদ খাইয়াছে প্রচুর। নবীন বাগ্দীর স্ত্রী মতি

এখন বাগ্দীদের সর্দ্দারনী, সে নূতন কাপড় পাইয়াছে, গাছ-কোমর বাঁধিয়া আঁট-সাঁট করিয়া কাপড় পরিয়া সে লাঠি হাতে অন্দরের দরজায় মোতায়েন থাকিয়া হাঁক-ডাক জাহির করিতেছে।

আশীর্ব্বাদের অনুষ্ঠান শেষ হইতেই অহীন্দ্র অমলের সঙ্গে সাঁওতালদের আসরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরস্পরের কোমরে জড়াইয়া ধরিয়া সাদা ধবধবে কাপড়-পরা কালো মেয়েগুলি অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সারি বাঁধিয়া জলের ঢেউয়ের মত হিল্লোলিত ভঙ্গিতে দুলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে, সম্মুখে পুরুষেরা মাদল, নাগরা, বাঁশী ও নিজেদের তৈয়ারি সারঙ্গ বাজাইয়া ঝড়ের দোলায় আন্দোলিত শালের মত দীর্ঘ আন্দোলিত ভঙ্গিতে দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। মেয়েরা গাহিতেছিল বড় মজার গান, উহাদেরই নিজেদের রচনা করা বাংলা ভাষায় গান—

রাজা যাবে সোরানে সোরানে (পাকা রাস্তা),
রাণী আসছে ডুলির উপর চেপ্যে,
রাঙাবাবুর বিয়ে হবে ;
লাল ফুলের মালা কুথা পাব গো—
পালুতে পোলাশ জবাফুলের মালা গো !

গান শুনিয়া সকৌতুকে অমল হাসিয়া বলিল, বাঃ !

অহীন্দ্র হাসিমুখে দলটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেককে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। দেখিয়া মুখের হাসি তাহার মিলাইয়া গেল। কমলকে এবং সারীকে না দেখিয়া তাহার মন সপ্রশ্ন বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল। গানটি শেষ হইতেই মেয়েগুলি কলকল করিয়া অহীন্দ্র ও অমলের দিকে আঙুল দেখাইয়া কলরব জুড়িয়া দিল ; কালো মুখের মধ্যে সাদা চোখগুলি উজ্জ্বলতর হইয়া অহীন্দ্রের মুখের উপর অসঙ্কোচে নিবদ্ধ হইল। চূড়া মাঝি মাদলটা গলায় ঝুলাইয়াই

আসিয়া নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, গড় করছি গো বাবাঠাকুর রাঙাবাবু! প্রণাম করিয়া উঠিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, আপনার বিয়াতে ই গানটি আমি করলম। আমি লিজে। আপনি সুধাও উয়াদিগে।

অমল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, বাঃ বাঃ, খুব ভাল গান হয়েছে।

চূড়া উৎসাহিত হইয়া বলিল,—আমি—এই বুঝলি বাবু, এই আমি।—বুকে হাত দিয়া সে নিজেকে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইয়া বলিল, আমি মন্তর জানি, ভূত তাড়াতে জানি, গান বানাতে জানি, বুঝলি বাবু, অ্যানেক জানি আমি। তা—তা—কি বুলব আর? বলিয়া সে খানিকটা চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল, আমাদিগে আরও হাঁড়িয়া দিতে হবে বাবু, আপনারা যা দিলি. উই মেয়েগুলা সব বেশি খেয়ে লিলে; দেখ কেনে, চুরচুর করছে সব।

মেয়েগুলি এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অহীন্দ্র এবার মৃদু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, সে হবে। কিন্তু তোদের সর্দ্দার কই? কমল মাঝি? আর সেই তীরন্দাজ শিকারী মাঝি, যে সাপ মারলে, কমলের নাতজামাই, সেই লম্বা মেয়েটির বর। তারা আসে নি কেন সব?

সমস্ত সাঁওতালের দলটি এ প্রশ্নে এক মুহূর্ত্তে নীরব হইয়া গেল। বার বার অকারণে গলা ঝাড়িয়া, চূড়া মাঝি হাতজোড় করিয়া অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিল, আপনাকে আমরা বুলছি বাবাঠাকুর রাঙাবাবু, আপনি আমাদের রাজা বট। সি রাঙাঠাকুরের লাতি বট আপুনি। তেমনি আগুনের পারা রং! বাবা রে! আপনাকে মিছা বুলতে নাই। হ'ল কি—উয়ারা করলে কি—উয়ারা—

অহীন্দ্র ভ্রূ কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করিল, কি করলে ওরা?

চূড়া হাত তুলিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে বলিল, তাই থো বুলছি বাবু। উয়ারা—পাপ করলে। আমাদের 'পঞ্চ' বুললে, তুদের সাথে আমরা খাব না, তুদের সাথে করুন-কাম করব না, বিয়া শাদি দিব না। হুঁ, ভিন্ন ক'রে দিলে উয়াদিগে! ঘেন্না করলে। তাথেই বুড়ার শরম লাগল, ইখানে থাকতে লারলে। চ'লে গেল, পালিয়ে গেল। লাজের কথা কিনা।

অহীন্দ্র বলিল, তারা করেছিল কি?

অত্যন্ত লজ্জা প্রকাশ করিয়া চূড়া জিভ কাটিয়া বলিল, ছি! উটি লাজের কথা বটে, খারাপ কথা বটে। উ আপোনাকে শুনতে নাই। ছি। বাবা রে!

অহীন্দ্র আর প্রশ্ন করিতে পারিল না। কিন্তু ইহাদের কথাবার্ত্তাগুলি অমলের বড় ভাল লাগিতেছিল, সে বলিল, তা হ'লে এখন সর্দ্দার কে? তুমি?

চূড়া পরম বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, আপুনি উয়াদিগে শুধাও, আমি বুলি নাই। উয়ারাই বুললে, আমি অনেক জানি কিনা, আমি নোকটি খুব বিদ্যে জানি। ওস্তাদ বেটে আমি। বোঙার পূজা জানি—মরং বোঙা, মরং বোঙা বুঝছ‌ংতো। ভগোবান। উয়ার মন্তর জানি আমি। ভূত তাড়াতে জানি, ওষুধ জানি। অ্যানেক বিদ্যে জানি, হুঁ। তা সোবাই বুললে, আমি বুলি নাই। ছি, লিজে থেকে বুলতে নাই। শরমের কথা, ছি! উয়াদিগে শুধান আপুনি।

অমল হাসিয়া বলিল, ব্যাপারটা একটু জটিল মনে হচ্ছে অহিন। এতখানি বিনয় তো ভাল নয়।

অহীন্দ্র বলিল, হুঁ। পরে জানতে হবে, ব্যাপারটা কি। এখন নাচগান করছে, করুক।

তাহাদের মৃদু স্বরের কথা ভাল বুঝিতে না পারিলেও চূড়া এটুকু

বুঝিয়াছিল যে, কথাটা তাহাদের সম্পর্কেই হইতেছে। সে আবার বিনয় করিয়া বলিল, উই চরাটোতে 'সিটল-পিন্টি' (সেটল্‌মেণ্টের জরিপ) যখন হ'ল, রাঙাবাবু গেল, মোড়লেরা গেল, তখুন আমি হিসাব করলম, মাপের দাঁড়া ধরলম। আমি সকুলই জানি কিনা। তাথেই আমীকে উয়ারা মোড়ল করলে।

অহীন্দ্র বলিল, বেশ বেশ। এখন তোরা নাচগান কর্‌। তুইও তো খুব ভাল লোক, তুই মোড়ল হয়েছিস, সেও বেশ ভালই হয়েছে।

চূড়া খুশি হইয়া মাদলটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া লাফ দিয়া মেয়েদের সম্মুখীন হইয়া মাদলে ঘা দিল ধি-তাং-তাং, ধি-তাং-তাং। বাঁশী, সারঙ্গ, নাগরা আবার বাজিতে আরম্ভ করিল। মেয়েরা আবার সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইল।

অহীন্দ্র সমস্ত দলটির দিকে চাহিয়া দেখিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। সেই সচল পাহাড়ের মত কমল মাঝি, বাবরি চুলওয়ালা সেই শিকারী বংশীবাদক তরুণটি না হইলে পুরুষের দলটি যেন মানায় না, আর মেয়েদের ওই শ্রেণীটির ঠিক মধ্যস্থলে থাকিত দীর্ঘাঙ্গিনী সারী; তাহার মাথাটা ঠিক মধ্যস্থলে সকলের চেয়ে উঁচু হইয়া থাকিত, মুকুটের মাঝখানের কালো পাখীর উজ্জ্বল পালকের মত।

পরদিন সন্ধ্যাতেই উমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কুলগুরু। ইন্দ্র রায় সমারোহ করিলেন প্রচুর; রায়-বংশের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি যোগেশ মজুমদারকে ডাকিয়া একখানি দামী ধুতি ও গরদের চাদর হাতে দিয়া বলিলেন, তুমি আজ আমার বেয়াইয়েরই তুল্য মাননীয় ব্যক্তি, কর্ম্মচারী হ'লেও রামেশ্বর তোমাকে ভাইয়ের মতই স্নেহ করেন, অহীন্দ্র তোমাকে বলে—কাকা। বেয়াই-বাড়ীর এ সম্মান তোমার প্রাপ্য।

বিমলবাবু আজ আর আসেন নাই। শরীর খারাপ বলিয়া সবিনয়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইন্দ্র রায় তাঁহাকে গোলাপপাশ বহন করাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সামাজিক ভোজনে পংক্তির মধ্যেও পর্য্যন্ত বসিতে দেন নাই। তাঁহাকে স্বতন্ত্রভাবে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। রায় চেয়ার-টেবিলের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। হাসিয়া টেবিলের উপর একটি বিলাতী মদের বোতল নামাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, আপনার জন্তেও হাঁড়িয়ার বন্দোবস্ত আমরা রেখেছি।

সাঁওতালী ভাষায় মদের নাম হাঁড়িয়া।

* * * *

পরদিন অপরাহ্ণে হেমাঙ্গিনী উমাকে লইয়া রামেশ্বরের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। রামেশ্বরকে প্রণাম করাইবার জন্যই উমাকে লইয়া আসিলেন। উমা রামেশ্বরকে প্রণাম করিয়া সলজ্জভাবে সঙ্কুচিত হইয়া বসিল।

রামেশ্বর সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, প্রথমে যেদিন মাকে আমার দেখেছিলাম, সেদিন কুমারসম্ভবের উমার বাল্যরূপের বর্ণনা মনে পড়েছিল; আজ মনে পড়ছে উমার ভাবী বধূরূপ। মহাকবি কালিদাস, তিনি বলেছেন—

সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা।
সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈ রামুচ্যমানাভরণা চকাশে॥

অর্থাৎ উমা অলঙ্কার পরিধান করলে কেমন শোভা হ'ল, না—কুসুমিতা লতার মত, জ্যোতির্লোক উদ্ভাসিত রাত্রির মত, আশ্রয়ার্থী হংস-বলাকাশোভিত নদীর মত। তা হ্যাঁ মা উমা, তুমি আমার মা হতে পারবে তো? দেখছ তো, আমি ব্যাধিগ্রস্ত, আমার পুত্রবধূ হতে তোমার কোন দ্বিধা নেই তো?

উমা মুখে কিছু বলিতে পারিল না, কেবল গভীর বেদনায় কাতর

দৃষ্টিভরা চোখে রামেশ্বরের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সেও মুহূর্ত্তের জন্য, পরক্ষণেই লজ্জিত হইয়া দৃষ্টি নত করিল। হেমাঙ্গিনী কাতরভাবে বলিলেন, কেন আপনি বার বার ও-কথা বলেন চক্রবর্ত্তী মশায়? কোথায় আপনার ব্যাধি? এই সেইদিনও তো আপনার রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে, তারাও তো বলেছে, আপনার কোন ব্যাধি নেই। ও আপনার মনের ভ্রম।

রামেশ্বর বলিলেন, রায়-গিন্নী ভগবানের শাস্তি, মৃত্যু, ব্যাধি এগুলোর নির্ণয় হয় না, চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও জ্ঞানের বাইরে এগুলো। কিন্তু ও তর্ক থাক। মা আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আমি ধন্য হয়েছি রায়-গিন্নী। হ্যাঁ, আর একটা কথা। মা উমা, আমি দরিদ্র, লক্ষ্মী আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। আর তার জন্যে আমার দুঃখ নেই। জান মা, দারিদ্র্যকে প্রণাম ক'রে আমি বলি—

দারিদ্র্যায় নমস্তভ্যং সিদ্ধোঽহং তৎপ্রসাদতঃ।
জগৎ পশ্যামি যেনাহং ন মাং পশ্যন্তি কেচন॥

বলি হে দারিদ্র্য, তোমাকে নমস্কার, তোমার প্রসাদে আমি সিদ্ধ হয়েছি, যেহেতু কেউ আমার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে না, আমি জগৎকে দেখি, আমি দ্রষ্টা হতে পেরেছি। তবে মা, তোমার আগমনে লক্ষ্মীকে আবার ফিরতে হবে, তবু কথাটা তুমি জেনে রাখ।

উমা এবার চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, সে একে সপ্রতিভ মেয়ে, তার উপর কলিকাতার স্কুলে পড়াশুনা করিয়াছে এবং রামেশ্বর তাহার অপরিচিত তো ননই, বরং কাব্যালাপের মধ্য দিয়া একটি হৃদ্য আত্মীয়তার স্মৃতিই তাহার মনে জাগরূক ছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, কবিতাটি ভারী সুন্দর!

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, নিন, এইবার বেটার বউকে সংস্কৃত শেখান।

পরম উৎসাহে রামেশ্বরের চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন, নিশ্চয় শেখাব। মা আমাকে প'ড়ে শোনাবেন, আমি শুনব। জান মা, তোমার সেই বাঙালী কবি, রবীন্দ্রনাথের বই আমাকে অহীন্দ্র এনে দিয়েছে, কিন্তু চোখের জন্তে পড়তে পারি না ; তুমি আমায় শোনাবে মা ? ওই দেখ, আন তো মা, তোমার কণ্ঠে কবির কাব্য সুর লাভ ক'রে সঙ্গীত হয়ে উঠবে। শোনাও তো মা আমাকে কিছু। বহুদিন কিছু শুনি নি।

উমা দেখিল, সে আমলের পুরানো টেবিলটার উপর একখানি 'চয়নিকা' সযত্নে রাখা রহিয়াছে ; সে বইখানি আনিয়া বসিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, আমি নীচে সুনীতির কাছে যাচ্ছি চক্রবর্ত্তী মশায়, আপনারা শ্বশুর-পুত্রবধূতে মিলে কাব্য করুন ব'সে ব'সে।

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলেন। রামেশ্বর বলিলেন, পড় তো মা, মৃত্যু সম্বন্ধে তোমাদের কবির কোন কবিতা যদি থাকে, তবে তাই প'ড়ে আমায় শোনাও।

উমা বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিল—

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

প্রথমে লজ্জার সঙ্কোচে ঈষৎ মৃদু স্বরেই উমা আরম্ভ করিল, কিন্তু পড়িতে পড়িতে কাব্যের প্রভাবে অভিভূত হইয়া স্থানকালকে অতিক্রম করিয়া সে স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বরে সঙ্কোচের জড়তা রহিল না, আবেগপূর্ণ অকুণ্ঠিত কণ্ঠে ছন্দে ছন্দে তালে তালে সঙ্গীতের মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া আবৃত্তি করিয়া চলিল—

তব পিঙ্গল ছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না।

তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে পিছে কেহ র'বে না !
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙা বরণ
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

বিস্ফারিত চক্ষে রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন, আবেগে নাকের প্রান্তভাগ বার বার ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। কবিতা শেষ হইয়া গেল, উমা নীরব হইল। কিন্তু সমস্ত ঘরখানা তখনও যেন আবৃত্তির ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতেছিল। অকস্মাৎ রামেশ্বর বলিলেন, ওখানটা আর একবার পড় তো মা, ওই যে—তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ, তারপর কি মা ?

উমা পড়িয়া বলিল—

তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ

সঙ্গে সঙ্গে রামেশ্বর আবৃত্তি করিলেন—

তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ।
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

ইহার পর রামেশ্বর যেন কাব্যের মোহে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, উমার উপস্থিতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর হাত দুইটি তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, তোমার শঙ্খনাদ আমি শুনতে পাচ্ছি, প্রলয়শ্বাসের ঢেউ আমার অঙ্গে এসে লাগছে। এঃ, একেবারে জীর্ণ ক'রে দিয়েছে আঙুলগুলো।

উমা শঙ্কিত হইয়া উঠিল. সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য সন্তর্পণে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের প্রদীপের আলোয় তাহার ছায়াখানি দীর্ঘ হইয়া মেঝের উপর চঞ্চল হইয়া জাগিয়া উঠিল।

রামেশ্বর চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কে?

উমা শঙ্কিত কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, আমি।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রামেশ্বর যেন স্মরণ করিয়া বলিলেন, ও, মা, আমার মা-জননী। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি মা—

আখণ্ডলো সমো ভর্ত্তা জয়ন্ত প্রতিমঃ সুতঃ
আশীরণ্যা ন তে যোগ্যা পৌলমী মঙ্গলা ভব॥

উমা আবার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া সন্তর্পণেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রামেশ্বরের ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্দর-মহলের দিকে টানাবারান্দা দিয়া উমা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। খানদুয়েক ঘর পার হইয়াই সে দেখিল, অহীন্দ্র আপনার ঘরে খোলা জানালার ধারে বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। এদিকে ওদিকে চাহয়া উমা মৃদুস্বরে বলিল, গুড-আফ্‌টারনূন সায়েব।

অহীন্দ্র চকিত হইয়া হাসিমুখে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, নমস্কার শ্রীমতী উমা দেবী।

তাহাদের উভয়ের এই সম্বোধনের একটু ইতিহাস আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই চক্রবর্ত্তী-বাড়ীতেই বালিকা উমা একদিন অহীন্দ্রকে বলিয়াছিল, আপনাকে দেখলেই লোকে চিনতে পারবে, এই স্কলার্‌শিপ পেয়েছে। যে সায়েবদের মত ফরসা রং!

তারপর অহীন্দ্র কলিকাতায় গেলে অমল উমাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, কে বল্ দেখি?

উমার স্কুলের তখন বাস দাঁড়াইয়া, সে দীর্ঘ বেণীটি দোলাইয়া

বলিয়াছিল, সায়েব। পরক্ষণেই খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল জিজ্ঞেস কর না সায়েবকে রায়হাটে ওঁদের বাড়ীতেই ওঁর নাম দিয়েছি সায়েব। গুড-মর্নিং সায়েব।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিল, নমস্কার শ্রীমতী উমা দেবী। আমি তোমাকে বাঙালিনীই দেখতে চাই।

উমা মাথাটি ঈষৎ নত করিয়া বলিয়াছিল, বাঙালী কালো মেয়ের স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে, অতএব—। বলিয়াই সে বেণী দোলাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

আজ উমা বলিল, এমন ধ্যানমগ্নের মত ব'সে যে?

অহীন্দ্রের জানালা হইতে চরটা স্পষ্ট দেখা যায়, সে চরটার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল, চরটাকে দেখছি। ইন্দ্রজালের মত ময়দানবের পুরী গ'ড়ে উঠল। এই এবার পূজার সময়েও দেখেছি, সবুজ ঘাসে ঢাকা শান্ত এক টুকরো ভূখণ্ড, মধ্যে ছোট্ট একটি সাঁওতাল-পল্লী। একেবারে এক প্রান্তে ক'টা ইটের ভাটি।

উমা বলিল, চরটা তো তোমাদের?

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, তোমাদের।

উমার মুখ লাল হইয়া উঠিল, লজ্জায় এবার আর সে জবাব দিতে পারিল না। অহীন্দ্র বলিল, জান, ওই চরের ওপর আমার এক দল পূজারিণী আছে। তারা আমাকে দেখে লজ্জায় রাঙা হয় না অসঙ্কোচ আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে।

উমা বলিল, জানি, একটি মেয়ে আজ আমাকে দেখতে এসেছিল। আমাকে বললে—রাঙাঠাকরুণ। বললে, বাবুকে বলি রাঙাবাবু, তোমাকে বলব—রাঙাঠাকরুণ।

অহীন্দ্র একটু উচ্ছ্বসিত হইয়াই বলিল, চমৎকার নাম দিয়েছে।

উমা বলিল, তার নিজের নামটিও বেশ—সারী, সারী।

সবিনয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অহীন্দ্র বলিল, সারী? খুব লম্বামত মেয়েটি?

হ্যাঁ। একটু বেশী লম্বা। কিন্তু আর নয়, চললাম। মা-রা হয়তো এক্ষুনি ওপরে চ'লে আসবেন। পালাচ্ছি আমি। সে আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না, ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কয়েক মিনিট পরেই অহীন্দ্র নীচে নামিয়া আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া মানদাকে ডাকিয়া বলিল, আমি চরের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি। অমল এলে বলিস, দাদাবাবু আপনাকে যেতে ব'লে গেছেন।

অহীন্দ্র চলিয়া যাইতেই মানদা হাসিতে প্রায় উচ্ছ্বসিত হইয়া সুনীতি ও হেমাঙ্গিনীর নিকট আসিয়া বলিল, শাশুড়ীকে দেখে দাদাবাবুর লজ্জা হ'ল আমাকে ডেকে চুপিচুপি—। বলিতে বলিতে সে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

২৭

চরের উপরে কর্ম্মকোলাহল তখনও স্তব্ধ হয় নাই। শেডটার লৌহকঙ্কাল তৈয়ারি ইহারই মধ্যে শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ তাহার উপরে করোগেটেড শীট পিটানো হইতেছে। বোল্টগুলির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িতেছে। আকাশমুখী সুদীর্ঘ চিমনিটার আকার এইবার সরু হইতে আরম্ভ করিয়াছে; আজ আবার নূতন মাচান বাঁধা হইতেছে। নীচে কোথাও গাঁথনির কাজে কর্ণিকের শব্দের ধাতব ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে। ছাদের উপর অসংখ্য পিটনের আঘাত একসঙ্গে পড়িয়া চলিয়াছে, মেয়েগুলি কিন্তু এখন আর গান গাহিতেছে না, আর বোধ হয় ভাল লাগে না। একটা লরির এঞ্জিন কোথায় দুর্দ্দান্তভাবে গর্জ্জন করিতেছে, বোধ হয় কোন দুরন্ত বাধা ঠেলিয়া চলিতে হইতেছে। মাঝে মাঝে অবরুদ্ধ স্টীমে বয়লারটা

থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এ সমস্তকে একটি ক্ষীণ আচ্ছাদনের মত আবরণে আবৃত করিয়া মানুষের কোলাহল-কলরবের উচ্চ গুঞ্জনরোল অবিরাম গুঞ্জিত হইয়া চলিয়াছে। অহীন্দ্র নদীর বুকে দাঁড়াইয়া এই অর্দ্ধনির্ম্মিত যন্ত্রপুরীটির দিকে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল ; সে নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র, বিজ্ঞানকে সে মনে মনে নমস্কার করিল।

নদী হইতে চরের ঘাটে উঠিয়াই সে দেখিল, বেনাঘাসের মধ্যে গরুর গাড়ীর চাকার রেখায় চিহ্নিত সে কাঁচা পথটি আর নাই ; রাঙা কাঁকর বিছানো প্রশস্ত সুগঠিত রাজপথের মত একটি পথ, ঘাটের মুখ হইতে গুণ-টানা ধনুকের মত দীর্ঘ ভঙ্গিতে বাঁকিয়া কারখানার দিকে চলিয়া গিয়াছে। কিছুদূর আসিয়া তাহাকে সে-পথ ছাড়িয়া ডান দিকে ফিরিতে হইল, এতক্ষণে সেই কাঁচা পথটির দেখা মিলিল। পথটি চলিয়া গিয়াছে সঁওতাল-পল্লীর দিকে। দুই পাশে সাঁওতালদের চাষের ক্ষেত। ক্ষেতগুলি সমস্তই অকর্ষিত, কোথাও ফসল নাই ; সমস্ত ক্ষেত্রভূমিটাই একটা ধূসর উদাসীনতায় সদ্য-বিধবার মত বিষণ্ণ রিক্ত। সে বিস্মিত হইয়া গেল, এ কি! সাঁওতালেরা জমিগুলিকে এমন অযত্নে একেবারে রিক্ত করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে! গত বৎসরের এই সময়ের ক্ষেত্রের ছবি তাহার মনে পড়িয়া গেল, বিচিত্র-বর্ণের ফুলে ফসলে ভরা সে যেন একখানি সবুজ গালিচা। আলুর সতেজ সবুজ গাছে ভরা ক্ষেতগুলির চারিপাশে ফুলে ভরা কুসুমফুলের গাছ, পুষ্পিত মটরশুঁটির লতা-ভরা ক্ষেত ; এক চাপ সবুজের মত ছোলা ও মসুরের ক্ষেত, তাহার ভিতর অসংখ্য বেগুনী রঙের কুচি কুচি মসিনার ফুল ; সদ্যোদ্গত সবুজ কোমল শিষে ভরা গম ও যবের ক্ষেত। সকলের চেয়ে বাহার দিত সরিষার ক্ষেতগুলি, হলুদ রঙের ফুলগুলি চাপ বাঁধিয়া ফুটিয়া থাকিত গাঢ় সবুজের মাথায় একটি পীতাভ আস্তরণের মত। ক্ষেতের আইলে সাঁওতাল চাষীরা অকারণে ঘুরিয়া

বেড়াইত, তাহাদের কালো মুখে সাদা চোখে আনন্দ প্রত্যাশার সে কি বিপুল ব্যগ্রতা! অহীন্দ্রের মনে পড়িয়া গেল সচল পাহাড়ের মত বিপুলদেহ কঠিনপেশী কমল মাঝিকে। শেষ সে তাহাকে দেখিয়াছে বর্ষার সময় জলে-ভরা এই ধানক্ষেতের মধ্যে কর্দ্দমাক্ত দেহে সে তখন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ধানক্ষেতের কাদানো জমি সমান করিয়া দিতেছিল। বন্য বরাহের মত হামা দিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নরম মাটি যেন দলিয়া খুঁড়িয়া ফেলিতেছিল। কমল থাকিলে বোধ হয় ক্ষেতের চাষের এমন দুর্দ্দশা হইত না। অহীন্দ্র বেশ বুঝিল, দৈনিক নগদ মজুরির আস্বাদ পাইয়া ইহারা এমন করিয়া চাষ পরিত্যাগ করিয়াছে। কমল বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও আড্ডা গাড়িয়াছে; নহিলে সারী কেমন করিয়া উমাকে দেখিতে আসিল? উমা তো বলিল, খুব লম্বামত মেয়েটি, নামটি বেশ—সারী। মাঠ পিছনে ফেলিয়া অহীন্দ্র সাঁওতাল-পল্লীর ছায়াঘন প্রান্তসীমায় প্রবেশ করিল। পল্লীটা নীরব নিস্তব্ধ; কেবল গোটা-কয়েক কুকুর তাহাকে দেখিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। অহীন্দ্র শঙ্কিত না হইলেও সতর্ক না হইয়া পারিল না, সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নিকটতম বাড়ী হইতে একটি মেয়ে বোধ হয় ঘটনাটা কি দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং রাঙাবাবুকে দেখিয়া সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, রাঙাবাবু!

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ রে। কিন্তু কুকুরগুলো যে তোদের যেতে দেবে না বলছে।

মেয়েটি বেশ একটু ত্রস্ত হইয়া কুকুরগুলাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য হাত তুলিয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, হড়িচ্—হড়িচ্। কুকুরগুলা তবু গেল না, মেয়েটির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া লেজ নাড়িতে

নাড়িতে চীৎকার আরম্ভ করিল, মেয়েটি এবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, ই—রে—কম্বড়ো সে—তা—হড়িচ্—হাড়চ্। অর্থাৎ, ওরে চোর কুকুর, পালা বলছি, পালা। এবার কুকুরগুলো মাথা নীচু করিয়া মৃদু গর্জ্জনে আপত্তি জানাইতে জানাইতে সরিয়া গেল।

অহীন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল, তোরা সব কেমন আছিস ?

মেয়েটি একটু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া বলিল, কেনে, ভাল আছি। সেই যি তুমার বিয়ার 'ল-সম্বন্ধিতে' (নব সম্বন্ধ উপলক্ষে) নেচ্যা এলম গো! হাঁড়িয়া খেলাম, গান করলম।

অহীন্দ্র হাসিয়া ফেলিল ; বলিল, তা বটে, নেচে যখন এলি, তখন খারাপ থাকবি কি ক'রে ; আর ভালই যদি না থাকবি, তবে নেচেই বা এলি কি ক'রে ? ঠিক কথা।

মেয়েটি সবিস্ময়ে অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই কথার অর্থ উপলব্ধি করিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, হেঁ। লইলে নেচ্যা এলম কি করে ?

রাঙাবাবু !

রাঙাবাবু! এ বাবা গো!

হালে—ভালা—রাঙাবাবু গো—

হাসির ধ্বনি শুনিতে পাইয়া আশপাশের বাড়ীগুলি হইতে তিনচারিটি মেয়ে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে রাঙাবাবুর আগমনবার্ত্তা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া অহীন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে দলবদ্ধ হইয়া তরুণীর দল তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বয়স্কা মাঝিনেরা তাড়াতাড়ি ছোট্ট একটি চৌপায়া আনিয়া তাহাদের 'জহর সার্না' অর্থাৎ দেবতার কুঞ্জভবন কৃষ্ণচূড়াগাছের ছায়ায় পাতিয়া দিয়া সম্ভ্রমভরে বলিল, আপুনি বোস্ বাবু।

তরুণীগুলি পরস্পরের গলা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আপনাদের মধ্যেই

নিজেদের ভাষায় অনর্গল কথা বলিতেছিল, তাহার সমস্তই অহীন্দ্রকে লইয়া। অহীন্দ্র বলিল, কি এত সব বলছিস তোরা ?

মেয়েগুলি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটি মধ্যবয়স্কা মেয়ে বলিল উয়ারা বুলছে, রাঙাবাবুকে শুধা, বহুটি কেমন হ'ল ? কত বোড়ো বেটে বহুটি ? তাই ই উয়াকে বুলছে, তুই শুধা ; উ ইয়াকে বুলছে তু শুধা। শরম লাগছে উয়াদের।

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, এই এদের মতই হবে।

এবার একটি মেয়ে বলিল, আমাদের পারা কালো বেটে, না গোরা বেটে ?

অহীন্দ্র বলিল, সে আমি বলব কেন ? তোরা গিয়ে দেখে আয়। সারী গিয়েছিল দেখতে, সে আমার বউয়ের নাম দিয়ে এসেছে—রাঙাঠাকরুণ।

মেয়েগুলি একসঙ্গে অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গম্ভীর মৃদুস্বরে দুই-একজনের মধ্যে দুই-একটা বাদানুবাদের সুরে কথা আরম্ভ হইল। অহীন্দ্র বুঝিতে পারিল না এবং লক্ষ্যও করিল না তাহাদের এই আকস্মিক সুরবৈষম্য। সে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে সপ্রশ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, ভ্রূ এবং কপাল কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল, ভাল কথা সারীরা এখন কোথায় থাকে রে ? কমল মাঝিরা এখান থেকে উঠেই বা গেল কেন ?

মেয়েগুলি আবার স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহাদের অপ্রসন্নতার গাম্ভীর্য্য অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রকট হইয়া উঠিল। অহীন্দ্র তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, কি, তোরা সব গুম্ মেরে গেলি যে ? তাহার সন্দেহ হইল যে, ইহারাই সকলে চূড়ার নেতৃত্বে দল পাকাইয়া কমলকে তাড়াইয়াছে।

একটি তরুণী এবার বলিয়া উঠিল, উ মেয়েটার নাম তু করিস না রাঙাবাবু, ছি!

আরও বিস্মিত হইয়া অহীন্দ্র বলিল, কেন?

সকলের মুখে ঘৃণার অতি তীব্র অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিল, যে-মেয়েটি কথা বলিতেছিল সে বলিল, ছি, উ পাপী বেটে, পাপ করলে।

পাপ করলে?

হেঁ পাপ করলে; আপোন বরকে—মরদকে ছেড়ে উ ওই সায়েবটোর ঘরে থাকছে।

অহীন্দ্র চমকিয়া উঠিল, বাক্যের অর্থে অর্থে সম্পূর্ণভাবে কথাটা না বুঝিলেও অর্থের আভাস সে একটা বুঝিতে পারিতেছিল, তীক্ষ্ণ তির্য্যক দৃষ্টিতে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিল, বরকে ছেড়ে সায়েবের ঘরে থাকছে? সায়েব কে?

ওই যি কল বানাইছে, উয়াকে আমরা সায়েব বলি।

হুঁ। ছোট একটি 'হুঁ' বলিয়াই অহীন্দ্র স্তব্ধ হইয়া গেল।

অপর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, উ এখুন ভাল কাপড় পরছে, গোন্ধ মাখছে, ওই সায়েব দিছে উকে।

অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল, সেইজন্যে বুঝি কমল মাঝি আর সারীর বর এখান থেকে পালিয়ে গেছে?

হেঁ, শরম লাগল উয়াদের, আমরা সব উয়াদের সেঙ্গে খেলম না, তাথেই উয়াদের শরম বেশি হ'ল, উয়ারা সব চ'লে গেল। হেঁ।

অন্যান্য মেয়েগুলি আপনাদের ভাষায় অনর্গল কিচির-মিচির করিয়া আলোচনা করিয়া চলিয়াছিল দলবদ্ধ সারিকা পাখীর মত। অকস্মাৎ একটি মেয়ে আপনাদের ভাষায় বলিয়া উঠিল, দেখ্ দেখ্, রাঙাবাবুর মুখখানা কেমন হইছে দেখ্!

সবিস্ময়ে আর একটি মেয়ে বলিয়া উঠিল, জেঙ্গেৎ-আরা (অর্থাৎ টকটকে রাঙা)! উ বাবা রে!

অহীন্দ্র আবার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, দুঃখে ক্রোধে তাহার মনের মধ্যে একটা আলোড়ন জাগিয়া উঠিল। সেই দীর্ঘতনু মুখরা মেয়েটিকে তাহার বড় ভাল লাগিত, তাহার পরিণতি শেষে এই হইল? আর তাহাদেরই অধিকৃত ভূমির মধ্যে একজন আগন্তুক ধনের দর্পে এমনি করিয়া অত্যাচার করিল সরল নিরীহ জাতির নারীর উপর?

মাথার মধ্যে সে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিল, রক্তের চাপে মাথাটা যেন ভারী হইয়া উঠিতেছে।

একটি প্রৌঢ়া মেয়ে বলিল, হা বাবু, কেনে তুরা ওই সায়েবটোকে ইখানে কল বোসাতে দিলি? ওই মেয়েটোকে উ জোর ক'রে বশ করলে। উয়ার ভয়ে কেউ কিছু বলতে লারলে।

অহীন্দ্রের স্থিরদৃষ্টি একটি স্থানেই আবদ্ধ হইয়া ছিল, তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে অতীতের ছবি ভাসিয়া যাইতেছিল, সবই ওই সারী ও কমল মাঝির স্মৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট। তাহার মনে পড়িল, ওই সম্মুখের উঠানে যেখানে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া আছে, ওইখানেই প্রথম দিন সে আসিয়া বসিয়াছিল। তখন চারিপাশে ছিল কাশ ও বেনাবন। সম্মুখে উপু হইয়া একখানা বিরাট পাথরের মত বসিয়া ছিল কমল। আর সম্মুখেই পরস্পরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল মেয়েগুলি, ঠিক মাঝখানে ছিল সারী।

বৃদ্ধা বলিয়াই চলিয়াছিল, আবার এই দেখ, আমাদের জমিগুলি উ সব কেড়ে লিছে।

অহীন্দ্র যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, কেড়ে নিচ্ছে?

তাহার এই গর্জ্জনে সমস্ত দলটি চমকিয়া উঠিল, অহীন্দ্রকে এমন রূপে তাহারা কখনও তো দেখেই নাই, এমন কি তাহার মধ্যে এমন

রূপের প্রকাশকেও তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। যে প্রৌঢ়াটি কথা বলিতেছিল, সেও ভয়ে চুপ করিয়া গেল। অহীন্দ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে আবার প্রশ্ন করিল, জমি কেড়ে নিচ্ছে কি মেঝেন?

ভয়ে ভয়ে প্রৌঢ়া বলিল, বুলছে, তুদের কাছে আমি টাকা পাব। জমিগুলা আমাকে দিতে হবে। লইলে লালিশ করব।

টাকা পাবে? কিসের টাকা?

ওই যি চিবাস মোড়ল, উয়ার কাছে আমরা সোব ধান খেতম বর্ষাতে, তাই চিবাস খত ক'রে লিলে ধানের দামে। উহার কাছ হ'তে উই সায়েব আবার কিনে লিলে খতগুলান। তাথেই বুলছে, জমিগুলা দে, তুদিকে আরও টাকা দিব, খতও শোধ ক'রে লিব। লইলে লালিশ করব।

করুক নালিশ, খবরদার তোরা জমি লিখে দিবি না। যে টাকা পাবে, সে আমরা শোধ করে দেব।

মেয়েটি হতভম্বের মত খানিকক্ষণ অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জমি যে বাবু লিলে।

লিখে নিলে?

হেঁ বাবু। আজকে সোঁকালে মরদগুলাকে লিয়ে শহরে পাঠায়ে দিলে তুদের সেই মজুমদারের সোঙ্গে। হাকিমের ছামুতে টিপছাপ লিবে, রেজষ্টালি ক'রে লিবে।

অহীন্দ্র অনুশোচনায় অস্থির হইয়া উঠিয়া, বলিল, ছি ছি ছি! তোরা দিলি কেন? আমাদের ওখানে গেলি না কেন?

মেয়েটি সকরুণ স্বরে বলিল, উ যি বুলতে বারণ করলে রাঙাবাবু! উয়াকে দেখলে যে আমরা ডরে ম'রে যাই। পাহাড়ে চিতির ছামুতে ছাগল ভেড়ার মোতন আমরা লড়া-চড়া করতে লারি বাবু।

সমবেত সকলেই যেন এতক্ষণ উদ্বেগে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া

ছিল, প্রৌঢ়ার কথা শেষ হইতেই দুঃখে হতাশায় দীর্ঘ প্রক্ষেপে সে নিশ্বাস তাহারা ত্যাগ করিল। মৃদুস্বরে আক্ষেপ করিয়া দুই-চারিজন বলিয়া উঠিল, আঃ আঃ! হায় রে!

অহীন্দ্রের চোখের উপর চকিতে ভাসিয়া উঠিল, সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সম্মুখেই একটা স্থানেই একটা বিরাট অজগরের মৃতদেহ, নিস্পন্দ চিত্রিত মাংসস্তূপ। ঠিক ওইখানেই সেটা সেদিন পড়িয়া ছিল, তীরে তীরে বধ করিয়াছিল সেটাকে সারীর স্বামী। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়াই অনুভব করিল, সর্ব্বশরীর তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে! মাথাটা যেন অবরুদ্ধ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতেছে।

* * *

এমন দুর্দ্দমনীয় ক্রোধের অস্থিরতা সে জীবনে অনুভব করে নাই; দুই কান দিয়া আগুন বাহির হইতেছে, শীতের কনকনে বাতাসের স্পর্শেও আরাম বোধ হইতেছে। রগের শিরা দুইটা দপদপ করিয়া স্পন্দিত হইতেছে। বার বার তার ইচ্ছা হইতেছিল, ওই কলের মালিকের সম্মুখে গিয়া মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইতে। একবার খানিকটা অগ্রসরও হইয়াছিল, কিন্তু পথ হইতেই ফিরিল; এই অবস্থার মধ্যেও তাহার শৈশব হইতে মায়ের দৃষ্টান্তে অভ্যাস করা আত্মসংযম তাহাকে নিবৃত্ত করিল। আরও একটা চিন্তা তাহার পথরোধ করিল, সে তাহাদের বংশপ্রচলিত মর্য্যাদা-রীতি। সে রীতি-পদ্ধতি অনুয়ায়ী অহীন্দ্রের এমন করিয়া বিমলবাবুর ওখানে যাওয়া চলে না। চক্রবর্ত্তীদের আসনের সম্মুখেই ওই কলওয়ালাকে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরিয়াছে। শীতের কালিন্দীর বালুকাময় তটভূমি ধরিয়া একটা নির্জ্জন স্থানে আসিয়া সে বসিল। সম্মুখেই পশ্চিম দিকে অপরাহ্নের সূর্য্য দিকচক্ররেখার দিকে দ্রুত নামিয়া চলিয়াছে, ইহারই মধ্যে শুকতারাটি ক্ষীণ প্রভায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতেছিল ওই কলওয়ালার অত্যাচারের কথা। নিরীহ সরল জাতির নারী কাড়িয়া লইয়াছে, ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। আর তাহাদের পৃথিবীতে আছে কি? আর কি অপদার্থ ভীরু জাতি এই সাঁওতালগুলা! তীর ধনুক লইয়া কারবার করে, বুনো শূকর মারিয়া খায়। কুমীর মারে, বাঘও নিস্তার পায় না, অতি কদর্য্য ভয়াল অজগর, ওই সারীর স্বামীই সে অজগরটাকে বধ করিয়াছিল; আর এটাকে পারিল না! ওই সাঁওতাল রমণীটা তো মিথ্যা বলে নাই, অর্থের শক্তিতে, বুদ্ধির কুটিলতায় ও অজগরই বটে; পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া পেষণে পেষণে রক্তহীন হত্যা করিয়া ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে থাকে! অজগরই বটে! সারীর স্বামী এ অজগরটাকে বধ করিতে পারিল না? এমনি ধারার অত্যন্ত নিষ্ঠুর কামনা তাহার মাথার মধ্যে যেন চিতাগ্নিশিখার মত পাক খাইয়া খাইয়া ফিরিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বালুরাশি ভাঙিয়া কালিন্দীর ক্ষীণ জলস্রোতের কিনারায় আসিয়া আঁজলা আঁজলা জল মাথায় মুখে দিয়া ধুইয়া ফেলিল। কনকনে ঠাণ্ডা জলের উপর শীতের বাতাসের স্পর্শে এবার একটু শীত বোধ করিল। মস্তিষ্ক যেন এতক্ষণে সুস্থ হইয়া আসিতেছে। বেশ পরিস্ফুট কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, আঃ!

ধীরে ধীরে সে বালির উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিল। উঃ, কি কঠিন ক্রোধই না তাহার হইয়াছিল! ওই লোকটার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলে আজ একটা অঘটন ঘটিয়া যাইত। কিন্তু এই যে অন্যায় অত্যাচার, ধনদর্পিত স্বেচ্ছাচার—স্বেচ্ছাচার, কেন, ব্যভিচার, ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। করিতে যে সে ধর্ম্মত ন্যায়ত বাধ্য। ওই নিরীহ সাঁওতালগুলি তাহাদেরই প্রজা, শুধু প্রজাই নয়, তাহার পিতামহ হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহাদের বংশকে উহারা দেবতার মত মান্য করে।

শুধু তাই বলিয়াই বা কেন? মানুষ হিসাবে তাহার কর্ত্তব্য। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করার অধিকারই মানুষের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। সকল ব্যথিতের বেদনায় ব্যথিতা অশ্রুমুখী মায়ের মুখ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, তাহার মা ননী পালের মৃত্যুর জন্য কাঁদেন, অথচ পুত্রের দ্বীপান্তরের আদেশ অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করেন।

অকস্মাৎ পাশের বেনাবন আন্দোলিত হইয়া উঠিতেই সে ঈষৎ চকিত হইয়া উঠিল। চরের এই খানিকটা অংশের বেনাবন এখনও সাফ হয় নাই। বেনাবনের ও-পাশেই চরের উপর সারি সারি ইঁটের পাঁজা; ওগুলিই এখন সরীসৃপ ও বন্যজন্তুদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া একটু সরিয়া অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আত্মরক্ষার্থে একটা পাথরের নুড়িও নদীর বালি হইতে কুড়াইয়া লইল। জানোয়ার নয়, মানুষ। বেনাবনের অন্তরালে একেবারে সম্মুখেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সাদা কাপড় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অহীন্দ্র হাতের ঢেলাটা ফেলিয়া দিয়া আবার ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইল। তাহার মনে পড়িল, রবীন্দ্রনাথের "গান্ধারীর আবেদনের" কথা। পাপে আসক্ত পুত্রের প্রতি অভিশাপের বজ্র নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় চোখে তাঁহার জল আসিয়াছে। কৃষ্ণার লাঞ্ছনার চেয়ে কৃষ্ণকায়া হতভাগিনী সারীর লাঞ্ছনা তো কম নয়!

রাঙাবাবু! পিছন হইতে মৃদুস্বরে কে ডাকিল, রাঙাবাবু!

অহীন্দ্র পিছন ফিরিয়া দেখিল, বেনাবনের পটভূমির গায়ে দাঁড়াইয়া সারী, হাতে দুইটি গাঢ় লাল রঙের ফুল। মুহূর্ত্তে তীব্র কঠিন ক্রোধে আবার তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত স্নায়ুগুলি গুণ-দেওয়া ধনুকের ছিলার মত টান হইয়া টঙ্কার দিয়া উঠিল। দুর্নীতিপরায়ণা মেয়েটার

উপর ক্রোধের তাহার সীমা রহিল না। তাহার চোখে পড়িল না, সারী কত শীর্ণ হইয়া গিয়াছে ; তাহার কালো রঙের উপরও চোখের কোলে গাঢ়তর কালির রেখায় আঁকা গভীর ক্লান্তির অতি স্পষ্ট ছাপটিও সে দেখিতে পাইল না।

সারী হাসিয়া ফেলিল ; তাহার সেই হাসির মধ্যে একটি শঙ্কার আভাস, সে বলিল, আমি দেখলম আপোনাকে ; নদীর বালিতে বালিতে রাঙা আগুনের পারা মানুষ, তখুনি চিনতে পারলম। ফুল নিয়ে এলম। কথা বলিতে বলিতেই সে কৃষ্ণাভ-রাঙা মখমলের রঙের গোলাপ ফুল দুইটি তাহার দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিল। অহীন্দ্র সে-দিকে দৃষ্টিপাতই করিল না, ভ্রূকে স্পর্শ করিয়া প্রসারিত তাহার অতি তীব্র দৃষ্টি সারীর মুখের উপরেই স্থিরভাবে নিবদ্ধ ছিল। অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত লৌহশলাকার মত সে-দৃষ্টি মর্ম্মঘাতী তীক্ষ্ণ। সারী সভয়ে হাতটি গুটাইয়া লইয়া চরমদণ্ডে দণ্ডিতা অপরাধিনীর মত নীরবে বিহ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নিষ্করুণ কঠিন কণ্ঠে এতক্ষণে অহীন্দ্র বলিল, স'রে যা আমার সুমুখ থেকে। তোর লজ্জা করে না মানুষের সামনে দাঁড়াতে? যা এখান থেকে।

সারীর চোখ হইতে দুইটি অশ্রুর ধারা গাল বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। ভয়ার্ত্ত বিহ্বলতার মধ্যেও সে অস্ফুট স্বরে বলিল, আমাকে ঘরের ভিতর এই এত বড় ছুরি দেখালেক বাবু, কাঁড়ার চাবুক ক'রে আমাকে মারে, ওগো রাঙাবাবু গো!

অহীন্দ্র অসহিষ্ণু হইয়া তীব্রস্বরে বলিল, যা যা, এখান থেকে যা বলছি।

সারী আর সাহস করিল না, ক্লান্ত বাহুবিক্ষেপে বেনাবন ঠেলিয়া তাহারই মধ্যে ডুবিয়া গেল।

*　　*　　*　　*

সারী চলিয়া গেল। আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অহীন্দ্র আবার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বেড়াইতেও আর ভাল লাগিতেছে না; সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্য দিয়া বুকের আবেগ অনেকটা বাহির হইয়া আসিল কাঁপিতে কাঁপিতে, যেন কত অফুরন্ত কান্না সে কাঁদিয়াছে। সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত চোখ বুজিয়া ভাবিয়া লইয়া সে আবার কালিন্দীর জলস্রোতের কিনারায় আসিয়া চোখ-কান আর একবার ধুইয়া ফেলিল। ধুইয়া সেইখানেই সে বসিল, প্রয়োজন হইলে আবার একবার মাথা ধুইয়া ফেলিবে। মাথার মধ্যে ক্রোধের যে এমন যন্ত্রণা হয় সে তাহা জানিত না। জ্বরোত্তপ্ত মস্তিষ্কের যন্ত্রণার চেয়ে এ-যন্ত্রণা তো কোন অংশে কম নয়! তাহার মনে পড়িল, আরও একদিন ক্রোধে তাহার মাথা ধরিয়াছিল। নবীন বাগ্দী ও রংলাল মোড়ল তাহাকে বলিয়াছিল, আইনে পান তো লেবেন সেলামী। তাহার মা সেদিন সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে সে যন্ত্রণার উপশম হইয়াছিল। সেদিনের যন্ত্রণা আজিকার যন্ত্রণার তুলনায় নগণ্য তুচ্ছ। আজও সে মায়ের হাতের স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। এমন কোমল শান্ত স্পর্শ মায়ের হাতের, আর এত শীতল সে হাত! সে বাড়ী যাইবার জন্যই উঠিয়া পড়িল।

কিছুদূর আসিতেই দেখা হইল অমলের সঙ্গে। অমল বলিল, বাঃ, বেশ। খুঁজে খুঁজে হয়রান তোমাকে—যাকে বলে গরু-খোঁজা তাই। পরমুহূর্ত্তেই সে বিস্ময়মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাঃ, আকাশের গোধূলি যে তোমার মুখে নেমেছে হে! ওঃ, সো বিউটিফুল ইউ লুক! মুখে যেন লাল রুজ মেখেছ মনে হচ্ছে। না, রক্তসন্ধ্যাই হবে আরও মিষ্টি—

অহীন্দ্র বলিল, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার অমল। অত্যন্ত রাগে আমার ভয়ঙ্কর মাথা ধ'রে উঠেছে।

রাগে? তুমি আবার রাগ করতে শিখলে কবে?

আজই। ব'স, বলি।

ধীরে ধীরে সমস্ত বলিয়া সে বলিল, এরই মধ্যে সাঁওতালদের অবস্থা যা হয়েছে, সে কি বলব। মাঠগুলো প'ড়ে ধুধু করছে। তাদের পাড়াতে সে গান নেই, আনন্দ নেই। তাদের মুখের হাসি যেন ফুরিয়ে গেছে। অমল, তাদের মেয়েদের ওপর পর্য্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করেছে। এর প্রতিকার করতেই হবে।

অমল ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, আজই পড়ছিলাম গোল্ডস্মিথের Deserted Village।—বলিয়া সে আবৃত্তি করিয়া গেল—

Ill fares the land, to hastening ills a prey
Where wealth accumulates, and men decay;
Princes and lords may flourish, or may fade
A breath can make them, as a breath has made;
But a bold Peasantry, their country's pride
When once destroyed, can never be supplied.

অহীন্দ্রেরও মনে পড়িয়া গেল। স্মৃতি-স্মরণের মধ্যে আবৃত্তি করিতে করিতে স্ফুটস্বরে আবৃত্তি করিয়া উঠিল—

His best companions, innocence and health,
And his best riches, ignorance of wealth.

ঠিক ওই সাঁওতালদের ছবি। ওদের বাঁচাতেই হবে অমল, bold peasantryকে রক্ষা করতেই হবে।

অমল বলিল, চল, আজ বাবাকে গিয়ে বলি। বাবাও লোকটার ওপর খুব চ'টে আছেন। কালিন্দীর ওই বাঁধটা, ওই যে পাম্পে

ক'রে জল তুলছে, ওটা নিয়ে বোধ হয় শিগগির একটা গোলমাল হবে। ফৌজদারিই হবে ব'লে মনে হচ্ছে।

অহীন্দ্র বার বার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, নো নো অমল, নট অ্যাজ এ প্রিন্স অর এ লর্ড, জমিদার বা ধনী হিসেবে নয়। মানুষ হিসেবে মানুষের দুঃখ দূর করতে হবে। জমিদার আর কলওয়ালার তফাত কোথায়?

অমল বিস্মিত হইয়া অহীন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকার পর নদীর বালির উপর অর্দ্ধশায়িত হইয়া অহীন্দ্র যেন আপনাকে এলাইয়া দিল, এমন আকস্মিক উগ্র উত্তেজনার ফলে তাহার দেহ ও মন যেন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অমল বলিল, এ কি, শুয়ে পড়লে যে। চল, বাড়ী চল।

অহীন্দ্র ক্লান্তির একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, চল।

২৮

অমলের মুখে অহীন্দ্রের মাথা ধরার সংবাদ এবং অপরাহ্ণের সমস্ত ঘটনার কথা শুনিয়া হেমাঙ্গিনী মাত্রাতিরিক্তরূপে চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। রায় তর্পণের আসনে নীরবে জপে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বসিয়াই কথা হইতেছিল, তাঁহার ধ্যানগম্ভীর মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; বিশেষ একটি উপলব্ধির ভঙ্গিতেই হাসির মৃদুতার সহিত সমতা রাখিয়া মাথাটি বার কয়েক দুলিয়া উঠিল।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, অহিনের তো রাগ কখনও দেখি নি। ওর স্বভাব হ'ল ওর মায়ের মত।

অমল হাসিয়া বলিল, পূর্ব্বে কখনও রাগ হয় নি ব'লে পরেও কখনও রাগ হতে পারে না, এ তো তোমার অদ্ভুত যুক্তি মা!

হেমাঙ্গিনী দৃঢ় স্বরে বলিলেন, না, রাগ করতে পারে না। এখন মায়ের ছেলে, সে কারও ওপর রাগ করবে কেন? সুনীতির দয়ামায়ার কথা তোরা জানিস নে, গোটা পৃথিবীর ওপর তার মায়া ছড়ানো আছে। তার ছেলে—

মায়ের স্বভাব কন্যার প্রাপ্য, গিন্নী, ছেলে পাবে পৈত্রিক স্বভাব। তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, অহীন্দ্র হ'ল শাক্ত জমিদার-বংশের সন্তান! তার স্বভাব হবে সিংহের মত। দুর্ব্বলকে সে স্পর্শ করবে না, যুদ্ধ হবে তার সবলের সঙ্গে। অহীন্দ্রের তেজস্বিতায় আমি খুব খুশী হয়েছি। তারা, তারা, মা!—রায়ের জপের এক পর্য্যায় শেষ হইয়াছিল, সেই অবসরে তিনি এই কথা কয়টি বলিয়া কারণ-পাত্র পুনরায় পূর্ণ করিয়া লইয়া ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন।

হেমাঙ্গিনী কিন্তু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিলেন, স্বামীর কথাগুলি তাঁহার ভাল লাগিল না। বলিলেন, তোমাদের ওই এক ধারার কথা। শাক্ত জমিদার-বংশের ছেলে হ'লে তাকে রাগ ক'রে মাথা-ধরাতে হবে, কিংবা দাঙ্গাহাঙ্গামা করতে হবে কেন শুনি? এমন কিছু শাস্ত্রের নিয়ম আছে নাকি?

ক্রিয়ায় নিযুক্ত রায় কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু মুখে তাঁহার মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ওদের গুষ্টির রাগকে আমার বড় ভয় করে বাপু। ওর বাপের রাগের সে থমথমে মুখ মনে হ'লে হাত-পা যেন গুটিয়ে আসে।

রায়ের মুখও গম্ভীর হইয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী বলিয়াই চলিয়াছিলেন, অহিনের এখন থেকে এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানোই বা কেন? সে এখন পড়ছে প'ড়ে যাক। বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার, তুমি রয়েছ, যেমনই অসুস্থ হোন—তার বাপ রয়েছেন, সে-সব তাঁরা করবেন।

বলিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, চল্, তুই আমার সঙ্গে চল্, একবার দেখে আসি, আর ব'লে আসি! উমিটা কোথায় গেল? সেও চলুক।

*   *   *

অহীন্দ্র একখানা ডেক-চেয়ারে চোখ বুজিয়া ক্লান্তভাবে হেলান দিয়া শুইয়া ছিল। পদশব্দে চোখ খুলিয়া সে দেখিল; তাহার মা, এবং মায়ের পিছনে হেমাঙ্গিনী ও অমল। ব্যস্ত হইয়া সে উঠিবার উপক্রম করিল, হেমাঙ্গিনী বলিলেন, না, না, উঠতে হবে না। তোমার শরীর খারাপ হয়ে রয়েছে, শুয়ে থাক তুমি। তারপর, তুমি নাকি এত রাগ করেছিলে যে, তোমার মাথা ধ'রে উঠেছে? ছি বাবা, রাগ চণ্ডাল, তাকে এত প্রশ্রয় দিও না। যে-মায়ের ছেলে তুমি তাতে রাগ তোমার শরীরে থাকাই উচিত নয়।

অহীন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনারা জানেন না, কি অমানুষিক অত্যাচার ওই কলওয়ালাটি করেছে ওই নিরীহ সাঁওতাল-দের ওপর।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বেশ তো, তার জন্যে তোমার বাবা রয়েছেন, তোমার—। বলিয়াই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মামা বলা তো আর চলবে না, শ্বশুর বলতে হবে; তাই বলি, তোমার শ্বশুর রয়েছেন, তাঁরা তার প্রতিকার নিশ্চয় করবেন। গরিব প্রজা, তাদের বাঁচাতে হবে বই কি। এটা তো জমিদারের ধর্ম্ম। যত কিছু দোষ রায়হাটের বাবুদের থাক, ও-ধর্ম্ম তাঁরা কখনও অবহেলা করেন না। তোমার এখন পড়ার সময়, তুমি লেখাপড়া কর।

সুনীতি বলিলেন, আমি বলি কি অহিন, আমাদের খাসে যে জমিটা আছে, যেটা সাঁওতালেরাই ভাগে চাষ করছে, ওইটে ওদের বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়া হোক। তা হ'লে ওদের দুঃখও ঘুচবে, আর কলের

মালিককে বুঝিয়ে ব'লে দিলেই হবে যে, ওটাতে যেন আর তিনি হাত না দেন।

অমল হাসিয়া এবার বলিল, পিসীমার ধর্ম্মটি কিন্তু বড় ভাল। ও ধর্ম্মের মহিমায় সকল সমস্যার সমাধান জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়।

সুনীতি লজ্জা পাইলেন, কিন্তু হেমাঙ্গিনী বলিলেন, 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার!' গোঁ-ধরা শাক্ত-তান্ত্রিকের বংশ তোমাদের, তোমরা আর এ ধর্ম্মের মহিমা কি বুঝবে বল? ওরে, ও-ধর্ম্ম যদি সকলে বুঝত, তবে কি পৃথিবীতে এত দুঃখ থাকত?

অমল হাসিয়াই উত্তর দিল, সে তো অস্বীকার করছি না মা, কিন্তু পিসীমার ধর্ম্মে মুশকিল কি জান? মুশকিল হচ্ছে, নিঃসম্বল অবস্থায় আর ও-ধর্ম্ম নিয়ে চলা যায় না। মানে, ব্রহ্মাণ্ড যাঁর উদরভাণ্ড, সেই তিনি যখন ননীগোপাল সেজে ননীলোলুপ হয়ে ওঠেন, তখন যশোদাকে মুশকিলে প'ড়ে ও-ধর্ম্ম ছেড়ে বিপরীত ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হয়, দায়ে প'ড়ে তখন ননীগোপালকে খুঁটির সঙ্গে বাঁধতে হয়। পৃথিবীতে মানুষ মাত্রেই যে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর বিষয়-গোপাল—বিপদ যে ওইখানে।

অমলের কথার ভঙ্গিতে সকলেই হাসিল, হাসিল না কেবল অহীন্দ্র, সে যেমন গম্ভীর মুখে অবসন্ন ভঙ্গিতে ডেক-চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া ছিল, তেমনি ভাবেই রহিল। হেমাঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তুই কিন্তু ভারী জ্যাঠা হয়েছিস অমল।

অহীন্দ্র চোখ বুজিয়াই ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, তুমি ভুল বুঝেছ অমল, মায়ের ধর্ম্ম যশোদার ধর্ম্ম নয়, মায়ের ধর্ম্ম গান্ধারীর ধর্ম্ম। দাদার গুলিতে যখন ননী পাল ম'ল, তখন মা ননী পালের জন্যে কেঁদেছিলেন, কিন্তু দাদার দ্বীপান্তরের হুকুম যেদিন হ'ল, এক ফোঁটা চোখের জল তিনি ফেলেন নি। শুধু পাথরের মূর্ত্তির মত ব'সে রইলেন।

লজ্জা এবং দুঃখ দুইই একসঙ্গে সুনীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, সেই তো বাবা, হাজার অপরাধ করলেও তোমার মা কখনও কারও ওপর রাগ করেন না। অন্যায় ক'রেও কেউ দণ্ড পেলেও তোমার মা তাঁর জন্যে কাঁদেন। সেই মায়ের ছেলে তুমি, রাগ করা তো তোমার সাজে না।

অহীন্দ্র নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল হ্যাঁ, রাগ করাটা আমার অন্যায় হয়েছে। কিন্তু রাগ তো আমি ইচ্ছে ক'রে করি নি, হঠাৎ যেন কেমন হয়ে গেলাম আমি। তা নইলে অত্যাচার অবিচার কোথায় বা নেই বলুন? ধনী দরিদ্রও পৃথিবীতে সর্ব্বত্র, অত্যাচার অবিচারও সর্ব্বত্র। ক'জনের ওপর রাগ করব?

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, না না না, তা বললে চলবে কেন? যতটুকু তোমার আয়ত্তের মধ্যে, তার ভেতর অন্যায়ের প্রতিকার করতে হবে বৈ কি। আর সে হবেও; লোকটিকে ভালমত শিক্ষা দেবার জন্যে উনি উঠে-প'ড়ে লেগেছেন। আমাদের তরফ থেকে যাতে অন্যায় না হয়, সেজন্যে আমি বার বার ক'রে বলেছি। বলেছি, ও-লোকটি অন্যায় করেছে, তাকে শাস্তি দিতে হলে ন্যায়পথে চ'লে শাস্তি দিতে হবে, কৌশল অবলম্বন করতে পাবে না।

অহীন্দ্র এ-কথার কোন জবাব দিল না, নীরবে চোখ বুজিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া শুইয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, মাথা কি এখনও ধ'রে রয়েছে তোমার? এক কাজ কর, ওডিকলোনের একটা পটি দাও কপালে, না হয় পিপারমেণ্ট জলে গুলে কপালে বুলিয়ে নাও। তারপর সুনীতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, চল, আমরা যাই, একবার চক্রবর্ত্তী মশায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি চল।

সুনীতি গভীর চিন্তায় দিশাহারা হইয়া বলিলেন, আমার বড় ভয় হয় দিদি। ওই চরটা সর্ব্বনাশা চর; যখনই চর নিয়ে কোন হাঙ্গামা

বাধে, আমার বুক থরথর ক'রে কেঁপে ওঠে। অহি আবার চর নিয়ে যে কি করবে, ওর ভাবগতিক আমার ভাল লাগল না দিদি। কেমন উদাসী মন হয়ে গেছে দেখলেন ?

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিলেন, ও তুমি কিছু ভেবো না সুনীতি, ও সব ঠিক হয়ে যাবে। উমার আমার স্বামিভাগ্য খুব ভাল ; তা ছাড়া উমা একালের লেখাপড়া-জানা চালাক মেয়ে। বিয়ে হোক না, কেমন মন-উদাসী থাকে, দেখব। দেখবে ? এক্ষুনি বাবার মন ভাল ক'রে দিচ্ছি। বলিয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, অমল !

অমল আসিতেই বলিলেন, একটা কাজ যে ভুলেছি বাবা ! এক্ষুনি তোকে বাড়ী যেতে হবে, গিয়ে স্যাকরাকে ব'লে পাঠাতে হবে যে, উমার রুলির প্যাটার্নটা অন্য রকম হবে ; আজই সেটা আরম্ভ করবার কথা, সেটা যেন আরম্ভ না করে। কাল সকালে আমার কাছে এলে আমি সব বুঝিয়ে দেব। তিনি ইচ্ছা করিয়াই অহীন্দ্রের নিকট হইতে সরাইয়া অমলকে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

অমল চলিয়া গেল ; হেমাঙ্গিনী ওডিকলোনের জল তৈয়ারি করিয়া ডাকিলেন, উমা !

উমা মানদা ঝির পাল্লায় পড়িয়াছিল ; ভাবী বউদিদিকে লইয়া মানদা ছোটদাদাবাবুর বাল্যকালের কথা বলিয়া নিজের গুরুত্ব এবং প্রবীণত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। উমারও শুনিতে মন্দ লাগিতেছিল না। মায়ের আহ্বান শুনিয়া সে উপরে আসিয়া সুনীতি ও হেমাঙ্গিনীর সম্মুখে দাঁড়াইল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন এই ওডিকলোনের জলটা আর এই ন্যাকড়ার ফালিটা দিয়ে আয় তো মা। আমরা দুজনে চক্রবর্ত্তী মশায়ের ঘরে যাচ্ছি। তুই বরং ন্যাকড়াটা ভিজিয়ে কপালে একটা পটিই লাগিয়ে দিয়ে আস্‌বি। বড্ড মাথা ধরেছে অহির।

উমা লজ্জায় স্থাণুর মত হইয়া না গেলেও সঙ্কুচিত অনেকটুকুই হইল। রক্তাভ মুখে সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, হেমাঙ্গিনী ওডিকলোনের পাত্রটি হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, তোমার তো লজ্জা করলে চলবে না মা; বাড়ীতে একটি ননদ-দেওর নেই যে, তাকে পাঠিয়ে দেবেন তোমার শাশুড়ী। যাও, দিয়ে এস।

উমা পাত্রটি হাতে করিয়া চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী সুনীতির দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলেন, এ কি আর আমাদের কাল আছে ভাই? সেকালে আর একালে অনেক তফাত।

সুনীতি অতি মৃদু ম্লান হাসি হাসিলেন, বলিলেন, ধরণটা কিন্তু খুব ভাল নয় দিদি।

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে হেমাঙ্গিনীর ইচ্ছা হইতেছিল, মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়েন, কিন্তু সুনীতির কথা শুনিয়া তিনি সংযত হইয়া বসিলেন, তারপর বলিলেন, ভাল আর মন্দ ভাই, যে কালের যে ধারা। এর পর আবার কত হবে, নাতি-নাতনীর আমলে বেঁচে থাকলে সেও দেখতে হবে। এ প্রসঙ্গ শেষ করিয়া ক্ষণিক স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন, চল, চক্রবর্ত্তী মশায়কে একবার দেখে আসি। আজই একবার দেখা হয়েছে, তবু যখন এসেছি, চল।

অহীন্দ্র চোখ বুজিয়াই শুইয়া ছিল, ঠিক ঘুমায় নাই—কিন্তু সজাগও ঠিক ছিল না। জাগ্রত পৃথিবীর সকল সংস্পর্শকে দূরে সরাইয়া দিয়া সে যেন আপন অন্তরের চিন্তালোকের গভীর-গর্ভ রুদ্ধদ্বার এক কক্ষের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। অকস্মাৎ কপালের উপর শীতল একটি স্পর্শ যেন করাঘাত করিয়া তাহাকে বাহির হইতে ডাকিল। উমা আসিয়া তাহাকে ঘুমন্তই মনে করিয়াছিল; ডাকিয়া ঘুম না ভাঙাইয়া সন্তর্পণে ওডিকলোনের পটিটা কপালে বসাইয়া দিয়াছিল।

অহীন্দ্র যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখ মেলিয়া উমার মুখের দিকে চাহিল।

উমা লজ্জা পাইল, আরক্তিম মুখে বলিল, ওডিকলোনের পটি। আমি ভেবেছিলাম, ঘুম আর ভাঙাব না।

স্মিত হাসিতে অহীন্দ্রের মুখ ঈষৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে বলিল, আমি ঘুমুই নি।

ঘুমোও নি? তবে এমন ভাবে শুয়ে ছিলে যে? মাথা বুঝি খুব ধরেছে?

মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে; কিন্তু মন যেন vacant হয়ে গেছে।

উমা মৃদু হাসিয়া এবার বলিল, সাহেবলোকের কিন্তু এ-রকম দুর্ব্বল হওয়া উচিত নয়। রাগ দুর্ব্বলচিত্তের একটি লক্ষণ।

অহীন্দ্রের মুখের হাসি এবার আরও একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল, কথাটা তোমার মুখে শোভন হ'ল না, হে বাঙালিনী শ্রীমতী উমা দেবী। যেহেতু স্মরণ কর, পুরাকালে পর্ব্বতদুহিতা উমার প্রিয়তম পরম যোগী শঙ্করেরও একদা ক্রোধ হয়েছিল, যে-ক্রোধের অগ্নিতে কাম হয়েছিল ভস্মীভূত।

উমা হাসিয়া বলিল, তুমি কি ওই কলওয়ালাটিকে ভস্মীভূত করতে চাও নাকি?

একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া অহীন্দ্র বলিল, তখন তাই চেয়েছিলাম; কিন্তু আর তা চাই না! একটু আগে মনকে ওই চিন্তা থেকে মুক্ত করবার জন্যে পড়ছিলাম, রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন', তার ক'টা লাইন আমাকে যেন পথ দেখিয়ে দিলে। লাইন ক'টি মুখস্থ হ'য়ে গেছে আমার—

"দণ্ডিতের সাথে—
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ

কোনো ব্যথা নাহি পায়—তারে দণ্ড দান
প্রবলের অত্যাচার।”

আমি লোকটাকে শাস্তি দিতে চাই, তার অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাই, কিন্তু তার ওপর বিদ্বেষ আমি রাখতে চাই না।

অহীন্দ্রের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে উমার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে এ যুগের মেয়ে, তাহার তরুণ মন আদর্শের স্বপ্নে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; অহীন্দ্রের গৌরবে সে গরবিনী হইয়া উঠিয়াছে।

ও-দিকে রামেশ্বরের ঘর হইতে ফিরিয়া নীচে নামিবার পথে সিঁড়ির একটি গোপন স্থানে সুনীতি ও হেমাঙ্গিনী আপনা-আপনিই যেন দাঁড়াইয়া উমা ও অহীন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। হেমাঙ্গিনী আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, সুনীতিকে স্পর্শ করিয়া ফিসফিস করিয়া বলিলেন, দেখলে?

সুনীতি বলিলেন, ফাল্গুনের প্রথমেই দিন ঠিক করুন দিদি। আমার অদৃষ্টকে আমার সর্ব্বদাই ভয় হয়। আমার সম্বলের মধ্যে অহি। উমার হাতে ওর ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

*　　*　　*

হেমাঙ্গিনী উৎসাহে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, রণবাদ্যে উৎসাহিত যুদ্ধের ঘোড়ার মত। ফাল্গুনেই বিবাহ দিবার জন্য তিনিও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিবাহের মধ্যে যেন একটা কল্পলোকের মাদকতা আছে, পাড়া-পড়শী পর্য্যন্ত নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়া মাতিয়া উঠে, এ-ক্ষেত্রে তো মেয়ের মা এবং ছেলের মা। সুনীতিও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। রায়ের মনেও উৎসাহের সীমা ছিল না, রাধারাণীর অন্তর্দ্ধানের লজ্জার ক্ষোভে আগুন ধরিয়া পুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহাতে পূর্ণাহুতি পড়ে নাই। কিন্তু তিনি পুরুষমানুষ, সাত-পাঁচ ভাবিয়া বৈশাখে বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ফাল্গুন ও চৈত্র দুই

মাস জমিদারদের দারুণ ঝঞ্ঝাটের সময়। বাকি-বকেয়া আদায়, বৎসরান্তে আখেরী হিসাব নিকাশ লইয়া মাথা তুলিবার অবসর থাকে না। সেই সব ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া তিনি বৈশাখে বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

কিন্তু হেমাঙ্গিনী কিছুতেই শুনিবেন না, বলিলেন, বোশেখ মাস গরমের সময়, গা প্যাচপ্যাচ করবে ঘামে—

বাধা দিয়া রায় হাসিয়া বলিলেন, আমি নিজে তোমার পাংখা-বরদার হব। পাখা নিয়ে পেছনে পেছনে বাতাস ক'রে ফিরব; তা হ'লে হবে তো?

না। খেয়ে-দেয়ে কোথায় কার বদহজম হবে—

বাড়ীতে একটা ডাক্তার আমি বসিয়ে রাখব, খাওয়ার পর প্রত্যেককে একদাগ হজমী ওষুধ দেওয়া হবে।

হেমাঙ্গিনী রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিলেন, ছেলের মায়ের মতটা তো মানতে হবে। যত খাতিরই তোমাকে সুনীতি করুক, তুমি মেয়ের বাপ, সে ছেলের মা।

রায় হাসিয়া পাঁজি খুলিয়া বসিলেন।

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহেই বিবাহের দিন পাওয়া গেল, শুক্লা প্রয়োদশী তিথি। রায় উৎসব-আয়োজনের ত্রুটি রাখিলেন না; গ্রামস্থ লোক, প্রজা সজ্জন সমস্ত নিমন্ত্রিত হইল।

সাঁওতালদেরও সমস্ত দলটিকে বরযাত্রী যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল। কিন্তু তাহারা কেহ আসিল না।

অচিন্ত্যবাবু আসিয়াছিলেন, তিনি ফিসফিস করিয়া বলিলেন, বারণ ক'রে দিয়েছে মশায়। যে আসবে, তার জরিমানা হবে।

চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর নায়েব বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, বারণ ক'রে দিয়েছে! কে? জরিমানাই বা কে করবে শুনি?

মুখার্জি সাহেব—মিস্টার মুখার্জি।

নায়েব গম্ভীরভাবে ডাকিল, কে রয়েছিস রে, বাগ্দী পাইকদের ডাক্ তো এখানে।

অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, ঠকবেন মশায়, ঠকবেন। এমন কাজটি করবেন না। সাঁওতালদের প্রজাই-স্বত্ব এখন মুখার্জি সায়েবের। তারা এখন মুখার্জি সায়েবের প্রজা। আপনাদের প্রজা হ'ল মুখার্জি সায়েব, সাঁওতালেরা মুখার্জি সাহেবের প্রজা, মজুর, আশ্রিত, তিনিই এখন ওদের মা-বাপ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, সব।

কথাটা অহীন্দ্রের কানেও উঠিল। বরবেশে চতুর্দ্দোলে বসিয়া, কুঞ্চিত ললাটে সে জ্যোৎস্নার আলোকে আলোকিত চরখানির দিকে চাহিয়া দেখিয়া, গভীর বেদনা অনুভব করিল। দলিলের কৌশলে সাঁওতালদের বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল? জাল দলিলে মানুষ বিকাইয়া গেল।

রাঙা ইঁটের তৈয়ারী সুদীর্ঘ চিমনিটা শাসনরত তর্জ্জনীর মত উদ্যত হইয়া আছে।

ও-দিকে সংবাদটা শুনিয়া ইন্দ্র রায় সারাদিনের উপবাসে পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহখানাকে টানিয়া মুহূর্ত্তে সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলিবার বা করিবার পূর্ব্বেই হেমাঙ্গিনী আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, আজ তুমি কিছু করতে পাবে না, আজ আমার উমার বিয়ে।

২৯

ইন্দ্র রায় বউভাত উপলক্ষ করিয়া আবার সাঁওতালদের নিমন্ত্রণ করিলেন।

কিন্তু সে নিমন্ত্রণও সাঁওতালেরা গ্রহণ করিতে সাহস করিল না। শুভার্থী সকলেই নিষেধ করিয়াছিল, হেমাঙ্গিনী বার-বার বলিয়াছিলেন,

দেখ, আমি বারণ করছি, ও তুমি ক'রো না। বিয়ের রাত্রে যখন আসতে দেয় নি ওদের, তখন আবার নেমন্তন্ন ক'রে বেচারাদের বিপদে ফেলা কেন? 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।'

সুনীতি সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, ঝগড়া-বিবাদ ক'রে কাজ নেই দাদা।

ইন্দ্র রায় কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না, চোখ বুজিয়া গভীর চিন্তায় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া অনুরোধ অস্বীকার করিলেন, বলিলেন, উলুখাগড়ার প্রাণ যায় ব'লে দুঃখ করছ, কিন্তু ও মিথ্যে দুঃখ। এমনি ভাবে মরবার জন্যেই উলুখাগড়ার সৃষ্টি। তিনি হাসিলেন।

হেমাঙ্গিনী সুনীতি দুইজনেই ইন্দ্র রায়ের হাসির ভঙ্গি দেখিয়া নীরব হইয়া রহিলেন; ক্ষুরের মতই ক্ষুদ্রপরিসর এবং মর্ম্মান্তিক তীক্ষ্ণধার সে হাসি। ধীরে ধীরে সে হাসিটুকু রায়ের মুখ হইতে মিলাইয়া গেল, গম্ভীরভাবে আবার বলিলেন, এ-সংসারে যার ইজ্জত নেই, তার জাত নেই। এ হ'ল চক্রবর্ত্তী-বাড়ী রায়-বাড়ীর ইজ্জত নিয়ে কথা, এ ব্যাপারে তোমরা কথা ব'লো না।

তিনি ও-পারের চরে নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন, শুধু সাঁওতালদের নিকটই নয়, চরের সকলের নিকট এমন কি বিমলবাবুর নিকট পর্য্যন্ত। নিমন্ত্রণ লইয়া গেল একজন গোমস্তা ও একজন পাইক। বিমলবাবু ব্যতীত সকলের নিকট মৌখিক নিমন্ত্রণই পাঠানো হইল, কেবল বিমলবাবুর নিকট পাঠানো হইল একখানি পত্র।

চূড়া মাঝি বিব্রত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; অন্যান্য সাঁওতালেরা নীরবে চিন্তান্বিত মুখে চূড়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মুখরা মেয়েগুলি শুধু মৃদুস্বরে আপনাদের মধ্যে দুই-চারিটা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল।

গোমস্তাটি বলিল, যাস যেন সব, বুঝলি?

এতক্ষণে চূড়া বলিল, কি ক'রে যাব গো বাবু? দু বেলা খাটতে হছে যি সাহেবের কলে।

গোমস্তা একটু হাসিয়া বলিল, ভাল। যাস নে তা হ'লে। আর কোন কথা না বলিয়া সে চলিয়া আসিল। কিছুদূর সে চলিয়া আসিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে চূড়া তাহাকে ডাকিল, বাবু মশায়! গোমস্তাবাবু!

কি?

বাবু মশায়, সায়েব যি রাগ করেছে গো, বুলছে—তুদের বাড়ী গেলে পরে ই্থান থেকে তাঁড়িয়ে দিবে।

আচ্ছা, তাই বলব আমি কর্ত্তাবাবুকে।

চূড়ার বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, সে বলিল, না গো বাবু মশায়; তা বুলিস না গো; সায়েব রাগ করবে গো।

গোমস্তা কোন উত্তর দিল না, অতি অবজ্ঞা ও ঘৃণার হাসি হাসিয়া সে চলিয়া গেল। চূড়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল, ভয়ে তাহার পা দুইটি ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, আঃ, কেন এ-কথাটা সে উহাকে বলিল?

সাঁওতালেরা আসিল না।

শুধু আসিল না নয়, সন্ধ্যা হইতেই চরের বুকে মাদল, করতাল ও বাঁশীর সমবেত ধ্বনিতে একটি উৎসবের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিল। বিমলবাবু পাকা ব্যবসায়ী লোক; এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে সাঁওতালদের মনঃক্ষুণ্ণতার কথা তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। তিনি অপরাহ্নে তাহাদের ডাকিয়া প্রচুর পরিমাণে মদের এবং দুইটা শূকরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, বলিলেন, খুব নাচগান করতে হবে তোদের।

হাঁড়িয়ার কথা শুনিয়া প্রথমটা কেহ উৎসাহ প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া এ উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিমলবাবু ব্যাপারটা বুঝিয়াও কোন কথা বলিলেন না, একেবারে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট অচিন্ত্যবাবুকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, একখানা দশ টাকার ভাউচার করুন তো। সাঁওতালদের বকশিশ। আর মদের দোকানের ভেণ্ডারকে একখানা স্লিপ লিখে দিন, সাঁওতালদের যে যত খেতে পারে মদ দেয় যেন—আপ-টু টেন রুপিজ।

টাকাটা হাতে পাইয়া সাঁওতালদের মন ঈষৎ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। তারপর মদের দোকানে আসিয়া তাহারা পরস্পরের মধ্যে খানিকটা জোর তর্ক আরম্ভ করিয়া দিল; কেহ কাহারও কথার প্রতিবাদ করিতেছিল না, অথচ উত্তেজিত কলরবে তুমুল তর্ক। সকলেই বলিতেছিল

রাঙাবাবু কি বুলবে?

উয়ার শ্বশুরটি? বাবা রে, বাঘের মতন তাকানি উয়ার! উ কি বুলবে?

রাগ করবে, ধ'রে লিয়ে যাবে। তখুন কি হবে?

ইধারে সায়েব রাগ করছে। বাবা রে, উ তো কম লয়। উয়ার আবার বন্দুক আছে, মেরে ফেলাবে গুলি দিয়ে।

এই তর্কের মধ্যেই মদ আসিয়া পৌঁছিল। কিছুক্ষণ পর তাহাদের তর্ক ভীষণাকার ধারণ করিল, উচ্চকণ্ঠে আস্ফালন করিয়া সকলেই বলিতেছিল, কি করবে রাঙাবাবুর শ্বশুর আমাদের? আমরা উয়াকে মানি না।

আমাদের সায়েব রইছে, উয়াকেই আমরা মানব, হেঁ।

অতঃপর মেয়েদের জন্য প্রকাণ্ড জালাতে করিয়া মদ লইয়া তাহারা

পাড়ায় ফিরিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাদল-করতাল-বাঁশী বাজাইয়া প্রচণ্ড উৎসাহে নাচগান জুড়িয়া দিল।

* * *

ও-দিকে বউভাতের খাওয়ান-দাওয়ানের জের তখনও মেটে নাই, তবে প্রধান অংশ শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এখন কেবল পরিবেশন-কারীর দল ও ঠাকুর-চাকরদের খাওয়ানো হইতেছে। ইন্দ্র রায় নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের খাওয়ানোর তদারক করিতেছেন। মাদল-করতাল-বাঁশীর উচ্ছ্বসিত ধ্বনি আসিয়া কানে প্রবেশ করিতেই তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। মনে মনে ব্যাপারটা তিনি অনুমান করিয়া লইলেন।

অমল কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত ছিল, তাহাকে ডাকিয়া খাওয়ান-দাওয়ানের ভার দিয়া তিনি রামেশ্বরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। রামেশ্বর খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ-দ্বিতীয়ার প্রায়-পূর্ণচন্দ্রের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় আলোকিত উন্মত্ত-সঙ্গীত-মুখর ওই চরটার দিকেই চাহিয়া ছিলেন।

রায় ডাকিলেন, রামেশ্বর!

রামেশ্বর চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কে?

আমি ইন্দ্র!

ইন্দ্র! এস, এস ভাই। খাওয়ান-দাওয়ান সব হয়ে গেল?

হ্যাঁ। আমি নিজে দাঁড়িয়ে সব শেষ ক'রে তোমার কাছে আসছি। যারা কাজকর্ম্ম করেছে, তারাই খাচ্ছে এখন; অমল দাঁড়িয়ে দেখছে সেখানে।

রামেশ্বর অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ডাকিলেন, বউমা! বউমা!

রায় হাসিলেন, উমার শ্বশুর উমাকে ডাকিতেছেন! বধূবেশিনী

উমা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বাবাকে দেখিয়া একটু হাসিল, হাসিয়া সে শ্বশুরের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, আমাকে ডাকছিলেন ?

রামেশ্বর বলিলেন, হ্যাঁ রে বেটী, হ্যাঁ। আমার মা হয়ে তোর কোন বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই! দেখছিস না, কে এসেছেন! সমস্ত দিন তোর বাড়ীতে খাটলেন, এখনও মুখে জল দেন নি। দে, হাত-পা-মুখ ধোবার জল দে। খাবার জায়গা ক'রে দে। এ-ঘরে নয়, অন্য ঘরে— অন্য ঘরে। চকিতে তাঁহার দৃষ্টি একবার আপনার হাত দুইখানির দিকে নিবদ্ধ হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

রায় হাসিয়া বলিলেন, হাত-মুখ আমি ধুয়েছি; খাবার জায়গা করতে নেই, ও থাক!

চকিত হইয়া রামেশ্বর প্রশ্ন করিলেন, কেন ইন্দ্র, খাবার জায়গা করতে নেই কেন?

তুমি একটি মূর্খ। রায় হাসিয়া বলিলেন, কাকে কোলে ক'রে খেতে বসব? দাঁড়াও, আমার দুই ভাইয়ের আগমন হোক, তবে তো!

বার বার ঘাড় নাড়িয়া রায়ের কথা স্বীকার করিয়া রামেশ্বর বলিলেন, বটে, বটে। তুমি যেদিন দাদুভাইকে কোলে নিয়ে খেতে বসবে ইন্দ্র, সেদিন যে আমার ঘরের কি শোভাই হবে হে, আমি সে কল্পনাই করতে পারছি না। কবি কালিদাসও এর উপমা দিয়ে যান নি। কুমার কার্ত্তিকেয়কে গিরিরাজের কোলে দিয়ে তিনি দেখেন নি। সূর্য্যবংশের রাজারা তো পুত্র উপযুক্ত হ'লে গার্হস্থ্যাশ্রমেই থাকতেন না। আমাকেই একটা শ্লোক রচনা করতে হবে দেখছি।

উমা-একালের মেয়ে হইলেও বাঙ্গালীর মেয়ে—সে লজ্জায় ঘামিয়া উঠিতেছিল, লজ্জার রক্তোচ্ছ্বাসে তাহার সুন্দর মুখের প্রসাধন-শুভ্রতাও রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর সারাটা মুখ ভরিয়া বিন্দু বিন্দু ঘাম ইন্দ্র রায় তাহাকে পরিত্রাণ দিলেন, তিনি বলিলেন, উমা, ই

যা মা, তোর শাশুড়ীর খাওয়া-দাওয়া হ'ল কিনা দেখ্। তোর মাকেও বল্, একটু তাড়াতাড়ি সেরে নিতে।

উমা পলাইয়া আসিয়া যেন বাঁচিল, ঘর হইতে বাহির হইয়া দরদালানের নির্জ্জনতায় আসিয়া পুলকিত সলজ্জ হাসিতে তাহার মুখ ভরিয়া উঠিল।

বাড়ীতে বাহিরের দিকের টানা বারান্দায় রেলিঙের উপর মাথা রাখিয়া সুনীতি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেলে তিনি অবসর পাইয়া কাঁদিতে আসিয়াছিলেন মহীনের জন্য।

তাঁহার মহীন—দীর্ঘদেহ, সবলপেশী, উদ্ধতদৃষ্টি, উন্নতশির মহীন্দ্র।

প্রথমে তো তাহারই বধূর কল্যাণঘট কাঁখে করিয়া এ-ঘরে প্রবেশ করিবার কথা। অহীন্দ্রের বিবাহে, তাহারই দৃপ্ত উচ্চ আদেশ-ধ্বনিতে এ-বাড়ীর প্রতিটি কোণ মুখরিত হইয়া থাকিবার কথা।

এ সর্ব্বনাশ না হইলে হতভাগ্য ননী পালও আজ এ-বাড়ীতে খাইয়া হাসিমুখে বলিত, আঃ, খুব খেলাম বাপু।

বেচারা নবীন বাগ্দী আর তাহার সঙ্গী কয়েকজনকে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। সেই অজানা মুসলমান লাঠিয়ালটি যে নবীনের লাঠির আঘাতে মরিয়াছে, সে থাকিলে সেও আজ আসিয়া বকশিশ লইয়া যাইত, লুচি মিষ্টি খাইয়া যাইত।

একটি সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি চন্দ্রালোকিত চরটার দিকে চাহিলেন। আজও সাঁওতালরা খাইতে আসে নাই; কলের মালিকও খাইতে আসেন নাই; ও-বাড়ীর দাদার মুখ থমথমে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর মাদল-করতাল-বাঁশী বাজাইয়া এ উহারা করিতেছে কি? না না না, এটা উহারা বিষম অন্যায় করিতেছে। স্তব্ধ হইয়া তিনি চরটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এত উচ্চ রূঢ় বাজনা কখনও বাজে না। বিরোধ বাধাইতে উহারা কি

বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে? ডঙ্কা বাজাইয়া চরটা যেন যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে! আতঙ্কে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। পায়ের তলায় বাড়ীটা যেন দুলিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে চরটা ঘুরিতেছে।

উমা আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল।

সুনীতি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, উমা? বউমা?

অন্ধকারের মধ্যে মৃদু হাসিয়া উমা বলিল, আপনি খাবেন আসুন মা। পরক্ষণেই এই গিন্নীপনার জন্য লজ্জা অনুভব করিয়া সে বলিল, মা নীচে ডাকছেন আপনাকে। এই মা অর্থে তাহার মা হেমাঙ্গিনী।

সুনীতি যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিচলিত মস্তিষ্কের রক্তের চাপে স্নায়ু-শিরার চাঞ্চল্যে চরটাকে তিনি ঘুরিতে দেখিয়াছেন; ওই মাদল ও করতালের উচ্চ ধ্বনির মধ্যে তিনি যুদ্ধোদ্যমের ঘোষণা শুনিয়াছেন। তাঁহার ধরিত্রীর মত সহিষ্ণু মনও আজ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। এই মুহূর্তেই সম্মুখে বধূকে দেখিয়া সে কম্পন-চাঞ্চল্য যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। অহীন্দ্রের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কোনমতেই তাহাকে সঙ্ঘর্ষের সম্মুখীন হইতে তিনি দিবেন না। যেমন করিয়া হউক তিনি নিবারণ করিবেন। ও-বাড়ীর দাদার পায়ে তিনি উমাকে ফেলিয়া দিবেন। অহীন্দ্রের গৃহদ্বারের দুই বাজুতে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া তিনি নিজে দাঁড়াইবেন।

উমা আবার ডাকিল, মা?

উত্তরে সুনীতি প্রশ্ন করিলেন, অহিন্‌ কোথায় বউমা?

উমা লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। সুনীতি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেলেন।

অহীন্দ্র পড়ার ঘরে বসিয়া ছিল। একখানা মোটা বইয়ের মধ্যে আঙুল পূরিয়া মানদার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে তাহার তিরস্কার শুনিতেছিল।

মানদা তাহাকে তিরস্কার করিতেছিল, না বাপু, এ কিন্তু আপনার ভাল কাজ নয় দাদাবাবু, সে আপনি যাই বলুন—হ্যাঁ। আজকে হ'ল মানুষের জীবনের একটা দিন। আজ পাঁচজনা মেয়েছেলে এসেছে, ঠাট্টা-তামাসা করবে, গান করবে, ছড়া কাটবে, আপনার গান শুনবে সব। ফুলশয্যের দিন। আর আপনি ইয়া মোটা একটা বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে ব'সে রয়েছেন!

অহীন্দ্র কোন উত্তর দিল না, মৃদু হাসিমুখেই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মানদা কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিল, বলি, উঠবেন কি না, বলুন? উঠে আসুন, কাপড় ছাড়বেন, মেয়েরা সব গজগজ করছে।

সুনীতি আসিয়া প্রবেশ করিলেন, মানদা অভিযোগ করিয়া বলিল, এই দেখুন, আজকের দিনে একখানা মোটা বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে ব'সে রয়েছেন। এলাম যদি, তা মানুষের খেয়াল নাই। কি রস যে ওই কালির হিজিবিজির মধ্যে আছে, কে জানে বাপু!

সুনীতি বলিলেন, চল্ তুই মানদা, আমি নিয়ে যাচ্ছি ওকে।

মানদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, নাও, হ'ল। আপনি আবার ধর্ম্মকথা আরম্ভ করুন এখন এক পহর। ও-দিকে মেয়েরা সব চ'লে যাক।

না রে, না। চল্ তুই, আমি এলাম ব'লে ওকে নিয়ে। এই উদ্‌ভ্রান্ত মনেও সুনীতি মানদার স্নেহের শাসনে হাসিয়া আনুগত্য না জানাইয়া পারিলেন না।

অহীন্দ্রও মনে করিল, সুনীতি তাহাকে ডাকিতেই আসিয়াছেন, সে বইখানার মধ্যে সুদৃশ্য কাগজের লম্বা একটি টুকরা দিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, বলিল, যাচ্ছি মা আমি। তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল, বইখানা বড় ভাল বই, পড়তে ব'সে আর ছাড়তে ইচ্ছে যায় না।

কি বই রে?

পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর লেখা মা, জাতিতে তিনি জার্ম্মান, তাঁর নাম কার্ল মার্ক্‌স্‌। আমরা যাদের বলি ঋষি, তিনি তাই। পৃথিবীর এই যে ছোট-বড় ভেদাভেদ, অসংখ্য কোটি লোকের দারিদ্র্য আর মুষ্টিমেয় ধনীর বিলাস, রাজ্য-সম্পদ নিয়ে এই যে হিংস্র পশুর মত মানুষের কাড়াকাড়ি, তিনি তার কারণ নির্দ্ধারণ করেছেন এবং নিবারণের উপায়-পথ নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন।

সুনীতি মুগ্ধবিস্ময়ে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। পৃথিবী জুড়িয়া সম্পদ লইয়া কাড়াকাড়ি, মানুষে মানুষে হিংসা-দ্বেষ, কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র্য-নিবারণের উপায়। কয়েক মুহূর্ত্ত পর তিনি অভিভূতের মত বলিলেন, সে-উপায় তবে কেন মানুষ নেয় না, অহি ?

অহীন্দ্র হাসিয়া বলিল, সে-পথে বাধার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে জমিদার আর ধনীর দল মা—আমরা, ওই বিমলবাবু। আমার এই প্রভুত্ব, এই পাকা বাড়ী, জমিদারী চাল, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তা হ'লে যে থাকবে না মা। সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি যা করি, আমরাই তো করি, নিরীহ গরীবের সম্পত্তি অর্থ কেড়ে নিয়ে আমরাই তো তাদের গরীব ক'রে দিই। ওই চরটার কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে। চর উঠল নদীর বুকে, একেবারে নতুন এক টুকরো মাটি—

সুনীতি মধ্যপথেই বাধা দিয়া বলিলেন, আমি ওই চরের কথাই তোকে বলতে এসেছি অহি। চর নিয়ে যে আবার বিরোধ বেধে উঠল বাবা।

অহীন্দ্র হাসিল, স্বল্পায়তন তিক্ত হাসি। বলিল, বিরোধ তো বাধবেই মা। একদিকে জমিদার অন্যদিকে মহাজন। এ বিরোধ যে অবশ্যম্ভাবী।

সুনীতি আর্ত্তভাবে বলিলেন, ওরে, ও-চরে আমাদের কাজ নেই,

তুই বল্ তোর শ্বশুরকে, ওটা বিক্রী ক'রে দিন। ওই চর আমার সর্ব্বনাশ করবে রে!

অহীন্দ্র বলিল, ও-কথাটা তোমার স্বীকার করতে পারলাম না মা। অপরাধ চরের নয়, অপরাধ আমাদের।

তুই জানিস নে অহিন, সে তোরা বুঝতে পারিস নে, সে তোরা দেখতে পাস্ নে। আমি বুঝতে পারি, দেখতে পাই।—সুনীতি বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, যেন সে দৃষ্টির সম্মুখে চরটার রহস্যময় রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া শূন্যলোকে ভাসিতেছে।

মায়ের সে ভয়কাতর বিবর্ণ মুখ দেখিয়া অহীন্দ্র স্নেহার্দ্র স্বরে বলিল, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন মা? কিসের ভয়?

ওরে, তুই বল্, চরটা বিক্রী ক'রে দেওয়া হোক। আর, তুই যেন এই দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে যাস নে বাবা। ওরে, তোদের বংশের রাগকে আমি বড় ভয় করি রে! রাগের বশে মহীন কি সর্ব্বনাশ কলের, বল্ দেখি?

অহীন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল ননী পালের রক্তাক্ত দেহ। তারপরই সে দেখিল, কাঠগড়ার মধ্যে তাহার দাদাকে, শীর্ণ কিন্তু দৃপ্ত মুখ, অনবনত ঋজু দেহ। একটা উন্মাদনা তাহাকে স্পর্শ করিল। ওই কুটিলচক্রী কলওয়ালা, যাহাকে সাঁওতাল-রমণীরা বলিয়াছে পাহাড়ে চিতি, নিষ্ঠুর অজগর, উহার দেহটা যদি সে এমনি ভাবে লুটাইয়া দিত।

সুনীতি কাতরস্বরে ডাকিলেন, অহিন!

অহীন্দ্র মায়ের মুখের দিকে চাহিল। সুনীতি বলিলেন, চল্, তুই একবার চল্, তোর বাপ আর ও-বাড়ীর দাদা বোধ হয় ওই চরের কথাই বলছেন। তুই চল্।

* * *

রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিতে মাতাপুত্রে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। রামেশ্বরের সে-মূর্ত্তি অদ্ভুত! অহীন্দ্র জীবনে কখনও দেখে নাই, সুনীতি বহুপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন; এ-কালে সে-মূর্ত্তি আর স্মরণেও আনিতে পারিতেন না। ন্যুব্জদেহ তিনি সোজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়াছেন লোহার খুঁটির মত, শীর্ণ হাতের আঙুলগুলি বাঁকাইয়া তীক্ষ্ণ দৃঢ় বাঘনখের মত ভঙ্গি করিয়া রায়কে তিনি বলিতেছিলেন, মুণ্ডুটা তার ছিঁড়ে আনতে পারা যায় না ইন্দ্র, কিংবা অমাবস্থার রাত্রে মা-সর্ব্বরক্ষার কাছে বলি—?

রায় বলিলেন, না। সে-কাল আর নেই রামেশ্বর; এখন আমাদের আইনের পথ ধ'রেই চলতে হবে। আইন বাঁচিয়ে দাঙ্গা করতে পেলে পেছুব না। আমাদের খাসের জমি, যেগুলো সাঁওতালদের ভাগে দেওয়া আছে, কালই সেগুলো দখল করতে হবে। সাঁওতাল-দেরও রীতিমত শিক্ষা দেব আমি। আর ওই যে বললাম, কালিন্দীর বুকে কলওয়ালা যে বাঁধ দিয়ে পাম্প বসিয়েছে, ওটাকে তুলে দিতে হবে। বাধবে, দাঙ্গা ওইখানেই বাধবে ব'লে বোধ হচ্ছে।

অহীন্দ্র বলিল, মা একটা কথা বলছেন। তিনি চান না যে, চর নিয়ে কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। তাঁর একটা অদ্ভুত সংস্কার রয়েছে যে, চরটা থেকে কেবল আমাদের অমঙ্গলই হচ্ছে! সেইজন্যে তিনি বলছেন, চরটাকে বিক্রি ক'রে দেওয়া হোক।

বজ্রগর্ভ স্বরে রামেশ্বর বলিলেন, না।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় দৈহিক দুর্ব্বলতা মানসিক বিহ্বলতা বিলুপ্ত হইয়া রামেশ্বর অকস্মাৎ যেন পূর্ব্ব-রামেশ্বর হইয়া উঠিয়াছেন।

রায় বলিলেন সুনীতিকে লক্ষ্য করিয়া, তোমার কাছে আমি এই কথাটা শুনব প্রত্যাশা করি নি বোন। যাক, তুমি কোন ভয় ক'রো না, যা করবার আমি করব।

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেই অমলের সঙ্গে অহীন্দ্রের দেখা হইল, অমল হাত-পা ধুইয়া তাহার সন্ধানেই উপরে আসিয়াছিল। তাহার স্বাভাবিক মুখরতা আজ আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, বাপ রে, বাপ রে, খুব খাটিয়ে নিলে যা হোক। আমার বিয়েতে আমি এর শোধ নেব, দাঁড়াও না।

অহীন্দ্র একটু হাসিল—অর্থহীন হাসি। অমলের কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিতেই পায় নাই। সে বলিল, চর নিয়ে আবার দাঙ্গা বাধল—কাল সকালে।

অমল বলিল, দাঙ্গা-টাঙ্গা না ক'রে ও লোকটাকে—হ্যাট কল-ওয়ালাটাকে হুইপ করা উচিত।

অহীন্দ্র আবার একটু হাসিল। অমল বলিল, বিয়েটা না চুকতেই এখনই দাঙ্গা-টাঙ্গাগুলো না করলেই হ'ত। কিন্তু না ক'রেই বা উপায় কি? লোকটা যেন দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে উঠেছে।

অহীন্দ্র হাসিয়া এবার বলিল—

বণিকের মানদণ্ড দেখা 'দিবে,' পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে।

সুতরাং তার গতিরোধের চেষ্টা রাজকুলের স্বাভাবিক।

অমল হাসিয়া বলিল, তুমি যেন নিজেকে রাজকুল থেকে বাদ দিতে চাইছ মনে হচ্ছে। বুদ্ধদেব হ'য়ে উঠলে যে! ওরে উমা!

হাসিয়া বাধা দিয়া অহীন্দ্র বলিল, ভয় নেই, এ-যুগে গৌতমেরা সংসার ত্যাগ ক'রে নির্ব্বাণের জন্যে বনে যান না। এ-যুগের নির্ব্বাণ নিহিত আছে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে। ঘরে ব'সেই সে তপস্যা চলে; সুতরাং উমানামধারিণী গোপাকে ডেকে সাবধান করার কোন প্রয়োজন নেই।

৩০

পরদিন প্রভাতেই জমিদার পক্ষ সাজিয়া চরের উপর হাজির হইল, সাঁওতালদের ভাগে বিলি করা জমি দখল করা হইবে।

জমিদার পক্ষকে মোটেই বেগ পাইতে হইল না। লোক জুটিয়া গেল বিস্তর। আদেশ অথবা অনুরোধ করিয়াও লোক ডাকিতে হইল না। আপনা হইতেই গ্রামের সমস্ত চাষী হাল-গরু লইয়া ছুটিয়া আসিল, দলের সর্ব্বাগ্রে আসিল রংলাল। চরের উর্ব্বর মাটির উপর লোভের নিবৃত্তি তাহাদের কোন দিনই হয় নাই। নিরুপায়ে সে কেবল নিরুদ্ধ হইয়াছিল। সংবাদটা পাইবামাত্র তাহারা পুলকিত হইয়া সাঁওতালদের সযত্নে গড়িয়া তোলা জমিগুলি দখল করিতে উদ্যত হইল। বাগ্দীপাড়ার নবীনের দল এবং রায়দের লাঠিয়ালের দল লাঠি হাতে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর ভাগে-বিলি জমির সীমানার মাথায় খুঁট পাতিয়া দাঁড়াইল। চাষীরা বিপুল উৎসাহে গরুগুলিকে প্রচণ্ড চীৎকারে তাড়না করিয়া জমিগুলির উপর লাঙল চালাইয়া দিল—হেৎ—তা-তা-তা-তা—তা-হেৎ—হেৎ!

সাঁওতালদের পুরুষের দল আপনাদের পাড়ার প্রান্তভাগে বসিয়া উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শক্তিমত্ত দখলকারী জনতার দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। পিছনে মেয়েদের দল শুধু ব্যাকুল হইয়া কাঁদিল। কেহ কেহ গালি পাড়িতেছিল আপনাদের পুরুষদের, কেন মিছামিছি রাঙাবাবুদের সহিত বিবাদ করিলি তোরা? এ তোদের উপযুক্ত হইয়াছে, ঠিক হইয়াছে। সায়েব ওদিকে জমি কাড়িয়া লইয়াছে, এ-দিকে রাঙাবাবুরা জমি কাড়িয়া লইল, এইবার কি করিবি কর্! মরিতে হইবে, না খাইয়া শুকাইয়া মরিতে হইবে।

এক বৃদ্ধা আক্ষেপ করিয়া বলিল, আমি তখুনি বললাম গো, তুরা চিবাস মোড়লের কাছে লিস না, ধান ধার তুরা লিস না। 'কাই হড়'

(পাপী লোক) বেটে উ। হিঁদু সাউয়েরা পুরানো বাঘ বেটে। হাড্ডি তাকাত চিবায়ে খাবে উ। লে ইবার, হ'ল তো। আঃ, হায় হায় গো!

একজন বলিল, উয়ার কি দোষ হ'ল? উ কি করবে?

দোষটি কার হ'ল? উ নোকটি যদি সায়েবকে খতগুলান বেচে না দিথো, তবে সায়েব কি ক'রে জমিগুলান্ লিথো? কি ক'রে জমিদার হথো উ?

একটি তরুণী বলিল, হেঁ! তা' হ'লে রাঙাবাবুর বিয়েতে যেতে কি ক'রে মানা করত?

চূড়া মাঝির স্ত্রী এবং আর কয়েকজন মাতব্বর মাঝির স্ত্রী অঝোর ঝরে কাঁদিতেছিল, মৃদুস্বরে বিলাপ করিতেছিল, আঃ—আঃ, হায় হায় গো! সব জমিন-জেরাত চ'লে গেল গো! এখুন যে পরের দুয়ারে চাকর খাটতে হবে গো! লইলে ভিখ মাগতে হবে গো! গু গা (বোবা) ভিখ করে গো! কাঁড়া (অন্ধ) ভিখ করে গো! লেঢ়া (খোঁড়া) ভিখ করে গো! উয়াদিগে যেমন লোকে থো (থুথু) দেয়, তেমনি ক'রে থো খেতে হবে, হায় হায় গো! হায় হায় গো!

বাগ্দী লাঠিয়ালেরা প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে শূন্যের সহিত লড়াই জুড়িয়া দিল। অকারণে লাঠি ঘুড়াইয়া, হাঁক মারিয়া, কুক দিয়া তাহারা যেন তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিল। আসিয়াছিল তাহারা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনায় সতর্ক ধীরতার সহিত সংযত পদক্ষেপে; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস আত্মপ্রকাশ করিল বাঁধ-ভাঙা জলের মত। জমির উপরে লাঙলগুলাও এলোমেলো গতিতে যেন ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। চাষীরা সব উন্মত্ত উল্লাসে গরুগুলিকে ছুটাইয়া যেন গরু-দৌড়-প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সমগ্র ভূমিখণ্ডটাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তাহারা দখল সম্পূর্ণ করিল।

রায়-বাড়ী ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর দুই নায়েবও উপস্থিত ছিল। এই মাতনের ছোঁয়া তাহাদিগকেও স্পর্শ করিয়াছিল। তাহারা দৃপ্ত উল্লাসে এইবার হুকুম দিল, কাট এইবার কালিন্দীর বাঁধ। পাইপ-টাইপ সব উখার দেও। উত্তেজনায় খানিকটা হিন্দীও বাহির হইয়া গেল।

লাঠিয়ালের দল গিয়া পড়িল বাঁধের উপর; এইবার তাহারা একটু সতর্ক এবং সংযত হইল। কলের কুলির দল অদূরে জটলা বাঁধিয়া বসিয়া আছে।

আশ্চর্য্যের কথা, তাহারা কেহ আগাইয়া আসিল না। ইহারা বাঁধ কাটিয়া পাইপ ছাড়াইয়া তছনছ করিয়া দিল, তাহারা দর্শকের মত দাঁড়াইয়া দেখিল মাত্র। জনতা হইতে দূরে একটি গাছতলায় একা দাঁড়াইয়া একটি দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়েও সমস্ত দেখিতেছিল। এ-সবের কোন কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিল না, এ-সমস্তের কোন অর্থই তাহার কাছে নাই।

মুখার্জ্জি সাহেব কাল হইতে সারীকে বাংলোর আউটহাউস হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন; তাঁহার শখ মিটিয়া গিয়াছে। কুলী-ব্যারাকের মধ্যে সে এবার বসতি পাতিয়াছে। সরকারবাবু শূলপাণি রায় বাছিয়া বেশ একখানি ভাল ঘরই তাহাকে দিয়াছে। খুব তেজী পাকি হাঁড়িয়াও তাহাকে খাওয়াইয়াছে। তাহার মাথাটা এখনও কেমন করিতেছে। সে শুধু দেখিতেছিল, অনেক লোক; অনেক লোক, বাবা রে! রাঙাবাবু কই? না, সে নাই। সাহেব কই? লম্বা চোঙার মত বন্দুকটা লইয়া সে তো কই তাক করিয়া এখনও দাঁড়ায় নাই। বাবা রে!

* * *

সত্য সত্যই বিমলবাবু এত বড় উত্তেজিত আহ্বানের উত্তরেও একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কোন উদ্যমই তিনি প্রকাশ করিলেন

না। তিনি যে প্রস্তুত ছিলেন না, তাহাও নয়। সংবাদ তিনি বেশ সময় থাকিতেই পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বদিন রাত্রির প্রথম প্রহরেই সংবাদটা তাঁহার কানে আসিয়া পৌছিয়াছিল।

সংবাদ প্রথম আনিয়াছিলেন অচিন্ত্যবাবু। কথাটা কানে উঠিবামাত্র ভদ্রলোক ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রায় মহাশয় ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর লাঠিয়ালেরা তো সামান্য জীব নয়, উহারা প্রত্যেকেই ডাকাত। নবীন বাগ্দীর এক লাঠির ঘায়ে সেই মুসলমান লাঠিয়ালের মাথাটি ডিমের খোলার মত ফাটিয়া গিয়াছিল; ইহারা সব তাহারই সাকরেদ দোসর। ও-দিকে মিস্টার মুখার্জির হিন্দুস্থানী কুলীর দল সাক্ষাৎ যমদূতের দল। তাহার উপর সাহেবের বন্দুকগুলা একেবারে তৈয়ারি হইয়াই থাকে। কোন রকমে তাগ ফস্কাইয়া যদি একটা বিপথে ছোটে, তবে যে কাহাকে খতম করিবে, সে কে বলিতে পারে? হরেকে তাগ করিয়া শঙ্করাকে মারাই বাঙালীর অভ্যাস। আর বাগ্দী-লাঠিয়ালের দল যদি আপিস চড়াও করে, তবে তো ভীষণ বিপদ! তিনি তৎক্ষণাৎ পরদিন ছুটি লইবার সঙ্কল্প করিলেন এবং সেই রাত্রেই নগদ দুই আনা পয়সা দিয়া একজন ডোম রক্ষক লইয়া বিমলবাবুর বাংলোয় হাজির হইলেন।

বিমলবাবু তখন সারীকে বাংলো হইতে তাড়াইয়া দিয়া সবে পঞ্চম পেগ লইয়া বসিয়াছেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, কি ব্যাপার? রাত্রে?

একখানা দরখাস্ত আগাইয়া দিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, আজ্ঞে ছুটি সার।

ছুটি? কেন?

আজ্ঞে আমার স্ত্রী—সার—

ক' দিনের জন্যে?

দু দিনের আজ্ঞে, দু দিন সার।

এর জন্যে এই রাত্রে আপনি জ্বালাতে এসেছেন? ননসেন্স! দরখাস্তখানা তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তারপর বলিলেন, আচ্ছা, আসবেন না দু দিন।

অচিন্ত্যবাবু সবিনয়ে বলিলেন, আজ্ঞে, আরও একটা খবর আছে, জমিদারেরা ফৌজদারি করবার জন্যে সাজছে সার।

ফৌজদারী? বিমলবাবু সজাগ হইয়া বসিলেন।

সবিস্তারে সমস্ত বলিয়া অচিন্ত্যবাবু বলিলেন, সেইজন্যেই আমার আরও আসা সার।

বিমলবাবু গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অচিন্ত্যবাবু সরিয়া আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

গভীর চিন্তা করিয়া বিমলবাবু কোন উদ্যম প্রকাশ করিলেন না। সকাল হইতেই যোগেশ মজুমদার এবং জমিদারিবিদ্যা-বিশারদ হরিশ রায়কে লইয়া চার-পাঁচটি ফৌজদারী এবং দেওয়ানী মকদ্দমার আরজির খসড়া প্রস্তুত করাইতে বসিলেন।

* * *

ও-দিকে দীর্ঘকাল পরে চক্রবর্ত্তী-বাবুদের কাছারি-বাড়ী গমগম করিয়া জাঁকিয়া উঠিল, চাষী-প্রজার দল ও বাগ্দী-লাঠিয়ালেরা কাছারির বারান্দা পরিপূর্ণ করিয়া বসিল। নায়েব-গোমস্তারা ডেমিতে ভাগচাষের কবুলতি লিখিতেছে; ওই সব দখল-করা জমি চাষীদের ভাগচাষে বিলি হইবে। রায় প্রসন্ন তৃপ্ত মুখে বসিয়া আছেন, তাঁহার মনের গ্লানি অনেকখানি কাটিয়া গিয়াছে। প্রসন্ন মনেই তিনি নূতন কোন দ্বন্দ্বের পরিকল্পনা চিন্তা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে ঘাড় হেঁট করিয়া চিন্তানিবিষ্ট মনে বোধ করি আপনার অজ্ঞাতসারেই মৃদু মৃদু দুলিতেছেন। সহসা একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের উচ্চ ধ্বনি কানে আসিয়া

পৌঁছিল, মৃদু হাসিয়া তিনি সজাগ হইয়া উঠিলেন। কণ্ঠস্বরটি অচিন্ত্যবাবুর ; কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া বক্তৃতা দিতে দিতে তিনি পথ দিয়া চলিয়াছেন ; স্লো অ্যাণ্ড, স্টেডি উইন্স দি রেস। ঈসপ্স ফেবল পড়েছ? দি হেয়ার অ্যাণ্ড দি টর্টয়েজের গল্প? ইংরেজের আইনে, নো লাঠি অ্যাণ্ড নো ফাটি। ব্রেণ অ্যাণ্ড মানি এভ্রিথিং। পাঁচ-পাঁচখানি ফৌজদারী মকদ্দমা। অল বেস্ট প্লীডার্স এন্গেজ্ড। সিরিয়াস চার্জ—রায়টিং, ট্রেস্পাস, অ্যাণ্ড অনেক কিছু। এই চলল লোক লরিতে চ'ড়ে।

রায় হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, ও অচিন্ত্যবাবু! ও মশায়! তাঁহার কথাকে ঢাকিয়া দিয়াই অচিন্ত্যবাবুর ত্বরিত উত্তর ভাসিয়া আসিল, আই ডোণ্ট নো এনিথিং—আই ডোণ্ট নো।

আরও অনেক কিছু তিনি বলিলেন, কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান দূরত্ব হেতু সেগুলি এত অস্পষ্ট যে, তাহার কিছুই বুঝা গেল না। ইন্দ্র রায় কিন্তু এইটুকুতেই অনেক বুঝিলেন এবং খাড়া হইয়া বসিয়া গোঁফে তা দিতে আরম্ভ করিলেন।

মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তিনি পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, মিত্তির!

প্রবীণ মিত্তিরও কথাগুলির কিছু-কিছু বুঝিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি কাজ ছাড়িয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, রায় বলিলেন, সদরে যাবার পথে গ্রাম পেরিয়ে যে সাঁকোটা আছে—

পাকা নায়েব মুহূর্ত্তে উত্তর দিল, আজ্ঞে, হ্যাঁ। তা হলে আর লরি যেতে পারবে না। আদ্ধেকখানা খসিয়ে দিলেই হবে। সে ব্যবস্থা আমি করছি। আমাদের চাষ-বাড়ীতে গাঁইতি আছে, আধ ঘণ্টায় কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

রায় বলিলেন, সকলের চেয়ে যে 'পাউড়ে', তাকে পাঠাও সদরে।

মুখুজ্জে, সেন আর সিংহীকে ওকালতনামার বায়না পাঠিয়ে দাও। ওদের চেয়ে ফৌজদারী উকিল আর ভাল কেউ নেই। আমাদের তরফ থেকে মামলা প্রথমে দায়ের হয়ে যাক।

নায়েব লঘু দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল।

রায় ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ঢুলিতে আরম্ভ করিলেন।

বাড়ীর ভিতরে বিবাহের গোলযোগ তখনও প্রায় পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। বউভাত মিটিয়া গিয়াছে, আজ বাসি-ভোজ; পরিবেশক, ঠাকুর-চাকর, আত্মীয়-বন্ধু-স্বজনবর্গকে ভাল করিয়া খাওয়ানো হইবে। তাহার সঙ্গে এই দাঙ্গার সমস্ত লোকগুলিকেও খাওয়ানোর ব্যবস্থা হইয়াছে। বিবাহের ভাণ্ডারে গ্রামেরই কয়েকজন পাকা দোকানদার ভাণ্ডারীর কাজ করিতেছে। তাহারা লোক হিসাব করিয়া জলখাবার মাপিতে ব্যস্ত। মানদা চীৎকার করিয়া ফিরিতেছে, বাড়ীর মধ্যে দাঙ্গার উত্তেজনাটাকে সে একাই বজায় করিয়া রাখিয়াছে। হেমাঙ্গিনী সমস্ত দিকের তদ্বির-তদারক করিতেছেন। সুনীতি সমস্ত সকালটা প্রাণহীন প্রতিমার মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ওই চরটার কথাই তিনি ভাবিতেছিলেন। তিনি কল্পনা করিতেছিলেন, চরের মাটি রক্তমাখা; দাঙ্গায় নিহত মানুষের হাত-পা দেহ-মাথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। বার বার তাঁহার অন্তরাত্মা তাঁহাকেইখ প্রশ্ন করিতেছে, এ পাপ কাহার? সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে তাঁহার চো আপনি যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

মানদা আসিয়া দর্পিত কণ্ঠে সংবাদ দিল, দাঙ্গায় আমরা জিতেছি মা। ওরা কেউ আসে নাই ভয়ে, ল্যাজ গুটিয়ে ঘরে ঢুকেছে সব।—বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া সে গড়াইয়া পড়িল।

পরম আশ্বাসের একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুনীতি যেন

দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিলেন, তা হ'লে খুন-জখম কিছু হয় নি, না রে মানদা ?

হেমাঙ্গিনীও মানদার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি হাসিয়া বলিলেন, না ভাই। তুমি এইবার ওঠ দেখি, উঠে ঠাকুর-জামাইয়ের স্নান-টানের ব্যবস্থা কর। উমা হাজার হলেও ছেলেমানুষ, তার ওপর জানাশোনাও তো নেই কিছু।

সুনীতি হাসিমুখে উঠিলেন, বলিলেন, আহা দিদি, মানুষের জীবন গেলে তো আর ফেরে না। সারা সকালটা আমার বুকে কে যেন পাষাণ চাপিয়ে দিয়েছিল।

নীচে ইন্দ্র রায়ের গভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কই রে, উমা কোথায় গেলি ? তোর শ্বশুর কি করছেন রে ?

উমার অপেক্ষা না করিয়াই তিনি উপরে আসিয়া রামেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই গম্ভীর কণ্ঠের উচ্চ হাসির সঙ্গে শোনা গেল, ফৌজদারী মামলা ক'রে কলওয়ালা আমাদের জব্দ করবে!—বলিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হাসি—হা হা-হা-হা।

সে-হাসির শব্দের সঙ্গে নীচে বাগ্দী লাঠিয়ালদের কলরব মিশিয়া সমস্ত মহলটা যেন গমগম করিয়া উঠিল। ভাণ্ডারের দুয়ারে তাহারা জলখাবার লইতে আসিয়া গোলমাল করিতেছিল। মানদা রেলিঙের উপর বুক দিয়া ঝুঁকিয়া বলিল, খুব তো চেঁচাচ্ছিস সব! সেই বিভীষণ মজুমদারের একটা ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে আসতিস, তবে বুঝতাম। কিংবা একপাটি দাঁত—

বলিতে বলিতে সে সসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হইয়া চুপ হইয়া গেল। ভারী গলায় কণ্ঠনালী পরিষ্কার করিয়া লওয়ার উচ্চ গম্ভীর শব্দ জানাইয়া দিল রায় বাহির হইয়া আসিতেছেন। রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিলেন, উমা!

মানদা ত্রস্তপদে গিয়া উমাকে ডাকিয়া দিল। উমা আসিয়া বাপের সম্মুখে দাঁড়াইতেই সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া রায় বলিলেন, খুব যে বউ সেজে গেছিস মা! তোকে একেবারে দেখবারই জো নেই।—বলিয়া উমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি যুগপৎ বিস্মিত এবং শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। উমার মুখ নিশান্তের জ্যোৎস্নার মত সকরুণ পাণ্ডুর। পরমুহূর্ত্তেই মনে পড়িল, কাল রাত্রে ফুলশয্যা গিয়াছে। হাসিয়া বলিলেন, তোর শাশুড়ীকে বল্ মা, রামেশ্বরের স্নান-আহ্নিকের ব্যবস্থা ক'রে দিন। দুর্ব্বল শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তোরাও স্নান-টান ক'রে সব বিশ্রাম কর্।

উমাকেই রামেশ্বরের পরিচর্য্যার জন্য বলিবেন সঙ্কল্প করিয়া ডাকিয়াছিলেন। কিন্তু উমার এমন ক্লান্ত ভঙ্গি দেখিয়া সুনীতিকে ডাকিবার জন্য বলিলেন। গত রাত্রির রামেশ্বর আজ আর নাই, রায়ের উচ্চ হাস্য, উল্লাস তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। রোগ যেন আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

রায় সত্য দেখিয়াও ভ্রম করিলেন। উমার মুখ সত্যই সকরুণ পাণ্ডুর, কিন্তু সে ফুলশয্যার রজনীর আনন্দের অবসাদে নয়। গোপন অন্তরে নিরুদ্ধ সুগভীর অভিমান ও দুঃখের দাহে তাহার মুখের লাবণ্যের সজীবতা এমন শুকাইয়া গিয়াছে। জীবনের প্রথম মিলন-বাসরে অহীন্দ্রের মধ্যে সে পরম বাঞ্ছিত জনকে খুঁজিয়া পায় নাই, এমন কি এতদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু—অহীন্দ্রেরও দেখা পায় নাই। স্তব্ধ উদাসীন, এ যেন অস্বাভাবিক অপরিচিত এক অহীন্দ্র। দৃষ্টিপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াও তাহার দৃষ্টিতে পড়া যায় না। সকাল হইতে এতটা বেলা পর্য্যন্ত বাহিরের বারান্দায় সে পায়চারি করিতেছে, কত বার তাহার দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিয়াছে, উমার দৃষ্টি সুস্পষ্ট অভিমানের

বার্ত্তা জানাইয়াছে, কিন্তু অহীন্দ্রের দৃষ্টি যেন বধির মূক হইয়া গিয়াছে; কোন বার্ত্তা সে-দৃষ্টির গোচরে আসে নাই, কোন উত্তরও দিতে পারে নাই।

মানদা অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, রায় নীচে চলিয়া যাইতেই বলিল, চলুন বউদিদি, চান করবেন চলুন। মুখ আপনার বড্ড শুকিয়ে গিয়েছে।

৩১

শুধু ইন্দ্র রায়ই নয়, হেমাঙ্গিনীও ভুল করিলেন।

ফুলশয্যার দিন দুই পরেই বর ও কন্যার জোড়ে কন্যার পিত্রালয়ে আসার বিধি আছে, 'অষ্টমঙ্গলা'র যাহা কিছু আচার-পদ্ধতি সবই কন্যার পিত্রালয়েই পালনীয়; সুতরাং অহীন্দ্র ও উমা রায়-বাড়ীতে আসিল। হেমাঙ্গিনী ও-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিলেও উমাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই, সুযোগ তিনি ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করেন নাই। হাজার হইলেও তিনি মেয়ের মা। নদীকূলের বাসিন্দার মত, বন্যারূপ নিন্দার ভয় যে মেয়ের মায়ের অহরহ। কঠোরভাবে তিনি কন্যার জননীর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, উমার কাছে গিয়া একদিন বসেন নাই পর্য্যন্ত। মানুষের মনকে বিশ্বাস নাই, কে হয়তো এখনই বলিয়া বসিবে যে, মেয়েকে তিনি কোন গোপন পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন।

আপন গৃহে কন্যাকে পাইয়া কন্যার মুখ দেখিয়া তিনি প্রথমটা শিহরিয়া উঠিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই হাসিলেন, স্বামীর কথাটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। রায় সেদিন বাড়ী আসিয়াই হেমাঙ্গিনীকে কথাটা বলিয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, ওদের তো আমাদের মত অজানা-অচেনাও নয়, পনেরো বছরের বর, দশ বছরের কনেও নয়।

রায় হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা বটে।

হেমাঙ্গিনী মৃদু হাসিয়া, উমার কপালে খসিয়া-পড়া চুলগুলিকে আঙুলের ডগা দিয়া তুলিয়া দিলেন, বলিলেন, স্নান ক'রে খেয়ে-দেয়ে বেশ ভাল ক'রে একটু ঘুমো দেখি।

উমা নিতান্ত ছোট মেয়ে নয়, সে মায়ের মৃদু হাসি ও কথাগুলির অর্থ দুইই বেশ বুঝিতে পারিল। দুঃখে অভিমানে তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল, কিন্তু প্রাণপণে আপনাকে সংযত করিয়া সে-আবেগ সে রোধ করিল। মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে সে উঠিয়া গেল। মা মনে করিলেন, কন্যার লজ্জা। তিনি আরও একটু হাসিয়া অহীন্দ্রকে জলখাবার দিতে উঠিলেন। বিবাহ উপলক্ষে সমাগতা তরুণী কুটুম্বিনীর দল উমার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া গিয়াছিল, উমার আজ তাহাদের মধ্যেই থাকিবার কথা। ভাঁড়ারের দিকে চলিতে চলিতে হেমাঙ্গিনী আবার হাসিলেন।

অমল বাড়ী নাই, ইন্দ্র রায় তাহাকে সদরে পাঠাইয়াছেন। ওই চরের ব্যাপার লইয়াই সে খোদ ম্যাজিষ্টেট সাহেবের নিকট এক দরবার করিতে গিয়াছে। চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর প্রতিনিধি হইয়াই সে গিয়াছে। কলওয়ালার অত্যাচারে চরের প্রজা উৎখাত হইয়া যাইতেছে, জোরপূর্ব্বক নদীতে বাঁধ দিয়া পাম্প করিয়া জল তোলায় জলাভাবে চাষ নষ্ট হইয়া যাইতেছে; এমন কি গরীবদের গার্হস্থ্য-জীবন পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। যাওয়া উচিত ছিল অহীন্দ্রের। কিন্তু বিবাহের অত্যাচার-আচরণগুলির জন্য তাহার যাওয়া চলে না বলিয়াই অমল গিয়াছে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর প্রতিনিধিস্বরূপে। শ্বশুর-জামাই দুইজনে উপরের ঘরে বসিয়া আলোচনা করিতেছে: আলোচনা অবশ্য একতরফা। রায় একাই কথা বলিতেছিলেন। অহীন্দ্রকে সমস্ত কথা ভাল করিয়া বুঝাইতেছিলেন।

অহীন্দ্র নীরবে বসিয়া শুনিতেছিল। হেমাঙ্গিনী জলখাবার আনিয়া

রায়কে বলিলেন, না বাপু, তুমি কিন্তু অদ্ভুত মানুষ, জমিদারি, মকদ্দমা, দাঙ্গাহাঙ্গামা এই ছাড়া কি আর কথা নাই তোমাদের? অমলকে তো পাঠিয়ে দিলে সদরে, এইবার অহিনকে পার তো হাইকোর্টে পাঠাও।

রায় হাসিয়া বলিলেন, জান, আকবর-শা বাদশা বারো বছর বয়সে হিন্দুস্থানের বাদশা হয়েছিলেন। জমিদারের ছেলে জমিদারির কাজ না শিখলে হবে কেন? জেলার হাকিমদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় রাখতে হবে, বিষয়-সম্পত্তির কোথায় কি আছে জানতে হবে; তবে তো! মোটামুটি আইন-কানুন—এগুলোও জেনে রাখতে হবে। আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা—এগুলোও একটু-আধটু শিখতে হবে বৈকি। জান তো, 'মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের'? একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া রায় আবার বলিলেন, দাঙ্গাই বল, আর হাঙ্গামাই বল, আসলে হ'ল যুদ্ধ! রাজায় রাজায় হ'লেই হয় যুদ্ধ, আর জমিদারে জমিদারে হ'লেই হয় দাঙ্গা। আসলে হলাম আমরা রাজা। ছোট অবশ্য—গরুড় আর চামচিকে যেমন আর কি!—বলিয়া তিনি হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তারপর উঠিয়া বলিলেন, তা হ'লে তুমি ব'স বাবা। আমি একবার দেখি, সেরেস্তার কাজ অনেক বাকি প'ড়ে গেছে। অমল এই বেলাতেই এসে পড়বে।

অমল ফিরিল অপরাহ্ণে—অপরাহ্ণের প্রায় শেষভাগে। অহীন্দ্র তখন বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। স্বভাবধর্ম্ম অনুযায়ী অমল সোরগোল তুলিয়া ফেলিল। সে উমাকে এক নূতন নামে চীৎকার করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল, উম্‌নী! উম্‌নী! এই উম্‌নী!

হেমাঙ্গিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ও কি? উম্‌নী আবার কি?

হাসিয়া অমল বলিল, উমার নূতন নাম বের করেছি আমি।

দাদার সাড়া পাইয়া উমা ঈষৎ উজ্জল হইয়া উঠিল। সে হাসিমুখে আসিয়া অমলের কাছে দাঁড়াইল, অমল বলিল, তোর নূতন নাম দিয়েছি উম্‌নী ; পছন্দ কি না, বল্‌ ? সে আপনার স্যুটকেসটি খুলিতে বসিল।

উমা কোন জবাব দিল না, হাসিতেছিল, হাসিতেই থাকিল। অমলকে পাইয়া তাহার মন যেন অনেকটা হাল্কা হইয়া উঠিয়াছে।

অমল স্যুটকেসের তালায় চাবিটি পরাইয়া বলিল, বল্‌ বল্‌, শিগগির বল—yes or no ?

উমা এবার বলিল, খারাপ নাম আবার কেউ পছন্দ করে নাকি ?

ও-সব আমি বুঝি না। Say, yes or no।

ঘাড় নাড়িয়া উমা বলিল, No।

No ! আচ্ছা, তবে থাকল, পেলি না তুই। অমল স্যুটকেস হইতে হাত সরাইয়া লইল।

উমা উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল কি ?

সে জেনে তোর দরকার কি ?

অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উমা এবার বলিল, না না না, তবে no নয়, no নয়। Yes—yes !

অমল স্যুটকেস খুলিয়া বাহির করিল—সাঁওতাল-তাঁতীর বোনা মোটা সুতার একখানি সাঁওতালী কাপড়। সাদা ধবধবে দুধের মত জমি, প্রান্তে প্রান্তে লাল কস্তার চওড়া সাঁওতালী মই-পাড় শাড়ি। দেখিয়া উমার চোখ উজ্জল হইয়া উঠিল। অমল শাড়িখানি উমার হাতে দিয়া বলিল, Queen of the Santhala—মহামহিমান্বিতা উম্‌নী ঠেকরুণ। যা, প'রে আয়, এক্ষুনি প'রে আয়, দেখি কেমন মানায়। যা।

উমা গেল, কিন্তু উৎসাহিত চঞ্চল গমনে নয় ; মন্থর গতিতেই চলিয়া গেল।

অমল হাসিয়া বলিল, তিন দিনে দেখছি, উম্‌নীর তেত্রিশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। মেয়েটার লজ্জা এসে গেছে।

হেমাঙ্গিনী একটু ধমক দিয়া বলিলেন, তোর জ্ঞানবুদ্ধি কোন কালে হবে না অমল। নে, মুখ-হাত ধুয়ে নে। অহিন বেড়াতে গেছে, তুই বরং একটু বেড়িয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে আয়।

উত্তম কথা। উম্‌নী ঠেকুরুণকেও তা হ'লে সঙ্গে নিয়ে যাব। বলিয়াই সে হাঁকিতে আরম্ভ করিল, উম্‌নী! উম্‌নী!

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, না। গাঁয়ে শ্বশুর-বাড়ী; ও সব তোমার খেয়াল-খুশি মত হবে না। শ্বশুর-বাড়ীর কথা ছেড়ে দিয়েও তোমার বাপই শুনলে রাগ করবেন।

উমা সাঁওতালী শাড়ি পরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। অদ্ভুত রকম দেখাইতেছিল উমাকে। হেমাঙ্গিনী দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, যা যা, ছেড়ে ফেল্ গে।

অমল বলিল, না না না; এক কাজ কর্ উম্‌নী, সাঁওতালদের মত চুলটা বাঁধ দেখি; কতকগুলো গাঁদাফুল পর্ খোঁপায়। একটা ফোটো তুলে নিই তা হ'লে।

ফোটোর নামে উমা আবার একটু দীপ্ত হইয়া উঠিল।

*   *   *

অমল আসিয়া উপস্থিত হইল কালিন্দীর ঘাটে। সে ঠিক জানে অহীন্দ্রকে কোথায় পাওয়া যাইবে। ঘাটের পাশে অল্প একটু দূরে একটা ভাঙনের মাথায় ঘাসের উপর অহীন্দ্র বসিয়া ছিল। ভাঙনটার ঠিক সম্মুখে ও-পারে চরের উপর সাঁওতাল-পল্লীটি দেখা যাইতেছে। পল্লীটি স্তব্ধ। চরের ও-পাশে কারখানার হিন্দুস্থানী শ্রমিক-পল্লীতে একটা ঢোল বাজিতেছে। পচুই মদের দোকান হইতে ভাসিয়া আসিতেছে উচ্ছৃঙ্খল কলরব। অহীন্দ্র স্থাণুর মত বসিয়া ও-পারের

দিকে চাহিয়া ছিল। অমল পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল। কিন্তু তাহাতেও অহীন্দ্রের একাগ্রতা ক্ষুণ্ণ হইল না। অমল বিস্মিত হইয়া সশব্দে অগ্রসর হইয়া অহীন্দ্রের পাশে বসিয়া কহিল, ব্যাপার কি বল তো? ধ্যান করছ নাকি?

এ আকস্মিকতায় অহীন্দ্র কিন্তু চমকিয়া উঠিল না, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিভরেই সে অমলের আপাদমস্তক দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল, তুমি!

হাসিয়া অমল বলিল, হ্যাঁ, আমি। কিন্তু তোমার যে দেখি, ধ্যানী বুদ্ধের মত অবস্থা!

অহীন্দ্রও একটু হাসিল, তারপর বলিল, ভাবছি ওই চরটার কথা।

ওই চরটাই তোমাকে খেলে দেখছি। ও-সব ভাবনা ছাড়, ওর ব্যবস্থা আমি ক'রে এসেছি। কালেক্টার খুব মন দিয়ে আমার কথা শুনলেন। ইমিডিয়েটলি এর ব্যবস্থা তিনি করবেন; আর্জেণ্ট নোট দিয়ে তিনি আমার সামনে এস, ডি, ও-কে এন্‌কোয়ারির ভার দিলেন। সাঁওতালদের জমি সম্বন্ধে একটা স্পেশাল আইন আছে। তাতে ওদের জমি বিক্রি হয় না। সেই আইন এখানে চালানো যায় কি না দেখবেন।

কথা বলিতে বলিতে অমল অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল কলওয়ালা বিমলবাবুর উপর। বলিল, স্কাউণ্ড্রেলটার সমস্ত কথা আমি বলেছি কালেক্টারকে। দ্যাট পুয়োর ইনোসেণ্ট গার্ল—ওই সারী ব'লে মেয়েটার কথা সুদ্ধু বলেছি আমি কালেক্টারকে।

অহীন্দ্রের মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি দেখিয়া অমল আহত ও বিরক্ত না হইয়া পারিল না, বলিল, হাসছ যে তুমি?

হাসছি ওই লোকটার ওপর তোমার রাগ দেখে।

কেন, রাগের অপরাধটা কি?

অপরাধ নয়, অবিবেচনা। মানে, ও-লোকটা আর নতুন অধ্যায়

কি করেছে, বল? চিরকাল পৃথিবীতে বুদ্ধিমান্ শক্তিশালীরা দুর্ব্বল নির্ব্বোধের ওপর যে আচরণ ক'রে এসেছে, তার বেশি কিছু করে নি ও বেচারী। সম্রাট্ বাদশা রাজা দিগ্বিজয়ী থেকে আরম্ভ ক'রে রায়হাটের জমিদার-বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা পর্য্যন্ত সকলেই এই একই আচরণ ক'রে এসেছেন, আপন আপন সাধ্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী। তুমি-আমিও সুযোগ পেলে এবং সামর্থ্য থাকলে তাই করতাম; হয়তো ভবিষ্যতে করব।

অমল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল, শুধু বিস্ময়ই নয়, অন্তরে অন্তরে সে একটা তীব্র জ্বালাও অনুভব করিল। সে ঈষৎ উষ্মাভরেই প্রশ্ন করিল, হোয়াট ডু ইউ মীন?

হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, বিশ্বচরাচরে আদিকাল থেকে যা ঘটে, ওই চরেও ঠিক তাই ঘটল বন্ধু। সাঁওতালগুলো ওই ভাবে বঞ্চিত হতেই বাধ্য, ওই মেয়েটার ওই দুর্দ্দশাই স্বাভাবিক। চরটা এবং তোমার মধ্যেকার টাইম অ্যাণ্ড স্পেসের ডাইমেন্শন বাড়িয়ে নাও না, দেখবে চরটা বেমালুম পৃথিবীর সঙ্গে মিশে গেছে, পার্থক্য নেই।

অমল এবার স্তব্ধ হইয়া গেল। অহীন্দ্রের কথা এবং তাহার কণ্ঠস্বরের সকরুণ আন্তরিকতা তাহাকে প্রতিবেশীর শোকের মত স্পর্শ করিল, আচ্ছন্ন করিল। অর্দ্ধস্ফুট হাসিটুকু অহীন্দ্রের মুখে লাগিয়াই রহিল, সেই অবস্থাতেই সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর অমল জোর করিয়া চিন্তাটাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, হ্যাং ইয়োর বিশ্বপ্রেম। ওঠ এখন সন্ধ্যে হয়ে গেল।

অন্যমনস্কভাবে অহীন্দ্র বলিল, অ্যাঁ?

ওঠ ওঠ, সন্ধ্যে হয়ে গেল। যত সব উদ্ভট চিন্তা! চল, এখন বাড়ী চল। আচ্ছন্ন স্বপ্নাতুরের মতই অহীন্দ্র উঠিল এবং অমলের সঙ্গে

রায়-বাড়ীর পথ ধরিল। চলিতে চলিতে অমল বলিল, দিস ইজ ব্যাড, অহিন।

অহীন্দ্র যেন উত্তর দিল না।

অমল তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, ভো ভো চিন্তাকুল মনুষ্য!

হ্যাঁ!

আরে রাম রাম, তুমি শেষ পর্য্যন্ত পাগল হয়ে যাবে।

অহীন্দ্র কথার কোন জবাব দিল না। তাহার কানে কোন কথা যেন প্রবেশই করিতেছে না, শব্দ কর্ণপটহে আঘাত করিলেও অর্থ মন পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিতেছে না। তাহার মনের অবস্থা ঠিক যেন ভাটার সমুদ্রের মত; তাহার পরিচিত পৃথিবীর সুন্দর শ্যামল তটভূমি ক্রমশ যেন মিলাইয়া একাকার হইয়া যাইতেছে—দূর হইতে দূরান্তরের অস্পষ্টতার অপরিচয়ের মধ্যে। অথচ কোন্ গোপন অতল-পথে কেমন করিয়া যে জীবনের সকল উর্দ্ধমুখী জলোচ্ছ্বাস নিম্নমুখে নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, সে-রহস্য তাহার অজ্ঞাত।

উমা উত্তেজিত হইয়া একটা ড্রেসিং-টেবিলের কোণ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বেশ-ভূষা প্রসাধন লইয়া প্রচণ্ড একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে ইহারই মধ্যে। সে কোনমতেই বেশভূষার পরিবর্ত্তন করিবে না, যেমন আছে তেমনি থাকিবে। হেমাঙ্গিনী মেয়ের উপর ভীষণ চটিয়া গিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন. বলিয়াছেন, 'ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত', তোর দোষ কি, বল্? তোদের বংশের ধারাই এই।

উমা কোন উত্তর করে নাই, কিন্তু তাহার কালো বড় চোখ দুইটি হইয়া উঠিয়াছিল বিদ্যুতালোকিত মেঘের মত। হেমাঙ্গিনী সে-দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ভাজ—উমার মামীমা তাঁহাকে শান্ত করিয়া মৃদুস্বরে বলিয়াছেন, ঠাকুরঝি, ও-সব হচ্ছে

আজকালের ফ্যাশান। তুমি রাগ করছ কেন? আমাদের চোখে খারাপ লাগলে কি হবে, ওদের চোখে এ-সব খুব ভাল লাগে।

উমা তখন হইতেই ড্রেসিং-টেবিলটির কোণ ধরিয়া তেমনি ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। সেই সাঁওতালদের মত সিঁথি বিলুপ্ত করিয়া চুল বাঁধা, খোঁপায় গাঁদাফুলের মালা, পরনে মোটা সুতার সাঁওতালী শাড়ি; এক নজরে উমাকে চিনিবার পর্য্যন্ত উপায় নাই। অকস্মাৎ উমা চকিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল, আয়নার মধ্যে ছায়া পড়িল অহীন্দ্র ও অমলের। অহীন্দ্র ও অমল ঘরে প্রবেশ করিতেই উমা বিব্রত হইয়া পড়িল, সাঁওতালী শাড়িটা অবগুণ্ঠন দিবার মত পর্য্যাপ্ত দীর্ঘ নয়। অমল হাসিয়া বলিল, লেট মি ইন্‌ট্রোডিউস, উম্‌নী ঠেক্‌রুণ অ্যাণ্ড রাঙাবাবু।

উমা দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু অমল বলিল, ব'স পোড়ারমুখী ব'স। একেবারে যেন নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরির কলাবউ!

অন্যমনস্ক অহীন্দ্র পর্য্যন্ত এই অভিনব সজ্জায় সজ্জিতা উমাকে দেখিয়া সমস্ত ভুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখে প্রদীপ্ত মুগ্ধ দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিল। উজ্জ্বল মুগ্ধ হাসি হাসিয়া সে আবার বলিল, ব'স না উমা। ও, তুমি বুঝি ঘোমটা দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ? কিন্তু সাঁওতালেরা তো কাপড়ের আঁচলে ঘোমটা দেয় না। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

আলনা হইতে উমার লাল ডুরে গামছাখানা টানিয়া লইয়া অহীন্দ্র বলিল, ওরা গামছায় ঘোমটা দেয় এমনি ক'রে। অগ্রসর হইয়া গামছা দিয়া উমার মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল।

অমল হাসিয়া বলিল, দাঁড়াও দাঁড়াও, চায়ের ব্যবস্থা করি। তারপর উমীকে আজ সাঁওতালের মেয়ের মত নাচতে হবে।—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

উমা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, অহীন্দ্র অকস্মাৎ অনুভব করিল উমা কাঁদিতেছে। সে সবিস্ময়ে চিবুক ধরিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া দেখিল অনর্গল ধারায় উমার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। অহীন্দ্র তাহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকে চাপিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, তুমি কাঁদছ? কি হয়েছে উমা?

উমা জোর করিয়া চিবুক হইতে অহীন্দ্রের হাত সরাইয়া দিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অহীন্দ্র সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, কি হয়েছে, বলবে না আমাকে? এইবার তাহার মনে হইল, সে উমাকে অবহেলা করিয়াছে। অনুতাপের উত্তাপে তাহার আবেগ গাঢ়তর হইয়া উঠিল।

উমা তাহার বুকের মধ্যেই সবেগে মাথা নাড়িল। অহীন্দ্র দুই হাতে তাহার মুখখানি আবার তুলিয়া ধরিল। উমা চোখ বন্ধ করিল, অকস্মাৎ অহীন্দ্র চুমায় চুমায় তাহার মুখখানি ভরিয়া দিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া দিল।

আকাশে যেন পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, জীবনের রিক্ত বালুময় বেলাভূমি জলোচ্ছ্বাসের উল্লাসে আবৃত হইয়া গিয়াছে, চিরপরিচিত তটভূমির বুকের কাছে অসীম আগ্রহে আবার আগাইয়া আসিতেছে।

* * *

পরদিন তখনও অন্ধকারের ঘোর সম্পূর্ণ কাটে নাই। উমা এবং অহীন্দ্র উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিল, কালো কালো ছায়ার মত সারিবদ্ধ কাহারা সম্মুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। সমস্ত রাত্রির মধ্যে উমা ও অহীন্দ্র ঘুমায় নাই। অহীন্দ্র উমাকে বলিয়াছে তাহার অন্তরের সকল চিন্তা সকল বেদনার কথা। উমা নিতান্ত অজ্ঞ পল্লীকন্যা নয়, সে শহরে বড় হইয়াছে, স্কুলে পড়িয়াছে। অহীন্দ্রের কথার প্রতিটি শব্দ না

বুঝিলেও, আভাসে সে বুঝিয়াছে অনেক। তাহার তরুণ চিত্ত অহীন্দ্রের গৌরবে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

অহীন্দ্র ওই কালো ছায়ার সারি দেখিয়া সবিস্ময়ে উমাকে প্রশ্ন করিল, কারা বল দেখি?

উমা শঙ্কিত হইয়া বলিল, ডাকাত নয় তো?

অহীন্দ্র উঠিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। পুরুষ-নারী-শিশু, গরু-মহিষ-ছাগল সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। পুরুষদের কাঁধে ভার, মেয়েদের মাথায় বোঝা, গরু-মহিষের পিঠে ছালায় বোঝাই জিনিসপত্র; নীরবে তাহারা পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। কয়খানা গরুর গাড়ীও আসিতেছে ধীর মন্থর গতিতে সকলের পিছনে। বোঝাগুলোর মধ্যে নিশ্চয় কোথাও মুরগীর পাল আছে, আসন্ন নিশাবসানের আভাসে তাহাদের একটা চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা, তাহার পর আরও কয়েকটা।

উমাও অহীন্দ্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে অহীন্দ্রকে বলিল, সাঁওতাল?

তাই মনে হচ্ছে। পরক্ষণেই সে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, কে? কারা যাচ্ছ তোমরা?

মেয়েদের কণ্ঠে মৃদু গুঞ্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহার মধ্যে অহীন্দ্র ও উমা বুঝিল একটা শব্দ, রাঙাবাবু।

কে একজন পুরুষ উত্তর দিল, আমরা গো—মাঝিরা।

মাঝিরা! কোথায় যাচ্ছিস সব?

ইখান থেকে আমরা উঠে যাচ্ছি গো—হু-ই মৌরক্ষীর ধারে লতুন চরাতে।

উঠে যাচ্ছিস তোরা? চ'লে যাচ্ছিস এখান থেকে?—একেবারে ব্যথিত বিস্মিত কণ্ঠে উমা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল।

হেঁ গো। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে কথার উত্তর দিল, কথা শুনিবার বা উত্তর দিবার জন্য মুহূর্ত্তের অপেক্ষাও করিল না।

সবাই চ'লে যাচ্ছিস তোরা?—সকরুণ মমতায় উমা নিতান্ত শিশুর মতই অর্থহীন প্রশ্ন করিতেছিল। অহীন্দ্র নীরব, তাহার চোখে গভীর একাগ্র নিষ্পলক দৃষ্টি, মুখে ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ স্বল্পপরিসর হাসি। আবার জীবনের সকল উচ্ছ্বাস স্তিমিত হইয়া ভাটায় নামিয়া চলিয়াছে।

উমার প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিল, উই বজ্জাত চূড়া মাঝিটো আর ক ঘর থাকলো গো। উয়ারা সায়েবের সঙ্গে সাঁট করলে, উয়ার কলে খাটবে।—বলিতে বলিতে দলটি অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। মানুষের ও পশুর পায়ে, গাড়ীর চাকায় পথের ধূলা উড়িয়ে শূন্যলোক আচ্ছন্ন করিয়া দিল। রহস্যময় প্রত্যূষালোকের মধ্যে ধূলার আবরণখানি যবনিকার মত কালো মানুষগুলির পিছনে প্রসারিত হইয়া ক্রমে তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিল।

ধীরে ধীরে আঁধার কাটিয়া আসিতেছিল। চরের উপর বয়লারের সিটি বাজিয়া উঠিল। প্রভাতের আলোকে লাল সুরকির পথ, সুদীর্ঘ চিমনি, নূতন মিল-হাউস, কুলি-ব্যারাকে বাড়ীঘর লইয়া চরখানা একটি নগরের মত ঝলমল করিতেছে।

৩২

ইহার পর বিরাট একটি মামলা-পর্ব্ব

সাঁওতালদের জমি এবং নদীর বাঁধ উপলক্ষ করিয়া কলওয়ালার সহিত ইন্দ্র রায় ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর ছোট-বড় ফৌজদারী দেওয়ানী মামলা একটির পর একটি বাধিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

সদর হইতে এস. ডি. ও. আসিয়া তদন্ত করিয়া গেলেন। অমলের আনীত অভিযোগ তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন, সাঁওতালেরা ভূমিহীন হইয়া অধিকাংশই এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে, যাহারা আছে তাহাদেরও জমিজমা নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেও তিনি বে-আইনী কিছু দেখিলেন না। বিমলবাবু ঋণের দায়ে জমিগুলি খরিদ করিয়াছেন, সাঁওতালেরাও স্বেচ্ছায় বিক্রয় করিয়াছে। চূড়া মাঝি ও তাহার অনুগত মাঝি কয়জন —যাহারা এখানে থাকিয়া গিয়াছে, তাহারাই সে কথা স্বীকার করিল। সারী-সম্পর্কিত অভিযোগের তদন্ত করিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, সে কথা সত্যের খাতিরেও পূরাপূরি লেখা চলে না।—'বর্ব্বর জীবনের সঙ্গে লোভ এবং নীতিহীন উচ্ছৃঙ্খলতার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; এক-একটা জীবনে তাহা অত্যুগ্র হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই হইয়াছে। বর্ব্বর, লোভপরবশ, উচ্ছৃঙ্খল মেয়েটির এই পরিণতি ভয়াবহরূপে দুঃখজনক হইলেও ইহা স্বাভাবিক। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে তাহা প্রত্যক্ষ, কিন্তু সে অবস্থার কথা লেখা চলে না।'

'মোটামুটি অভিযোগের বিষয়গুলি বাহ্যত প্রত্যক্ষ হইলেও অন্তর্নিহত সত্য ইহার মধ্যে কিছুই নাই; ইহার অন্তর্নিহিত সত্য হইতেছে জমিদারের সহিত কলের মালিকের প্রতিপত্তি লইয়া বিরোধ। কলের মালিক এখানে কল স্থাপন করিয়া সমগ্র অঞ্চলের একটি বিশেষ উপকার করিয়াছেন। দীনদরিদ্রের মজুরির সুবিধা হইয়াছে, আখের চাষের উন্নতির বিশেষ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে; চারিদিকের পথঘাটের উন্নতি হইয়াছে, এবং এ-কথাও সত্য যে, জমিদারের প্রাপ্য ন্যায্য খাজনা বন্ধ করিয়া কলের মালিক আইন বাঁচাইয়াও যথেষ্ট অন্যায় করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, কোন স্থানের প্রজারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মঘট করিলে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিত, এ-ক্ষেত্রে একক তিনি কৌশলে সেই বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছেন।'

কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না।

উভয় পক্ষই একটির পর একটি নূতন বিবাদ বাধাইয়া চলিলেন। ইন্দ্র রায়ের স্বাভাবিক জীবন আর একরকম হইয়া উঠিল, তাঁহার গোঁফজোড়াটা পাক খাইয়া খাইয়া ভোজালির মত বাঁকা এবং তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া উঠিয়াছে। জমিদারী কাগজপত্র ও ফৌজদারী দেওয়ানী আইনের বইয়ের মধ্যে তিনি ডুবিয়া আছেন। অন্দরমহল পর্যন্ত এ উত্তেজনা সঞ্চারিত হইয়া পড়িয়াছে। নিত্য প্রভাতে আজ আবার নূতন কি ঘটিবে, তাহারই আশঙ্কায় চিন্তায় সকলে কল্পনা-মুখর মস্তিষ্কে শয্যাত্যাগ করিয়া থাকেন।

অহীন্দ্র অমল কলিকাতায়। অমল ভালভাবেই আই. এ. পাস করিয়া বি. এ. পড়িতেছে; অহীন্দ্র পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সে নাকি খাড়া সোজা হইয়া বিদ্যা-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়াছে। অমল ইহার মধ্যে বার দুয়েক বাড়ী আসিল, কিন্তু অহীন্দ্র আসিল না।

হেমাঙ্গিনী অভিযোগ করিয়া বলিলেন, তাকে ধ'রে নিয়ে এলিনে কেন তুই ?

অমল ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, সে হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন—হীরের টুকরো; আমরা হলাম কয়লার কুচো। সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হ'লেও তার স্থান হ'ল সোনার গহনায়, আর আমরা যাব চুলোয়। তার নাগাল আমি পাব কেমন ক'রে, বল ?

হেমাঙ্গিনী একটু আহত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। একটু নীরব থাকিয়া অমল আবার বলিল, জান মা, অহিন আজকাল আমার সঙ্গে ভাল ক'রে মেশেই না। তার এখন সব নূতন সঙ্গী জুটেছে, অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে অহিনের।

হেমাঙ্গিনী দুঃখ অনুভব করিলেন, বলিলেন, অহিনের হয়তো দোষ আছে অমল, কিন্তু দোষ তোমারও আছে। ভগ্নীপতির সঙ্গে

তোমাদের গুষ্টিরই কোনকালে বনে না। ভগ্নীপতির কাছে মাথা নীচু করতে তোমাদের যেন মাথা কাটা যায়!

অমলও একটু আহত হইল, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিল, মায়েরা দেখছি ছেলের চেয়ে জামাইকে ভালবাসে বেশি। বাসো তাতে হিংসে আমি করছি না। কারণ আমারও তো বিয়ে হবে। কিন্তু আমার ওপর তুমি অবিচার করছ, অহিনের কাছে মাথা নীচু করতে আমার লজ্জা নেই। মাথা নীচু করলেও সে আমাকে দেখতে পায় না। দুঃখ হয় আমার সেইখানে।

হেমাঙ্গিনী চুপ করিয়া রহিলেন। এমন কথার পর অমলকে তিনি দোষ দিতে পারিলেন না।

অমল আবার বলিল, অহিনের একটা ঘোর পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সঠিক কিছু বুঝতে পারি না কিন্তু সে অহিন আর নেই। কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব ছিল অহিনের; এখন সেটা যেন একেবারেই মুছে গিয়েছে। এখন তার সব তাতেই বাঁকা ধারালো ঠাট্টা, আর এমন একটা অদ্ভুত হাসি হাসে!

হেমাঙ্গিনী বিস্মিত হইলেন, একটু চিন্তিতও হইলেন।

ঠিক এই সময়েই হেমাঙ্গিনীর ডাক পড়িল; রায় মহাশয় নিজে ডাকিতেছিলেন।—একবার তোমার বেয়ানের কাছে যাও দেখি; ব'লে এস, পুরানো দলিলগুলো একবার দেখা দরকার। মানে, আমাদের রায়-বাড়ীর মূল বণ্টননামায় চক আফজলপুরের কি চৌহদ্দি—

এত সব কথা তোমারি আমিও বুঝি নে, সুনীতিও বুঝবে না। কি বলছ তাই বল। তোমাদের মামলা-মকদ্দমার হাঙ্গামায় আমাদের আহারনিদ্রা সুদ্ধ ঘুচে গেছে।

দলিলের বাক্সগুলো একবার দেখতে হবে। সেগুলো পাঠিয়ে—

না থাক, বলে এস, আমিই যাব সন্ধ্যেবেলায়, দলিলগুলো সব দেখব। রামেশ্বরের ঘরেই যেন বাক্সগুলো বের করিয়ে রাখেন। হ্যাঁ, আরও ব'লো মঙ্গলবারে মা-সর্ব্বরক্ষের পূজো হবে। কালিন্দীর বাঁধের মকদ্দমায় আমাদের একরকম জিতই হয়েছে। বাঁধ দিতে হ'লে বছর বছর একটা ক'রে খাজনা দিতে হবে কলওয়ালাকে; তার অর্দ্ধেক পাবে চক্রবর্ত্তীরা—ও-পারের চরের মালিক হিসাবে, আর অর্দ্ধেক রায়হাটের মালিকেরা পাবে। বর্ষা পড়লেই বাঁধ কেটে দিতে হবে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, যাব; এখন অমল এল, তাকে জল খাইয়ে তারপর যাব। ছেলে বাড়ী এল, তার খোঁজ করা নেই, মামলা নিয়েই মেতে আছ! ধন্য মানুষ তুমি!

রায় বলিলেন, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে অমলের। তিনি হাসিলেন, সে হাসিটুকু একান্তভাবে দোষক্ষালনের জন্য অপ্রতিভের হাসি। তারপর তিনি বলিলেন, কই অমল কই? একখানা আইনের বইয়ের জন্যে লিখেছিলাম—অমল! অমল!—বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন, পদক্ষেপে সিঁড়িটা যেন কাঁপিতেছিল।

হেমাঙ্গিনী সুনীতির কাছে আসিয়া উমার সহিত নির্জ্জনে দেখা করিলেন। অমলের কথা শুনিয়া অবধি উমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন।

উমা একটু বিস্মিত হইল—এমন নির্জ্জনে মা কি বলিবেন? হেমাঙ্গিনী বলিলেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব উমা। সত্যি বলবি তো? আমার কাছে লুকোবি নি তো?

কি মা?

হ্যাঁরে অহিন তোকে চিঠিপত্র লেখে তো?

লজ্জিত হইয়া উমা সবিস্ময়ে বলিল, লেখেন বৈকি মা।

বেশ ভাল ক'রে লেখে তো ?

উমা হাসিয়া ফেলিল। হেমাঙ্গিনী বলিলেন, অমল বলছিল, অহিন নাকি তার সঙ্গে ভাল ক'রে মেশে না। তার নাকি অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

উমা গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, তিনি অনেক কথা ভাবেন মা। অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সেইজন্য বোধ হয়—

কন্যার গৌরব-বোধ দেখিয়া মা তৃপ্ত হইলেন। আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।

* * *

হেমাঙ্গিনী তখনকার মত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পূজার ছুটিতে অহীন্দ্র বাড়ী আসিলে তাহাকে দেখিয়া তিনি মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। অহীন্দ্রের দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাথার চুল বিশৃঙ্খল, শরীরের প্রতি অমনোযোগের চিহ্ন সুপরিস্ফুট ; অমনোযোগ না বলিয়া অত্যাচার বলিলেও অন্যায় হয় না। তাহার শীর্ণ দেহের মধ্যে চোখ দুইটি শুধু জলজল করিতেছে, কৃষ্ণপক্ষের আকাশের রক্তাভ যুগল মঙ্গল গ্রহের মত।

তিনি সস্নেহে অহীন্দ্রের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, শরীর তোমার এত খারাপ কেন বাবা ?

অল্প একটু হাসিয়া অহীন্দ্র বলিল, শরীর ? তারপর আবার একটু হাসিল, আর কোন উত্তর দিল না, যেন হাসির মধ্যেই উত্তর দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, হাসির কথা নয় বাবা, শরীর বাঁচিয়েই সকল কাজ করতে হয়। এই গোটা সংসারটি তোমার মুখপানে তাকিয়ে আছে।

অহিন আবার একটু হাসিল।

হেমাঙ্গিনী যাইবার সময় কন্যাকে সতর্ক করিয়া দিলেন, উমা তুই একটু যত্ন-টত্ন কর্ ভাল ক'রে।

উমা মাথা হেঁট করিয়া নীরব হইয়া রহিল। হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমাদের কালের ঘোমটা-দেওয়া কলাবউ তো ন'স। বেশ ক'রে রাশ একটু বাগিয়ে ধরবি, তবে তো।

হেমাঙ্গিনী চলিয়া গেলে উমা মৃদু মৃদু হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, অহীন্দ্র বলিল, সুস্বাগত বাঙ্গালিনী!

গুড আফ্‌টার্‌নূন সায়েব। চমৎকার শরীরের অবস্থা কিন্তু সায়েবের।

বাঙালিনীর অভাবে সায়েবের এই অবস্থা। এখন তো কাছে পেয়েছ, এইবার বেশ গ্র্যাস-ফেড মাটন ক'রে তোল।

উমা হাসিয়া বলিল, উঁহু, মাটন না, ওয়েল-ফেড হস। মা ব'লে গেলেন রাশ টেনে ধরতে। হাড়পাঁজরা ঝুরঝুরে আকাশে-ওড়া পক্ষিরাজকে মাটিতে নামতে হবে।

এবং নাদুসনুদুস হয়ে বাঙালিনীকে পিঠে নিয়ে থুপথুপ ক'রে চলতে হবে।

ঘর পরিষ্কার করিয়া বিছানা করিবার জন্য দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল মানদা। উমা একটু সরিয়া দাঁড়াইল। মানদা অহীন্দ্রকে দেখিয়া গালে হাত দিয়া বলিল, কি চেহারা হয়েছে দাদাবাবু!

সুনীতি কিছু বলিলেন না, কেবল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কয়েক দিন পরেই উমাও যেন কেমন শুষ্ক বিশীর্ণ হইয়া উঠিল। সেও সুনীতি দেখিলেন।

অবশেষে একদিন রাত্রির অন্ধকারে মা আসিয়া ছেলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কোজাগরী পূর্ণিমা পার হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে অমাবস্যা আগাইয়া আসিতেছে; সেই অন্ধকারের মধ্যে ছাদে অহীন্দ্র একা

বসিয়া ছিল। এমনই করিয়া সে এখন একা অন্ধকারে বসিয়া থাকে। কাছারি-প্রাঙ্গণের নারিকেল-বৃক্ষশীর্ষগুলি ছাদের আলিসার অল্প দূরে শূন্যলোকে জটাজূটময় অশরীরীবৃন্দের মত স্তব্ধ হইয়া—যেন সভা করিয়া বসিয়া আছে; ঝাউগাছ দুইটার শীর্ণ দীর্ঘতনুময় শীর্ষদেশ হইতে ছেদহীন কাতর দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহারই মধ্যে সুনীতি নিঃশব্দে অহীন্দ্রের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অহীন্দ্র জানিতে পারিল না।

সুনীতি ডাকিলেন, অহিন!

চমকিত হইয়া অহীন্দ্র মুখ ফিরাইয়া বলিল, মা?

হ্যাঁ, আমি।

এস মা, ব'স। কিছু বলছ?

বলব। অন্ধকারে অহীন্দ্র মায়ের মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরের সুরে সে বেশ অনুভব করিল যে, তাঁহার মুখে সেই বিচিত্র করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে হাসি তাহার মা ছাড়া বোধ হয় এ পৃথিবীতে কেহ হাসিতে পারে না।

সুনীতি ছেলের পাশে বসিলেন, তাহার মাথাটি আপনার কোলের উপর টানিয়া লইয়া রুক্ষ চুলগুলি সযত্নে বিন্যস্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, তোর কি হয়েছে বাবা?

কিছুই তো হয় নি। অহীন্দ্রের কণ্ঠস্বরে কপটতার লেশ ছিল না।

তবে?

কি মা?

তুই আমাদের কাছ থেকে এমন দূরে চ'লে যাচ্ছিস কেন বাবা?

দূরে চ'লে যাচ্ছি?—সবিস্ময়ে অহীন্দ্র প্রশ্ন করিল।

হ্যাঁ। মা বলিলেন, হ্যাঁ, দূরে চ'লে যাচ্ছিস, আমরা যেন তোর নাগাল পাচ্ছি নে।

অহীন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। মা আবার বলিলেন, প্রথমে ভেবেছিলাম, বুঝি তুই আমার কাছ থেকেই স'রে গেছিস। বউমা—। কণ্ঠস্বরে তাঁহার লজ্জার বেশ ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, বিয়ের পর বউয়ের ওপর ছেলের একটা টান হয়, তখন মায়ের কাছ থেকে ছেলে একটু স'রে যায়। আমি ভেবেছিলাম তাই। কিন্তু বউমার মুখ দেখে বুঝলাম, তাও তো নয়। মাঝে মাঝে তাহার হাসিমুখ দেখি, কিন্তু আবার দেখি তার মুখ শুকনো। আমি বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি অহিন, শুকনো মুখই তার বেশির ভাগ সময় চোখে পড়ে।

অহীন্দ্র যেমন স্তব্ধ হইয়া ছিল, তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিল। কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া মা বলিলেন, উমা তো অপছন্দের মেয়ে নয় অহিন!

না মা, না। উমাকে নিয়ে আমি অসুখী নই তো। অহীন্দ্রের কণ্ঠস্বরে আন্তরিক শ্রদ্ধার আভাস ফুটিয়া উঠিল।

তবে? মা প্রশ্ন করিলেন, তবে?

তবে? কি উত্তর আমি দেব মা? কথা শেষ করিয়া মুহূর্ত্ত পরেই সে সচকিত হইয়া উঠিল, বলিল তুমি কাঁদছ মা? তাহার কপালের উপর অশ্রু-বিন্দুর উষ্ণ স্পর্শে সে চমকিয়া উঠিল।

মা বলিলেন, নিরুচ্ছ্বসিত অথচ উদাস কণ্ঠস্বরে, জানি নে তুই আমার কাছে লুকোচ্ছিস কি না, কিন্তু তোর সমস্ত চেহারার মধ্যে এক নতুন মানুষ ফুটে উঠেছে অহিন। তুই কি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভাল ক'রে দেখিস নি? আমার সর্ব্বশরীর শিউরে ওঠে মধ্যে মধ্যে তোর চোখের দৃষ্টি দেখে।

অহীন্দ্র বলিল, আমি আজকাল একটু বেশি চিন্তা করি, সে-কথা সত্যি। কিন্তু আমার দৃষ্টির কথা কিংবা আমি নাগালের বাইরে, এ-সব তোমার কল্পনা মা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মা বলিলেন, কি জানি! কিন্তু আমার মন কেন এমন হয়ে উঠছে অহিন? যেন আমার কত দুঃখ কত শোক! দুঃখ আমার অনেক, কিন্তু যাদের জন্যে দুঃখ, তাদের মুখ তো মনে পড়ে না আমার! তোর মুখই কেন চোখের ওপর ভেসে ওঠে?

জীবনে তুমি কঠিন আঘাত পেয়েছ মা, সে আঘাতের বেদনা এখনও তুমি সহ্য ক'রে উঠতে পার নি, ও-সব চিন্তা তারই ফল। তুমি কেঁদো না, তোমার কান্না আমি সইতে পারি নে।

কিন্তু তুই এত কি ভাবিস, আমায় বল দেখি?

ভাবি? অহীন্দ্র হাসিল, বলিল, তুমি যা ভাবতে শিখিয়েছ, তাই ভাবি। আর কি ভাবব? ভাবি, মানুষের দুঃখকষ্টের কথা। মানুষ মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচার করে, সেই কথা ভাবি।

সুনীতি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। দুঃখ তাঁহার গেল না, কিন্তু শোকের মধ্যে সান্ত্বনার স্নেহস্পর্শের মত সন্তানগর্ব্বের একটি নিরুচ্ছ্বসিত আনন্দ তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, আশীর্ব্বাদ করি, তুই মানুষের দুঃখ দূর কর্।

আবার তাঁহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল; কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিয়া তিনি বলিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখিস বাবা, আমরা—আমি, উমা—

মা! মা রয়েছেন নাকি? আচ্ছা মানুষ বাপু আপনি! সুনীতির কথায় বাধা দিয়া মানদা ঝি ঝঙ্কার দিতে দিতে ছাদের দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কথার সুর ও ভঙ্গির মধ্যে বক্তব্যের স্বরূপের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকে, মানদার কথায় সুনীতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কি রে মানদা?

বাবা! এই অন্ধকারে মায়ে-পোয়ে ছাদে ব'সে রয়েছেন তা কি ক'রে জানব, বলুন? সারা বাড়ী খুঁজে হায়রান। দাদাবাবুর শ্বশুর

এসেছেন, শাশুড়ী এসেছেন, খুঁজছেন আপনাকে। দাদাবাবুর সম্বন্ধী এসেছেন।

ব্যস্ত হইয়া সুনীতি বলিলেন, নীচে আয় অহিন ;—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, অহীন্দ্রও তাঁহার অনুসরণ করিল। কোথাও কিছু পড়িয়া আছে কি না দেখিতে দেখিতে মানদা আপন মনেই বলিল, কথায় বলে 'কাতির শিশিরে হাতী পড়ে'। কাত্তিক মাসের শিশির মাথায় ক'রে এই অন্ধকারে আচ্ছা মানুষ বাবা!

* * *

রায় আসিয়াছিলেন বৈষয়িক প্রয়োজনে ; মামলা পরিচালনা সম্পর্কে একটি বিশেষ পরামর্শ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। রামেশ্বরের ঘরে তিনি বসিয়া আছেন। ঘরের মধ্যে মৃদু প্রদীপের আলো তেমনি জ্বলিতেছে, রামেশ্বর খাটের উপর বসিয়া আছেন। রায়ের অদূরে রামেশ্বরের খাটের সম্মুখে অতি নিকটেই বসিয়া আছেন হেমাঙ্গিনী ; উমা ঘরের কোণে টেবিলের উপর বই গুছাইয়া রাখিতেছে। শ্বশুর ও পুত্রবধূতে মিলিয়া কাব্যালোচনা হইতেছিল। উমার কল্যাণে রামেশ্বর অল্প একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

সুনীতি যখন ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন সদ্য কোন হাস্যপরিহাস শেষ হইয়াছে, সকলের মুখেই হাসির রেখা ফুটিয়া রহিয়াছে। হেমাঙ্গিনী অপ্রতিভ মুখে হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, কথায় আপনার সঙ্গে কেউ পারবে না। আমি হার মানছি।

রামেশ্বর হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে আপনার কাছে আমার মিষ্টান্ন প্রাপ্য হ'ল।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, মিষ্টান্ন আমাকেই আপনার খাওয়ানো উচিত কারণ আপনি জিতেছেন।

রামেশ্বর হাসিয়া একটি কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আপনার

কথায় বড়ই দুঃখ পেলাম দেবী। রায় হ'ল রাজশব্দের অপভ্রংশ ; রায়-গিন্নী আপনি, আপনি হলেন রাণী। মিষ্টান্ন বস্তুটা চিরদিন রাণী এবং রাজকুল কথায় পরাজিত হয়ে বয়স্যগণকে করস্বরূপ প্রদান ক'রে এসেছেন। আজ সেই বস্তুর দিকে যদি আপনার হস্ত প্রসারিত হয়, তবে সে হস্তকে রাজহস্তে সমর্পণ করা ছাড়া তো গত্যন্তর দেখি না।

হেমাঙ্গিনী ঘরের মধ্যে উমার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, তাহাকে সরাইয়া দিবার জন্যই বলিলেন, উমা, অমল বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখ্ তো মা।

উমা চলিয়া গেল, উমার নাম উচ্চারণে রামেশ্বর সংযত হইয়া উঠিলেন।

রায় হাসিতেছিলেন, তিনিও অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া কাজের কথা পাড়িয়া বসিলেন, এমনি একটি সুযোগের প্রতীক্ষাই যেন তিনি করিতেছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, গলা ঝাড়িয়া লইয়া তিনি বলিলেন, রামেশ্বর, তোমার সঙ্গে কয়েকটি জরুরী বিষয় আলোচনার জন্যে এসেছি।

গম্ভীরভাবেই রামেশ্বর হাসিলেন, বলিলেন, চক্ষুষ্মান পথভ্রান্ত হ'লে নিরুপায়ে অন্ধের কাছেও পথ জিজ্ঞাসা করে। কি বলছ, বল? দিক বলতে না পারি, সম্মুখ পশ্চাৎ দক্ষিণ বাম—এগুলো বলতে পারব। পথের পারিপার্শ্বিক চিহ্নের কথা বলতে পারব না, তবে বন্ধুরতার বিষয় বলতে পারব।

রায় বলিলেন, মানমর্য্যাদা নিয়ে মকদ্দমা, অথচ টাকার অভাব হয়ে পড়ল রামেশ্বর! আমার হাত পর্য্যন্ত শুকনো হয়ে এল। এ ক্ষেত্রে—

রামেশ্বর বলিলেন, অধর্ম্মকে বর্জ্জন ক'রে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপী রামের শরণাপন্ন হয়েও বিভীষণ অমর হয়ে কলঙ্ক বহন করেছেন।

মামলা শেষ পর্য্যন্ত লড়তেই হবে ইন্দ্র। টাকা না থাকে ঋণের ব্যবস্থা কর।

না। রায় গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। ঋণ করতে গেলে শেষ পর্য্যন্ত ওই কলওয়ালার কবলস্থ হতে হবে। লোকটা ধরাট দিয়েও সে-খত কিনবে। সুদখোরদের মত ধূর্ত্ত এবং লোভী এ সংসারে আমি তো কাউকে দেখি না, তারা অর্থের লোভে সব করতে পারে ; এ খত তো তারা বিক্রি করবেই !

রামেশ্বর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ! রায় বলিলেন, মহলে যে-সব খাসজোত আছে, তারই কিছু বন্দোবস্ত ক'রে দেওয়াই কি ভাল নয় ?

রামেশ্বর কোন উত্তর দিলেন না। তিনি চিন্তা করিতেছিলেন, কিছুক্ষণ পরই তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। শূন্য অর্থহীন স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন।

রায় তাঁহাকে ডাকিলেন, রামেশ্বর !

রামেশ্বর নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ইন্দ্র !

তা হ'লে তাই করি, কি বল ?

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাটা স্মরণ করিয়া সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হ্যাঁ, সেই ভাল। ঋণ—না, ভাল নয়। শেষ পর্য্যন্ত বডিওয়ারেন্ট করে।

বাতাসেরও কান আছে। জমি বন্দোবস্তের কথা প্রকাশ করিয়া জানাইতে হইল না। অথচ সমস্ত গ্রামময় কথাটা রটিয়া গেল।

দুই-তিন দিন পরেই গ্রামের চাষীরা ছুটিয়া আসিয়া পড়িল, 'জমি যখন বন্দোবস্তই করবেন, তখন চরের ওই ভাগে বিলি করা জমিটা আমাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিন। এক-শ বিঘা জমির বিঘা-পিছু ত্রিশ

টাকা হিসাবে সেলামি এবং দুই টাকা হারে খাজনা দিতে আমরা প্রস্তুত।' দলটির সর্ব্বাগ্রে ছিল রংলাল।

রায় ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, এত টাকা তোরা পাবি কোথায়? রংলাল বলিল, আজ্ঞে, আমরা তিরিশ জনায় লোব। জনাহি এক-শ টাকা আমরা যোগাড় কোনরকমে করব।

গভীর ব্যগ্রতায় সে রায়ের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল, হেই হুজুর! নইলে এ চরণ আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

রায় বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এত বেশি টাকা অন্য মহলে জমি বন্দোবস্ত করিয়া পাওয়া যাইবে না। তা ছাড়া চাষীরাও গোলাম হইয়া থাকিবে।

যোগেশ মজুমদার আসিয়া পাঁচ হাজার টাকা সেলামি দিতে চাহিল, কিন্তু রায় হাসিয়া বলিলেন, না!

৩৩

আরও মাস তিনেক পর।

মাঘ মাসের প্রথমেই একদিন প্রাতঃকালে কলের মালিক অকস্মাৎ সমস্ত চরটাই দখল করিয়া বসিলেন, রংলাল-প্রমুখ চাষীরা যে-জমিটা অল্পদিন পূর্ব্বে জমিদারের নিকট বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল, সে-অংশটা পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইলেন।

মোটর-সংযুক্ত বিলাতী লাঙল চালাইয়া চরের সমস্ত আবাদী জমি এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত চষিয়া এক করিয়া দিল। সংবাদ পাইয়া সমগ্র রায়হাট গ্রামখানাই বিস্ময়ে কৌতূহলে উত্তেজনায় মাতিয়া উঠিল। চরের উপর কলের লাঙল আসিয়াছে। গরু নাই, মহিষ নাই, কোন লোক লাঙলের মুঠা ধরিয়া নাই, অথচ চাষ হইয়া চলিয়াছে। কেবল একজন লোক গাড়ীর মত কলটার উপর বাবুর

আরামে বসিয়া আছে, হাতে পায়ে দু-একটা কল ঘুরাইতেছে টিপিতেছে, আর গাড়ীটা চলিতেছে, পিছনে ইয়া মোটা মোটা মাটির চাঁই উল্টাইয়া পড়িতেছে। ওটা নাকি মোটরের লাঙল, ঠিক মোটরের মত ধোঁয়া ছাড়ে শব্দ করে। ভটভট শব্দ করিয়া বুনো শূকরের মত এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া চলিয়াছে; বাধাবিঘ্ন বলিয়া কিছু নাই, উঁচু-নীচু খাল-ঢিপি সব উথড়াইয়া দিয়া চলিয়াছে।

গ্রামের আবালবৃদ্ধ কালিন্দীর ঘাট হইতে চর পর্য্যন্ত ভিড় জমাইয়া ছুটিয়া আসিল। বনিতারা সকলে না আসিলেও অনেকে আসিয়াছিল। তাহারা কালিন্দীর এ-পারেই দাঁড়াইয়া ছিল। চাষীদের বউগুলি দাঁড়াইয়া ঘোমটার অন্তরালে কেবলই কাঁদিতেছিল। তাহারা কল দেখিতে আসে নাই, তাহারা দেখিতেছিল, তাহাদের জমি চলিয়া যাইতেছে। দূরান্তর হইতে প্রিয়জনের মৃত্যুশয্যার শিয়রে যেমন মানুষ আসিয়া অঝোরঝরে কাঁদে, আর নির্নিমেষ নেত্রে মৃত্যুপথযাত্রীর দিকে চাহিয়া থাকে, এ দেখিতে আসা তাহাদের সেই দেখিতে আসা। তাহাদের চোখে সেই মমতাকাতর দৃষ্টি। চাষীরা কিন্তু আসে নাই! সমবেত জনতা প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যাশা করিতেছিল, চাষীদের সঙ্গে ছোট রায়-বাড়ী ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর পাইকেরা রে-রে করিয়া আসিয়া পড়িল বলিয়া। কিন্তু বহুক্ষণ চলিয়া গেল, তবু কেহ আসিল না। ও-দিকে চরটা সমস্তই চষিয়া ফেলিয় কলটা স্তব্ধ হইল।

রায়-বাড়ীর ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীরা পাইকদের না আসিবার কারণ ছিল। তাহারা আর কোনদিন আসিবে না। চর লইয়া জমিদার ও কলের মালিকের দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। জমিদার-পক্ষ সমস্ত মামলায় হারিয়া গিয়াছেন। গত কাল অপরাহ্নে বিচারকের রায় বাহির হইয়াছে, সংবাদটা এখনও সকলের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই।

মামলায় পরাজয়ের সংবাদ সুনীতিও জানিতেন না। ইন্দ্র রায় সে-সংবাদ এখনও তাঁহাকে জানাইতে পারেন নাই, সুনীতি কেন, হেমাঙ্গিনীকেও জানাইতে তাঁহার বাধিয়াছে। কলের মালিক কলের লাঙল চালাইয়া চর দখল করিতেছেন। সংবাদ পাইয়া সুনীতি নূতন দাঙ্গাহাঙ্গামার আশঙ্কায় উদ্বেগে অস্থির হইয়া উঠিলেন। ভাঁড়ার বাহির করিতে গিয়া তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল। নীরবে নতমুখে বঁটির উপর বসিয়া উমা শ্বশুরের জন্য আনারস ছাড়াইয়া কুটিতেছিল। এমন সময় মানদা ছড়া কাটিয়া ভণিতা করিয়া বাড়ী ফিরিল ; সেও কলের লাঙল দেখিতে গিয়াছিল। চোখ দুইটি বড় করিয়া গালে হাত দিয়া বলিল, 'যা দেখি নাই বাবার কালে, তাই দেখালে ছেলের পালে!' কালে কালে আরও কত হবে, বেঁচে থাকলে আরও কত দেখব।

সুনীতি ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন, কোনও খুনখারাপি হয় নি তো রে ?

না গো না। কেউ যায়ই নাই। দিব্যি কলের লাঙল চালিয়ে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্য্যন্ত চ'ষে নিলে কলওয়ালা।

সুনীতি পরম স্বস্তিতে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। মানদার আসল বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই। সে বলিয়াই গেল, গরু নাই, মোষ নাই, চাষা নাই, লাঙলের ফাল নাই—এই একটা গাড়ীর মতন, ফটফট শব্দ ক'রে চলছে, আর জমি চাষ হয়ে যাচ্ছে। এক দণ্ডে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্য্যন্ত চাষ হয়ে গেল।

উমা মৃদু হাসিয়া বলিল, ওটা হ'ল মোটরের লাঙল, মোটর গাড়ী তো আপনি চলে দেখেছ, এও তেমনি চলে। নীচে বড় বড় ধারালো ইস্পাতের ছুরি লাগানো আছে, মোটরটা চলবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো মাটি কেটে উল্টে দিয়ে যায়।

মানদা সবিস্ময়ে মৃদুস্বরে বলিল, তাই সবাই বলছে বউদিদি।

আর ধোঁয়া ছাড়ছে কলটা, তার গন্ধ নাকি অবিকল মোটরের ধোঁয়ার গন্ধের মত। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার সে বলিল, আঃ, অনাথা গরু-মোষের অন্নই মারা গেল, আর কি!

সকৌতুকে উমা মানদার দিকে চাহিল, মানদা বলিল, গরু-মোষ তো আর কেউ পালবে না বউদিদি, না খেতে পেয়েই ওরা ম'রে যাবে!

উমা এবার বেশ একটু জোরেই হাসিয়া উঠিল, সুনীতি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা এতে এমন ক'রে হাসছ কেন বউমা? ও-বেচারার যেমন বুদ্ধি তেমনি বলছে।

মানদা এমন একটি সমর্থন পাইয়া বেশ জাঁকিয়া উঠিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু নবীন বাগ্দীর স্ত্রী মতি বাগ্দিনী হন্তদন্ত হইয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়ায় সে-কথা তাহার বলা হইল না। মতির মুখে চোখে প্রচণ্ড উত্তেজনার উচ্ছ্বাস; সে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল, রাণীমা!

কি রে? কি হয়েছে বাগ্দীবউ? সুনীতি শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন। চরে কি আবার—

চরে নয় মা; রংলাল মোড়লের এক-পাটি দাঁত লাথি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন রায়-হুজুর।

সে কি? কেন?

ওই চরের জমির লেগে মা। চরের জমি নিয়ে চাষীরা নাকি কলের সায়েবের সঙ্গে কি ষড় করেছিল! সায়েব আজ চর দখল করেছে কিনা! তাই জানতে পেরে—

সুনীতির মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। রংলালের মুখ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, নির্ব্বোধ দৃষ্টি, ঘোলাটে চোখ, পুরু ঠোঁটে বিনীত তোষামোদ-ভরা হাসি; আহা,

সেই মানুষকে—! টপটপ করিয়া চোখের জল মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল।

উমা বঁটি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে জমিদার-কন্যা, জমিদার-বধূ হইলেও নবীন যুগের মেয়ে, তাহার উপর মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল অহীন্দ্রকে। মানুষের মুখে লাথি মারার কথা শুনিয়া সে যে কি বলিবে; হয়তো কিছু বলিবে না, কিন্তু অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে, ক্ষুরধার মৃদু হাসি হাসিবে। সে বলিল, আমি একবার ও-বাড়ী যাব মা।

সুনীতি বলিলেন, মানদা, সঙ্গে যা মা। তুমি দেখো বউমা, আর যেন কোন উৎপীড়ন না হয় গরীবের ওপর। বলো, ও-চর আমি চাই না, ও যাওয়াই ভাল।

উমা ও মানদা চলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে মতিও গেল। মতি এখন সাধ্যমত প্রহরিণীর কাজ করিয়া স্বামীর কাজ বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। প্রয়োজন হইলে লাঠি হাতে লইতেও লজ্জিত হয় না।

সুনীতি স্তব্ধ উদাস হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সর্ব্বনাশা চর! ওই চরের জন্যই এত। তাঁহার মনে পড়িল, এই চর লইয়া দ্বন্দ্বের প্রথম দিন হইতেই রংলাল জড়িত আছে। খানিকটা জমির জন্য বেচারা চাষীর কি লোলুপ আগ্রহ! নবীনদের দাঙ্গার মকদ্দমাতেও রংলাল জড়িত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়িয়া গেল একদিনের কথা। নবীনদের মকদ্দমার সময়েই একদিন তিনি চরটাকে যেন ঘুরিতে দেখিয়াছিলেন; এই বাড়ীটাকেই কেন্দ্র করিয়া চক্রান্তের চক্র সৃষ্টি করিয়া ঘুরিতেছিল। সেটা কি আজও ঘুরিতেছে? নহিলে ওই নিরীহ চাষীর মুখ দিয়া এমন করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িল কেন? সর্ব্বনাশা চর!

তাঁহার ভাবপ্রবণ অনুভূতিকাতর মন শিহরিয়া উঠিল। না, ও-চরের

সঙ্গে আর কোন সংস্রব তিনি রাখিবেন না। অহীন্দ্রকে তিনি আজই পত্র লিখিবেন, সে আসুক, চর বিক্রয় করিবার জন্য সে আসুক।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, সে আজ পনেরো দিনের উপর পত্র দেয় নাই। সে আজকাল কেমন যেন হইয়াছে!

* * *

প্রাতঃকাল হইতেই রায় গুম হইয়া বসিয়া ছিলেন।

ভোর রাত্রে সদর হইতে মামলার সংবাদ লইয়া লোক ফিরিয়া আসিয়াছে। সমস্ত মামলাতেই জমিদার-পক্ষ পরাজিত হইয়াছেন। চর লইয়া সমস্ত দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। মাথা হেঁট করিয়া নিস্পন্দের মত তিনি বসিয়া রহিলেন। তাহার পরই সংবাদ আসিল, কলের মালিক মোটর-লাঙ্গল চালাইয়া চর দখল করিতেছে, এমন কি হালে বন্দোবস্ত করা চাষীদের জমিও দখল করিয়া লইতেছে। রায় সোজা হইয়া বসিলেন, আবার একটা সুযোগ মিলিয়াছে। চাষীদের সম্মুখে রাখিয়া আর একবার লড়িবেন তিনি। নায়েব মিত্তিরকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, জলদি বাগ্দীদের আর কাহারদের তলব দাও। আর চাষীদের ডাকাও দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটিল। রায় আবার গোঁফে পাক দিতে আরম্ভ করিলেন। চেয়ার ছাড়িয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের জন্য প্রতীক্ষমান গুহাচারী অস্থির বাঘের মত বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ করিলেন। ঠিক এই সময়েই রংলাল আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, ডাকিবার পূর্ব্বে সে নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

রায় সস্নেহে বলিলেন, ওঠ্ ওঠ্ ভয় নেই। আমি লাঠিয়াল দিচ্ছি, তোদের কিছু করতে হবে না, তোরা কেবল দাঁড়িয়ে থাকবি, দেখবি। টাকা পয়সা সমস্ত খরচ আমার, কোনও ভয় নেই তোদের।

রংলাল ভেউভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল, আমরা যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি হুজুর!

রায় চমকিত হইয়া উঠিলেন, এই নির্ব্বোধদের তিনি ভাল করিয়াই জানেন। ইহাদের সকলের চেয়ে বড় নির্ব্বুদ্ধিতা এই যে, ইহারা নিজেদের ভাবে অতি বুদ্ধিমান—ভীষণ চতুর। বৈষয়িক জটিল বুদ্ধির প্রতি, কুটিল চাতুরির প্রতি ইহাদের গভীর আসক্তি। সচকিত হইয়া রায় বলিলেন, কি করেছিস, সত্যি ক'রে বল দেখি? সত্যি কথা বলবি। ছাড়, পা ছাড়, তিনি আবার চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

হাতের তালুর উল্টা পিঠ দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে রংলাল বলিল, আজ্ঞে হুজুর, ওই মজুমদারের ধাপ্পায় প'ড়ে, উনিই বললেন, হুজুর—

মজুমদার কি বললে?

টাকার ভাবনা কি? আমি টাকা দেব।

কিসের টাকা?

আজ্ঞে, সেলামির টাকা। আমাদের টাকা ছিল না হুজুর। উনিই আমাদিগে টাকা দিয়েছিলেন। আমাদের 'বাপুতি' সম্পত্তি বন্ধক নিয়ে দলিল ক'রে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, চরের জমি বন্দোবস্ত হয়ে গেলে এ দলিল ফেরত দিয়ে চরের জমি বন্ধক দিয়ে দলিল ক'রে দিতে হবে। এখন নতুন দলিলে সই করিয়ে নিয়ে বলছে হুজুর, বন্ধক নয়, জমি তোদের বিক্রি হয়ে গেল, এ দলিল কবলা-দলিল।

অজগরের মত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রায় বলিলেন, হুঁ।

হুজুর, আমাদের কি হবে?

দলিল তোরা রেজেষ্ট্রি করিস নে।

দলিল যে রেজেষ্টারী হয়ে গেল হুজুর। নইলে যে সাবেক বন্ধকী

দলিল ফেরত দিচ্ছিল না। রংলাল আবার ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

রায় রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত বসিয়া রহিলেন। এই নির্ব্বোধ অথচ কূটমতি অপদার্থগুলির উপর ক্রোধের তাঁহার আর সীমা রহিল না। তাঁহার জমিদার-মন হতভাগ্যের নিরুপায় দিকটা দেখিতে পাইল না। হতভাগ্য অন্ধ বাঘের লেজে পা দিলে বাঘ তাহার অন্ধত্ব দেখিতে পায় না

রংলাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, রায়ের কোন উত্তর না পাইয়া সে আবার তাঁহার পা দুইটি চাপিয়া ধরিল। আর রায়ের সহ্য হইল না, প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন, রংলালের মুখে সজোরে লাথি মারিয়া আপনার পা ছাড়াইয়া লইলেন। সেই আঘাতে রংলালের সম্মুখের দুইটা দাঁত উপড়াইয়া গিয়া তাহার নির্ব্বোধ মুখখানাকে রক্তাক্ত করিয়া দিল।

হেমাঙ্গিনী কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু উমা করিল। বাপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ছি ছি ছি, এ কি করলেন বাবা? সে যাই হোক, সে তো মানুষ!

রায় নীরবে ঘরের মধ্যে একা পদচারণা করিতেছিলেন, তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মেয়ের মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, পাপ করেছি মা। মানুষ আমি, মতিভ্রম হয়েছিল। কিন্তু রংলালের পায়ে ধ'রে প্রায়শ্চিত্ত তো করতে পারব না।

এ কথার উত্তরে উমা আর কিছু বলিতে পারিল না, সে যেন এতটুকু হইয়া গেল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রায় ডাকিলেন, তারা, তারা মা!

উমা এবার লজ্জিত হইয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, আপনি একটু বসুন বাবা, আমি বাতাস করি।

রায় হাসিলেন, কিন্তু কন্যার কথা উপেক্ষা করিলেন না, বসিলেন। বসিয়া বলিলেন, মানুষের দিন যখন শেষ হয়, তখন এমনি ক'রেই মতিভ্রম হয়। আমাদের দিন শেষ হয়েছে মা।

উমা শিহরিয়া উঠিল, বলিল, ও কি বলছেন বাবা?

মরণের কথা বলছি না মা; আমাদের সুদিনের কথা বলছি। চাষীরা সব আমাদের বিপক্ষ হয়ে কলের মালিকের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। অথচ একদিন খুন করলেও তারা আমাদের বিপক্ষে কথা বলে নি, বিচার ব'লে মেনে নিয়েছে।

উমা চুপ করিয়া রহিল।

রায় বলিলেন, আজ একটা কথা মুখ দিয়ে বের করতে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে মা। অথচ তোর শ্বশুর-শাশুড়ীকে বলতেই হবে। তুইই সে কথাটা বলে দিবি মা?

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া উমা বলিল, বলুন।

চরের সমস্ত মোকদ্দমায় আমাদের হার হয়েছে মা।

উমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বলব।

আমার অনেক লজ্জা মা। জেদের বশে তোর শ্বশুরদের আমি অনেক অনিষ্ট ক'রে দিলাম। সম্পত্তি তো শুধু অহীন্দ্রের নয়, মহীন্দ্রও ফিরে আসবে। লজ্জা আমার তার কাছেই হবে বেশি। আমার ইচ্ছে কি জানিস? আমার ইচ্ছে, আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমি অহীন্দ্রকে উপলক্ষ ক'রে ওদের দুজনকেই দিই। অহীন্দ্রের শ্বশুর হিসেবে নয়, সুনীতির ভাই সম্বন্ধ নিয়েই দিতে চাই।

উমা বলিল, বেশ তো, বিবেচনা ক'রে যা হয় করবেন। কিন্তু কিছুদিন যাক, নইলে ওঁরা ভাববেন, আপনি ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন।

রায় হাসিয়া বলিলেন, কিছুদিন সময় আর আমার নেই মা। আমি আর সংসারে থাকব না, আমি কাশী যেতে চাই।

উমা মৃদুস্বরে বলিল, সংসারে হারজিত তো আছেই বাবা। তার জন্যে কাশী কেন যাবেন?

হেমাঙ্গিনী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে শরবতের গ্লাস। উমা আসিয়াছে এই সুযোগে তিনি রায়কে শরবত খাওয়াইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

রায় বলিলেন, আজ আহ্নিকে ব'সে জপ ভুলে গেলাম, মায়ের রূপ ধ্যান করতে পারলাম না। শুধু বললাম, চর চর, মামলা মামলা; আর ধ্যান করলাম, ওই রংলাল আর কলওয়ালার মুখ। আর নয়, আর সংসার নয় মা, আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি, আমি কাশী যাব।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বেশ তাই হবে। কিন্তু সে তো আর এখুনি নয়। এখন শরবতটা খাও দেখি।

* * *

চরের মামলায় পরাজয় হইয়াছে, চরটার সহিত সকল প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে—সংবাদটা শুনিয়া সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাস। অথচ এই কামনাই তিনি কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই নয়, চর লইয়া দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইবার পর হইতেই অহরহই করিয়া আসিয়াছেন। বার বার তিনি মনে করিতে চেষ্টা করিলেন, ভালই হইয়াছে, ভাগ্যবিধাতা নিষ্ঠুর চক্রান্ত হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন। কিন্তু স্মৃতির মমতা তাঁহাকে তাহা ভাবিতে দিল না। তাঁহার মহীন্দ্র দ্বীপান্তরে গিয়াছে ওই চরের জন্য, নবীন গিয়াছে ওই চরের জন্য, তিনি নিজে প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়াইয়াছেন ওই চরের জন্য। সংসারে চরম দুঃখের বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায়, তাহার এক পরম মূল্য আছে।

আজ অহরহ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল মহীন্দ্রকে। দিনান্তে সন্ধ্যার সময় তিনি আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। ও-পারের চরের উপর আজ বাজনা বাজিতেছে, আনন্দোন্মত্ত মানুষের কোলাহল ভাসিয়া

আসিতেছে। হিন্দুস্থানীদের ঢোলক বাজিতেছে, আরও অনেক বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি যেন শোনা যাইতেছে। কলের মালিক বোধ হয় বিজয়োৎসব জুড়িয়া দিয়াছে। তিনি ছাদে গিয়া উঠিলেন, ছাদ হইতে চর, কালিন্দীর গর্ভ পরিষ্কার দেখা যায়। বাদ্যযন্ত্র ও কোলাহলের শব্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, দূরে চরের উপর আলো জ্বলিতেছে, আলোর ঘটা আজ অনেক বেশী। কালিন্দীর শুষ্ক গর্ভে বালির উপর একটা আলোর সমারোহ, মশালের আলোর মত দুই-তিনটা আলো জ্বলিতেছে—রক্তাভ আলো আলোর চারিপাশে ক্ষুদ্র একটি জনতা, সেই জনতার মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়ে হাত ঘুরাইয়া, দেহ বাঁকাইয়া নানা ভঙ্গিতে নাচিতেছে।

মা!

সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন, কে? পরক্ষণেই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বউমা?

উমাই ডাকিতেছিল, সে বলিল, এই আলোয়ানখানা গায়ে দিন মা, বড় কনকনে হাওয়া দিচ্ছে।

সত্য, এবার শীতটা বেশ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সুনীতি আলোয়ানখানি গায়ে দিয়া সস্নেহে বধূর দিকে চাহিয়া রহিলেন। উমা আজ মনে মনে লজ্জিত হইয়া ছিল, তাহার বাবা আজ সকালে যে বলিয়াছিলেন, 'আমি জেদের বশে ওদের অনেক ক্ষতি ক'রে দিয়েছি,' সেই কথাটা তাহার মনের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছে। সে মাথা হেঁট করিল। অন্ধকারের মধ্যে সুনীতি উমার মুখ দেখিতে পাইলেন না বলিয়া কিছু বুঝিতে পারিলেন না। সস্নেহেই তিনি প্রশ্ন করিলেন, আর কিছু বলছ বউমা?

না।—বলিয়া সে মন্থর পদক্ষেপে সিঁড়ির দরজা অতিক্রম করিয়া

নীচে নামিয়া গেল। এ-পাশে সুনীতির সম্মুখে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর কাছারির প্রাঙ্গণে নারিকেলগাছগুলির মাথা, অন্ধকারের মধ্যে জটাজটধারী তমোলোকবাসীদের মত শূন্যলোকে সভা করিয়া বসিয়া আছে, দীর্ঘ পাতাগুলির মধ্যে কি যেন গোপন কথার কানাকানি চলিতেছে! সুদীর্ঘ ঝাউগাছ দুইটা মর্ম্মন্তুদ বেদনায় যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে।

সুনীতির মনে পড়িয়া গেল অহীন্দ্রের কথা। বেশি দিন নয়, অল্পদিন পূর্ব্বেই, এই ছাদে এমনি অন্ধকারে এমনি আবেষ্টনের মধ্যে অহীন্দ্র একা শুইয়া ছিল; তিনি আসিয়া তাহার কাছে বসিয়া কাতর-ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেন তুই দূরে চ'লে যাচ্ছিস অহিন? আমরা যে তোর নাগাল পাচ্ছি নে বাবা?

তাঁহার আজিকার বিচলিত মন একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। অহীন্দ্র আজ পনেরো দিন পত্র দেয় নাই। পূজার ছুটির পর সেই গিয়াছে আর আসে নাই। যে-পত্র সে লেখে, সেও যেন কেমন-কেমন, মাত্র দুই-তিন ছত্র। উমা চলিয়া গেল, তাহার মন্থর গতি এখন একটা অর্থ লইয়া তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। উমা শুকাইয়া গিয়াছে। তাহাকেও কি সে এমনি ভাবে পত্র লেখে? সেও কি তাঁহারই মত তাহার নাগাল পায় না? দ্রুত ছাদের সিঁড়ির মুখে আসিয়া তিনি ডাকিলেন, বউমা! বউমা! উমা!

মা!

উমা আবার আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

অহিন তো তোমাকে পত্র দেয় নি বউমা?

উমা নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

অহিন কেন এমন হ'ল? আমার মন যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠছে!

আজ সমস্ত দিনটা উমার মনও বিচলিত হইয়াছিল, সে আর

থাকিতে পারিল না, কাঁদিল। অন্ধকারের মধ্যে কম্পনত্রস্ত দেহ দেখিয়া উমার কান্না সুনীতি অনুমান করিলেন, বধূর মুখে হাত দিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, কাঁদছ কেন বউমা? কি হয়েছে মা? আমাকে বলবে না?

উমা আর গোপন করিতে পারিল না; নূতন যুগের মেয়ে সে, আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার সহিত পরিচয়ের ফলে অহীন্দ্রের যে-কথা সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কঠিন উদ্বেগ আশঙ্কা সহ্য করিয়াও এতদিন গোপন রাখিয়াছিল, আজিকার এই বিচলিত চরম মুহূর্ত্তটিতে অহীন্দ্রের মায়ের কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। সবটা সে জানিত না, যতটুকু জানিত ধীরে ধীরে ততটুকুই বলিল।

সুনীতির সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত ব্যাপারটা না বুঝিলেও তাহা যে ভয়ঙ্কর কিছু ইহা অনুভব করিলেন; ব্যাকুল আশঙ্কায় অধীর হইয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, এরা কি চায় মা?

ঠিক তো জানি না মা। তবে মনে হয়, এরা চায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন ভেদ থাকবে না, জমি ধন সব সমানভাবে ভাগ ক'রে নেবে। সেইজন্যে তারা বিপ্লব ক'রে এ-রাজত্ব উল্টে দিতে চায়। সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

সুনীতির মনে পড়িল, অহীন্দ্র তাঁহাকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিল, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর উমা বলিল—সে আজ আর কথাগুলি গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না—বলিল, সাঁওতালদের চরের জমি কেড়ে নেওয়ার পর তারা একদিন ভোর-রাত্রে চর থেকে উঠে চ'লে গেল; তিনি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেন। সেদিন আমায় বলেছিলেন এ-পাপ আমাদের পাপ। পুরুষ পুরুষ ধ'রে এই পাপ আমাদের জমা হয়ে আসছে, কলের মালিক একা এর জন্যে দায়ী নয়। এ পাপের

প্রায়শ্চিত্ত আমাকে করতে হবে। আমি সেদিন বুঝতে পারি নি মা। এবার পূজোর সময় আমি বুঝতে পারলাম; সুটকেস খুলে কাপড় গোছাতে গিয়ে, ক'খানা চিঠি থেকে বুঝতে পারলাম। আর সে বলিতে পারিল না, অনর্গল ধারায় চোখের জল তাহার মুখ ভাসাইয়া ঝরিতে আরম্ভ করিল।

অনেকক্ষণ পর সুনীতি বলিলেন, চল, বউমা, দাদার কাছে যাই। তিনি ভিন্ন কে আর উপায় করবেন?

উমা অতিমাত্রায় ব্যগ্রতার সহিত কাতরভাবে বলিয়া উঠিল, না, না মা। তাতে তাঁকে বিশ্বাসঘাতক হতে হবে, সমস্ত দল ধরা প'ড়ে যাবে মা। না না।

সুনীতি পাথর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উমাও নীরব।

ও-পারের চরে বাজনার শব্দ উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতায় উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। নদীর চরের উপর লাল আলোর মধ্যে সেই দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়েটা উন্মত্ত আনন্দে যেন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে। লম্বা ফালি সর্ব্বনাশা চরটা যেন ঐ দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়েটার রূপ ধরিয়া সর্ব্বনাশীর মত নাচিতেছে।

৩৪

নিতান্ত বিস্মৃতিবশতই খান দুই ইস্তাহার এবং একখানা পত্র সুটকেসের নীচে পাতা কাগজের তলায় রহিয়া গিয়াছিল; ঝাড়িয়া মুছিয়া গুছাইতে গিয়া উমা সেগুলি পাইয়াছিল। লাল অক্ষরে ছাপা ইস্তাহারখানা পড়িয়াই উমা ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তারপর সেই পত্রখানা; তাহার মধ্যে সব সুস্পষ্ট—"মৃত্যু মাথায় করিয়া আমাদের এ অভিযান। প্রায় পৃথিবীব্যাপী বিরাট শক্তিগুলি ভরা রাইফেলের ব্যারেল উদ্যত করিয়া রাখিয়াছে। ফাঁসির মঞ্চে দড়ির

নেকটাই প্রস্তুত হইয়া ঝুলিতেছে। অন্যদিকে মানুষের আত্মঅজ্ঞাত স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত বিধানের ফলে অসংখ্য কোটি মানুষের অপমৃত্যু যুগ যুগ ধরিয়া ঘটিয়া আসিতেছে।" শেষের কয়টি লাইনের পাশে অহীন্দ্র দাগ দিয়া লিখিয়াছে, "আবছা অন্ধকারের মধ্যে সাঁওতালেরা চর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমি চোখে দেখিয়াছি।"

উমা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে একে একে সমস্ত কথাই সুনীতিকে প্রকাশ করিয়া বলিল। বলিতে পারিল না কয়েকটি কথা; অহীন্দ্র ঠিক এই সময়েই আসিয়া পড়িয়াছিল, উমার হাতে কাগজ ও চিঠি দেখিয়া সে ছোঁ মারিয়া সেগুলি কাড়িয়া লইয়া বলিয়াছিল, এ তুমি কোথায় পেলে?

উমা যেমন ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া চিঠিখানা পড়িতেছিল, তেমনি ভঙ্গিতেই দাঁড়াইয়া ছিল, ঠোঁট দুইটি কেবল থর থর করিয়া কাঁপিয়াছিল, উত্তর দিতে পারে নাই। অহীন্দ্র হাসিয়াছিল, হাসিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া বলিয়াছিল, "না জাগিলে হায় ভারতললনা, ভারত স্বাধীন হ'ল না হ'ল না।" এই নব জাগরণের ক্ষণে তুমি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির লেখাপড়া জানা মেয়ে হয়ে কেঁদে ফেললে উমা? নাঃ, দেখছি তুমি নিতান্তই 'বাঙালিনী'! তারপর সে তাহাকে বলিয়াছিল লেনিনের সহধর্ম্মিণীর কথা, রাশিয়ার বিপ্লবের যুগের মেয়েদের কথা।

উমার তরুণ রক্তে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল। স্বামীর সাধনমন্ত্র নিজের ইষ্টমন্ত্রের মত এতদিন সে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আজ একটি বিচলিত মুহূর্ত্তে স্বামীর বেদনা-বিচলিত মায়ের কাছে সে আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, সব প্রকাশ করিয়া ফেলিল।

সুনীতি স্থির হইয়া শুনিলেন।

তিনি যেন পাথর হইয়া গেলেন। বজ্রগর্ভ মেঘের দিকে যে স্থির ভঙ্গিতে পাহাড়ের শৃঙ্গ চাহিয়া থাকে, সেই ভঙ্গিতে অপলক দৃষ্টিতে তিনি ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

* * *

মাস দুয়েক পর একদিন সে বজ্র নামিয়া আসিল।

উমার হাত ধরিয়া সুনীতি নিত্যই ইহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রতিকারের উপায় কিছু দেখিতে পান নাই। অহীন্দ্রকে বাড়ী আসিবার জন্য বার বার আদেশ অনুরোধ মিনতি জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, অহীন্দ্র আসে নাই, কোন উত্তর পর্য্যন্ত দেয় নাই। অমল জানাইয়াছে, অহীন্দ্র কোথায় যে হঠাৎ গিয়াছে সন্ধান করিয়াও সে জানিতে পারে নাই; ফিরিলেই সে খবর দিবে। কোন বন্ধুর সহিত সে কলিকাতার বাহিরে কোথাও গিয়াছে।

সুনীতি ও উমা নীরবে পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া অবশ্যম্ভাবীর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। হেমাঙ্গিনী বা ইন্দ্র রায়ের নিকটেও গোপন করিয়া রাখিলেন। ও-দিকে ইন্দ্র রায় কাশীযাত্রার আয়োজনে সম্পূর্ণ ব্যস্ত, দৃষ্টি ফিরাইয়া উমার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিবারও অবসর নাই। হেমাঙ্গিনী স্বামীর তাড়নায় ব্যস্ত, তাহা ছাড়া তিনি যেন বড় লজ্জিত, চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অনেক অনিষ্ট রায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি এ-বাড়ী বড় একটা আসেন না। মাঝে মাঝে আসেন, কিন্তু ম্লানমৌন সুনীতির সম্মুখে তিনি বসিয়া থাকিতে পারেন না। মনে হয়, ম্লানমৌন মুখে সুনীতি যেন বৈষয়িক ক্ষতির জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছেন। উমার ম্লানমুখ দেখিয়া ভাবেন বাপের লজ্জায়ই উমা এমন নতশির ম্লান হইয়া গিয়াছে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে।

সেদিন মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি; রাত্রি প্রথম প্রহর শেষ হইয়া আসিয়াছে। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহে একটা অকাল বর্ষা নামিয়াছিল; আকাশে সেই অকাল বর্ষার ঘনঘটাচ্ছন্ন মেঘ;

চারিদিকে জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে সচল দীর্ঘাকৃতি অন্ধকারপুঞ্জের মত কালিন্দীর বালি ভাঙিয়া চলিয়া আসিতেছিল অহীন্দ্র। গায়ে একটা বর্ষাতি জামা, মাথায় বর্ষাতি টুপি। গভীর অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া এই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া সে মা ও উমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। পুলিস তাহাদের ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মহাযুদ্ধের পর তখন ভারতের গণ-আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে। নূতন অধ্যায়ের সূচনায় রুশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজতন্ত্রবাদী যুবক-সম্প্রদায়ের এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। ভারতের নানা স্থানে খানাতল্লাসী এবং ধর-পাকড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অহীন্দ্র ছিল ইউ, পির কোন একটা শহরে; সে সেখান হইতে আত্মগোপন করিয়া চলিয়া আসিতেছে। আবার আজই রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। দৃঢ় দীর্ঘ পদক্ষেপে বালি ভাঙিয়া সে কূলে আসিয়া উঠিল।

এ কি? এ তো রায়হাটের ঘাট নয়, এ যে চরের ঘাট! পাকা বাঁধানো রাস্তা, ওই তো অন্ধকারের মধ্যেও সুদীর্ঘ চিমনিটা, ওই বোধ হয় বিমলবাবুর বাংলোয় একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। কুলী-ব্যারাকের সুদীর্ঘ ঘরখানার খুপরির মত ঘরে ঘরে স্তিমিত আলোর আভা, যেন একটা স্তব্ধগতি ট্রেনের মত মনে হইতেছে। রায়হাট ও-পারে; ভুল করিয়া সে চরের উপর আসিয়া উঠিয়াছে। সে ফিরিল। কিন্তু আবার দাঁড়াইল। অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল।

কাশ ও বেনাঘাসের জঙ্গলে ভরা সেই চরখানি, জনমানবহীন, যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন। কতদিন নদীর ও-পার হইতে দাঁড়াইয়া সে দেখিয়াছে। তারপর একদিন এইখানেই সরু একটি পথের উপর

দিয়া সারিবদ্ধ কালো মেয়ের দলকে বাহির হইতে দেখিয়াছিল, মাটির ঢিপির ভিতর হইতে যেমন পিপীলিকার সারি বাহির হয় তেমনি ভাবে। সত্য সত্যই উহারা মাটির কীট। মাটিতেই উহাদের জন্ম, মাটি লইয়াই কারবার, মাটিই উহাদের সব। সেদিন সঙ্গে ছিল রংলাল। সেই দলটির মধ্যে সারীও ছিল নিশ্চয়, মুকুটের মধ্যস্থলের কালো পাখীর দীর্ঘ পালকের মত। এই পথ দিয়াই সে চরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আদিম বর্ব্বর জাতির বসতি মাটির কীটদের মাটির গড়া বাসস্থান। সচল পাহাড়ের মত কমল মাঝি, বৃদ্ধা মাঝিন, কালো পাথরে গড়া প্রায় উলঙ্গ মানুষের দল। চিত্রিত বিপুলদেহ মৃত অজগরের মাংসস্তূপ। রাশীকৃত কুচির ফুল, দীর্ঘাঙ্গী মুখরা সারী; সাঁওতাল মেয়েদের নাচ। মাটির উপর রংলালের প্রলোভন। নবীন বাগ্দীর দলকেও মনে পড়িল। জমিদারদের অলস উদরের লোলুপ ক্ষুধা। মনে পড়িল তাহার দাদাকে। ননী পালের মৃত্যু। শ্রীবাস ও মজুমদারদের ষড়যন্ত্র। দাঙ্গা, নবীনের দ্বীপান্তর। কলওয়ালা বিমলবাবু; তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল, সরলা সাঁওতালদের মেয়ে সারীকে জোর করিয়া করায়ত্ত করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সাঁওতালদের জমি আত্মসাৎ করিয়াছে। তাহারা নিজেরা, তাহার শ্বশুর, তাহার বাবা বাকিটুকু কাড়িয়া লইয়াছেন। রাত্রিশেষের অস্পষ্ট আলোকময় অন্ধকারের মধ্যে কালো কালো মানুষের সারি, কাঁধে ভার, মাথায় বোঝা, সঙ্গে গরু ছাগল ভেড়ার পাল, বসতি ছাড়িয়া চলিয়া গেল, নিঃশেষে ভূমিহীন হইয়া চলিয়া গেল। যুগে যুগে এমনি করিয়াই উহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে হাঁটিয়া হাঁটিয়া কাল-সমুদ্রের প্রায় কিনারার উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অহীন্দ্রের চোখ অন্ধকারের মধ্যে শ্বাপদের মত জ্বলিতেছিল।

ওই বিমলবাবুটাকে—। পকেট হইতে সে ছোট কালো ভারী একটা বস্তু বাহির করিল। ছয়টা চেম্বার বোঝাই-করা রিভলভার। বিকারগ্রস্ত রোগীর মত অস্থির অধীর হইয়া উঠিল সে। একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া লইল। আশেপাশে সম্মুখে চরখানা তেমনি, এখানে-ওখানে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইতেছে মাত্র, মানুষ দেখা যায় না; পিছনে কালিন্দীর গর্ভেও কেহ নাই। ও-পারে রায়হাট স্তব্ধ অন্ধকার, শুধু গাছপালার মাথার উপর একটা অলোর ছটা, একটা বাড়ীর খোলা জানালায় আলো। এ যে তাহাদেরই বাড়ী হ্যাঁ, তাহাদেরই বাড়ীর জানালার আলো। আলোকিত ঘরের মধ্যে দুইটি মানুষ, স্ত্রীলোক--মা আর উমা! সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মা আসিয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, স্পষ্ট মা। কিছুক্ষণ পর রিভলভারটি পকেটে পূরিয়া সে চরকে পিছনে ফেলিয়া রায়হাট অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইল। পুরানো গ্রামের বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন পথ অতিবাহন করিয়া সে সেই আলোকিত জানালার তলে আসিয়া দাঁড়াইল, অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট স্বরে ডাকিল, মা!

কে? কে?—শঙ্কিত ব্যগ্রকণ্ঠে সুনীতি প্রশ্ন করিলেন।

মা!

অহিন?

হ্যাঁ।

যাই যাই, দাঁড়া।

মাথার টুপিটা খুলিয়া ফেলিয়া রেন-কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া অহীন্দ্র মৃদু হাসিল, ছলনা করিয়া মাকে ভুলাইবার জন্যই সে হাসিল।

সুনীতি অপলক চক্ষে অহীন্দ্রের দিকে চাহিয়া ছিলেন, চোখে জল ছিল না, কিন্তু ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল, অহীন্দ্রের হাসি

দরজা খুলিয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়া গেল, দরজায় দাঁড়াইয়া সুনীতি ও উমা দেখিলেন, রাত্রিশেষের তরল অন্ধকারের মধ্যে অহীন্দ্র যেন কোথায় মিশিয়া গেল।

বেলা দশটা হইতেই কিন্তু অহীন্দ্র আবার ফিরিয়া আসিল, তাহার সঙ্গে পুলিস। রেল-ষ্টেশনে পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইউ. পি. হইতে পুলিস জেলা-পুলিসকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। পুলিস এখন বাড়ী-ঘর খানাতল্লাস করিয়া দেখিবে।

অভিযোগ গুরুতর—রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রাজকর্ম্মচারী হত্যার ষড়যন্ত্র।

* * * *

দশটা হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা তিনটা পর্য্যন্ত খানাতল্লাসি করিয়া পুলিসের কাজ শেষ হইল। ইন্দ্র রায়ের বাড়ীও খানাতল্লাস হইয়া গেল। বাড়ীর আশেপাশে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কাহারও চোখই শুষ্ক ছিল না, হ্যাণ্ডকাপ দিয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া অহীন্দ্রকে লইয়া যাইতে দেখিয়া সকলেরই চোখ সজল হইয়া উঠিল। তাহার মধ্যে অঝোরঝরে কাঁদিতেছিল কয়েকজন; মানদা, মতি বাগ্দিনী প্রিয়জন-বিয়োগে শোকার্ত্তের মতই কাঁদিতেছিল। আর কাঁদিতেছিল যোগেশ মজুমদার। লজ্জা এবং অনুতাপের তাহার আর সীমা ছিল না। সমস্ত কিছুর জন্য সে অকারণে আপনাকে দায়ী করিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। এ-কান্না তাহার সাময়িক, হয়তো কালই সে কলের মালিকের ইঙ্গিতে চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর অনিষ্ট সাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে, কিন্তু তবু সে আজ কাঁদিতেছিল। অচিন্ত্যবাবুও একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া বেশ স্ফুটভাবেই ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিলেন, এই মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য দুর্ব্বল মানুষটি কোনমতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না। রংলালও কাঁদিতেছে। কেবল একটি মানুষ

ক্রোধভরে আস্ফালন করিতেছিল, হুঁ হুঁ বাবা, এয়ারকি, গবরমেণ্টারের সঙ্গে চালাকি! সে শূলপাণি, সদ্য গাঁজা টানিয়া সে জ্ঞাতিশত্রু নিপাতের তৃপ্তিতে আস্ফালনমুখর হইয়া উঠিয়াছে।

পুলিস অহীন্দ্রকে লইয়া চলিয়া গেল। হেমাঙ্গিনী আছাড় খাইয়া পড়িলেন, উমা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, চোখভরা জল আঁচলে মুছিয়া সে মাকে ডাকিল, ওঠ মা। একদিন তো তিনি ফিরে আসবেন; কেঁদো না। হেমাঙ্গিনী মুখ তুলিয়া মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

ইন্দ্র রায় মাথা নীচু করিয়া পায়চারি করিতেছিলেন। রায়-বাড়ী ও চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর মিলিত জীবন-পথ আবার ভাঙ্গিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল, না না, ভাঙে নাই। বিপদ আসিয়াছে, আঘাত আসিয়াছে, সে-আঘাত দুই বাড়ীকেই সমানভাবে বেদনা দিয়াছে; কিন্তু বিচ্ছেদ হয় নাই, দুই বাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হয় নাই। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ডাকিলেন ইষ্টদেবীকে, তারা, তারা মা! তারপর বলিলেন, ওঠ গিন্নী, ওঠ।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, ওগো, আর নয়, তুমি কাশী যাবে বলছিলে, কাশী চল।

যাব। অহীন্দ্রের বিচার শেষ হোক। মা যে বাধা দিলেন। উমা, তোর শাশুড়ী কোথায় গেলেন, দেখ্ মা।

রামেশ্বরের ঘরে সুনীতি মাটির উপর মুখ গুঁজিয়া মাটির প্রতিমার মতই পড়িয়াছিলেন, মৃদু নিশ্বাসের স্পন্দন ছাড়া এতটুকু আক্ষেপ সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে কোথাও ছিল না; মহী যেদিন আত্মসমর্পণ করে, সেদিনও ঠিক এমনি ভাবেই তিনি পড়িয়াছিলেন।

খাটের উপর রামেশ্বর বসিয়া ছিলেন পাথরের মত।

দেখিয়া তাঁহার কম্পিত অধরেও একটি অস্পষ্ট বিচিত্র হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল, মৃদুস্বরে বলিলেন, আমি সব শুনেছি অহিন।

অহীন্দ্র চমকিয়া উঠিল।

সুনীতি বলিলেন, বউমা আমাকে সব বলেছে।

ও-বাড়ীর ওঁরা? তা হ'লে কি তোমরাই—? তাহার সন্দেহ হইল, হয়তো প্রাচীন জমিদার-বংশ তাহাকে রক্ষার্থে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পুলিসের শরণাপন্ন হইয়াছেন।

না আর কেউ জানে না। আমাকে না ব'লে বউমা বাঁচবে কি ক'রে, বল্? এত দুঃখ সে কি লুকিয়ে রাখতে পারে? কিন্তু এ তুই কি করলি বাবা?

কোটের শেষ বোতামটা খুলিয়া অহীন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, আজই রাত্রে আমাকে চ'লে যেতে হবে মা, পুলিস আমাদের দলের সন্ধান পেয়ে গেছে।

সুনীতি সমস্ত শুনিয়াছেন জানিয়া সে আর ভূমিকা করিল না, সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল না। একেবারে কঠিনতম দুঃসংবাদটা শুনাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। একবার শুধু হাস্যমুখে মুখ ফিরাইয়া উমার দিকে চাহিল। খাটের বাজু ধরিয়া উমা দাঁড়াইয়া আছে। সে তাহাকে বলিল, একটু চা খাওয়াও দেখি উমা। সঙ্গে কিছু খাবার— খিদে পেয়ে গেছে।

* * *

সুনীতি শুধু বলিলেন, তুই যদি বিয়ে না করতিস অহিন, আমার কোন আক্ষেপ থাকত না।

অহীন্দ্র উত্তরে উমার দিকে চাহিল, উমার মুখে বেদনার্ত্ত ম্লান হাসি; কিন্তু কোন অভিযোগ সেখানে ছিল না, তাহার জলভরা চোখে স্বচ্ছ জলতলে বাড়ব-বহ্নিদীপ্তির মত তরুণ প্রাণের আত্মত্যাগের বাসনা

জলজল করিতেছে। অহীন্দ্র মাকে বলিল, উমা কোনদিন সে-কথা বলবে না মা ; উমা এ-যুগের মেয়ে।

সুনীতি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, তারপর বলিলেন, একটু বিশ্রাম ক'রে নে বাবা, আমি ঠিক ভোরবেলা তোকে জাগিয়ে দেব। তিনি উঠিয়া গেলেন ; বধূকে বলিলেন, দরজা বন্ধ ক'রে দাও বউমা।

উমা দরজা বন্ধ করিয়া অহীন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; অহীন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার ভয় হইতেছিল মুহূর্ত্তে উমা হয়ত ভাঙিয়া পড়িবে।

কথা বলিল উমা নিজে ; বলিল শুয়ে পড়, এখন ঘুমিয়ে নাও।

অহীন্দ্র একান্ত অনুগতের মতই শুইয়া পড়িল। উমা তাহার মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালাইয়া যেন তাহাকে ঘুম পাড়াইতে বসিল।

ভোরবেলা, খানিকটা রাত্রিও ছিল তখনও। সুনীতি আসিয়া ডাকিলেন, বউমা! বউমা!

উমা কখন ঘুমে ঢলিয়া অহীন্দ্রের পাশেই শুইয়া ঘুমাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঘুমের মধ্যেও তাহার উদ্বেগকাতর মন জাগিয়া ছিল, দুই বার ডাকিতেই তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল ; তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে অহীন্দ্রকে ডাকিয়া তুলিল। অহীন্দ্র উঠিয়া জানালা খুলিয়া একবার বাহিরটা দেখিয়া লইল, তারপর একবার গভীর আবেগে উমাকে বুকে টানিয়া লইয়া তাহার কম্পিত অধরে প্রগাঢ় একটি চুম্বন করিল ; কিন্তু সে ওই মুহূর্ত্তের জন্য, সে জামা পরিয়া জুতার ফিতা বাঁধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। উমা দরজা খুলিয়া দিল, সুনীতি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, অহীন্দ্র আর কাহারও মুখের দিকে চাহিল না, হেঁট হইয়া মায়ের পায়ে একটি প্রণাম করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া

গভীর রাত্রি।

রামেশ্বর তেমনি পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া ছিলেন। তেমনি দৃষ্টি তেমনি ভঙ্গি। ঘরের মধ্যে তেমনি স্বল্প আলোক, আলোক-পরিধির চারিপাশে তেমনি নিথর অন্ধকার। সুনীতি তেমনি উপুড় হইয়া মাটিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছেন। উমাকে হেমাঙ্গিনী লইয়া গেছেন। রায় লইয়া যাইতে চান নাই। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর কাতরতা দেখিয়া না বলিতেও পারেন নাই। অপরাধীর মত বলিয়াছিলেন, কাল সকালেই পাঠিয়ে দেব উমাকে।

মূহূর্ত্তের জন্য মুখ তুলিয়া সুনীতি বলিয়াছিলেন, বেশ।

মানদা নীচে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে।

শোকাচ্ছন্ন নীরবতা ভঙ্গ করিয়া রামেশ্বর বলিলেন, জল। শুষ্ক কণ্ঠস্বর দিয়া রব বাহির হইল না, কিন্তু ভাষা বোঝা গেল।

সুনীতি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন. মনে তাঁহার অনুতাপ হইল, আজ রামেশ্বরের খাওয়া পর্য্যন্ত হয় নাই। উঠিয়া তিনি দেখিলেন, উমা জলখাবার সাজাইয়া কোণের টেবিলের উপর নিয়মমত রাখিয়া গিয়াছে। জলখাবারের থালা ও গ্লাসটি আনিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, খাও কিছু। আমি ভুলে গেছি, মনে করতে পারি নি।

জলের গ্লাসটি শুধু তুলিয়া লইয়া নিঃশেষে পান করিয়া রামেশ্বর খাদ্য প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, না।

সুনীতি এতক্ষণে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

রামেশ্বর মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন, অহিনের কি ফাঁসি হবে ?

আর্ত্তস্বরে সুনীতি বলিয়া উঠিলেন, না না, সে তো খুন করে নি, বিপ্লবের খুনের ষড়যন্ত্র করেছিল. খুন তো করে নি।

রামেশ্বর বলিলেন, তোমার পুণ্য, উমার ভাগ্য তাকে বাঁচিয়েছে।

সুনীতি চুপ করিয়া রহিলেন।

রামেশ্বর বলিলেন, আচ্ছা, ওরা আমাকে কেন সাজা দিক না। অহিন তো আমারই ছেলে। দোষ তো আমারই।

আবেগপীড়িত কণ্ঠে সুনীতি বলিলেন, না, না, আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট। তোমার দোষ নয়, আমার ভাগ্যের দোষ, আমার গর্ভের দোষ।

অতি ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া রামেশ্বর বলিলেন, না।

তারপর বহুক্ষণ নীরবতার পর বলিলেন, জান না তুমি, কেউ জানে না। আমারই রক্তের দোষ। ছায়ামূর্ত্তির মত মৃদু সঞ্চালনে হাত তুলিয়া অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে তোমার দিদিকে— রাধারাণীকে আর আমার প্রথম সন্তানকে গলা টিপে মেরেছিলাম।

সুনীতি আতঙ্কে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রামেশ্বর বলিতেছিলেন, একদিন দেখলাম, রায়-বাড়ীতে রাধারাণী সুন্দর একটি ছেলের সঙ্গে হাসছে। সে তার পিসতুতো ভাই। আমার চরিত্র-দোষ ছিল কিনা, আমার সন্দেহ হ'ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, সংসারে এই নিয়ম, 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ'। যে অন্ধ সে পৃথিবীকে অন্ধকারই দেখে, এ প্রকৃতির নিয়ম। রামেশ্বর নীরব হইলেন।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, ছেলেটা হ'ল, তার চোখ চুল কালো হ'ল আমাদের মত পিঙ্গল হ'ল না। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। ঠিক মনে হ'ল, ছেলেটা তার মত দেখতে। একদিন শুয়ে ছিল ছেলেটা, গলা টিপে দিলাম।

সুনীতি থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, না না না। ব'লো না ব'লো না।

রামেশ্বর নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পর আবার অকস্মাৎ বলিলেন, কিন্তু রাধারাণী বুঝতে পেরেছিল। হয়তো দেখেছিল। কিন্তু সে কাঁদলে না। শুধু বললে, যে চোখে তুমি এমন 'কু' দেখলে, ওই চোখ তোমার অন্ধ হয়ে যাবে।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, সে কাউকে কিছু বললে না, বাপের বাড়ীও গেল না ; একদিন কাশী যাবে ব'লে বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল। সন্ধ্যেবেলা একাই চলে গেল। আমি সেই রাত্রেই ষ্টেশন থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে, ওইখানে গলা টিপে—। যখন তার গলা টিপে ধরলাম, সে অভিশাপ দিলে, শুধু চোখ নয়, ওই দু হাতেও তোমার কুষ্ঠ হবে।

সুনীতির যে সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে! স্থান কাল পাত্র সব ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। বিহ্বল দৃষ্টিতে তিনি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন, নির্ব্বোধের মত তিনি এবার বলিলেন, কই, তোমার তো কুষ্ঠ হ'ল না? চোখ তো অন্ধ হয় নি?

হয়েছিল ; ভাল হয়ে গেল। মহীন আর অহীন ভাল ক'রে দিলে। এক-একটি হাত ও চোখ দেখাইয়া বলিলেন, এইটে অহীন, আর এইটে মহীন। তারপর মৃদুস্বরে বলিলেন, তোমার গর্ভের দোষ নয়, আমার রক্তের দোষ। জান সুনীতি, আমাদের বংশ পাপের বংশ। নবাবরা দেওয়ালে পুঁতে মানুষ মারত। আমার কিন্তু সব পাপ নষ্ট হয়ে গেল। সব রোগ ভাল হয়ে গেল।

সুনীতি নীরবে বসিয়া রহিলেন, সূতা-কাটা ঘুড়ির মত তাঁহার মন জীবন-কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আকর্ষণ করিতে আর কিছুতে পারিতেছে না। বিহ্বল দিশাহারার মত উদাস তিনি।

কিছুক্ষণ পরই বাহিরে পাখীরা কলরব করিয়া প্রত্যুষ ঘোষণা করিয়া দিল। রামেশ্বর চকিত হইয়া বলিলেন, ভোর হয়ে গেল? বলিতে বলিতে বিছানা হইতে নামিয়া তিনি জানালা খুলিয়া দিলেন। আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, সম্মুখে আকাশে বার্ত্তা বহন করিয়া উদয়াচল হইতে মৃত্তিকার বুকে লক্ষ লক্ষ যোজন অতিক্রম করিয়া ধারায় ধারায় আলোকের বন্যা ছুটিয়া আসিতেছে! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে, সমস্ত দেখা যাইতেছে—জীর্ণ রায়হাট, শীতের শীর্ণা কালিন্দী, ও-পারের চর, আকাশে উদ্যত চিমনি, কলের সারি সারি অট্টালিকা, প্রশস্ত সুগঠিত পথ, লোকজনে ঐশ্বর্য্যময়ী চর।

চরটা চোখে পড়িতেই সুনীতি চমকিয়া উঠিলেন। সর্ব্বনাশা চর। ব্যাকুলভাবে তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি—তুমি কি আমার সতীনের দেহ ওই—ওই—ওই চরে পুঁতেছিলে?

সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া রামেশ্বর বলিলেন, না; বাড়ীতে কুয়োর মধ্যে। সেটা বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

সুনীতি বিহ্বল বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, তবে? দিশাহারা বিহ্বল মনে উদ্ভট চিন্তা, উদ্ভট প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল। সতীনের কঙ্কালের উপর তো চরটা গড়িয়া উঠে নাই, তবে কেন এমন হইল?

রামেশ্বর সে কথায় কান দিলেন না, মুখ ফিরাইয়া আপনার দুইটি হাত শূন্যলোকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। তখন দিগন্তশিখরে সূর্য্য দেখা দিয়াছে; অতিরিক্ত আলোক অকৃপণ দীপ্তি ও উত্তাপ লইয়া রামেশ্বরের হাতের উপর ছড়াইয়া পড়িল। হাতের দিকে চাহিয়া রামেশ্বর বলিলেন, আঃ কোন দাগ নেই, একেবারে সাদা হয়ে গেছে।

অস্থিচর্ম্মসার রক্তহীন বিবর্ণ দুখানি হাত।

হাত দুইখানি যুক্ত করিয়া রামেশ্বর সূর্য্যকে প্রণাম করিলেন,

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোস্মি দিবাকরম্।

সুনীতি উদাস দৃষ্টিতে চরটার দিকে চাহিয়া ছিলেন, রামেশ্বরের কথা কানে যাইতেই তিনি আকাশের দিকে চাহিলেন; সম্মুখেই রক্তিম সূর্য্য, উদয়শিখর হইতে অস্তাচল পর্য্যন্ত মেঘমুক্ত ভাবী আকাশ সর্ব্ব-পাপঘ্ন দেবতার মহাদ্যুতিতে ঝলমল করিতেছে। তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে রায়হাটে, কালিন্দীর চরে, সর্ব্বত্র—সর্ব্বত্র। তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

শেষ

লেখকের অন্য বই

আগুন
নীলকণ্ঠ
রাইকমল
চৈতালী ঘূর্ণী
পাষাণ পুরী
ধাত্রীদেবতা
কালিন্দী
গণদেবতা
পঞ্চগ্রাম
মন্বন্তর

পদচিহ্ন
বেদেনী
রসকলি
স্থলপদ্ম
জলসা-ঘর
হারানো সুর
ছলনাময়ী
দিল্লীকা লাড্ডু
যাদুকরী
তিন শূন্য

নাটক

কালিন্দী
দুই পুরুষ

পথের ডাক
দ্বীপান্তর

যুগবিপ্লব (বালাজীরাও)
(ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)